ভিক্টর হুগো
লা মিজারেবল
রূপান্তরঃ ইফতেখার আমিন
সেবা
প্রকাশনী
শ্যামল
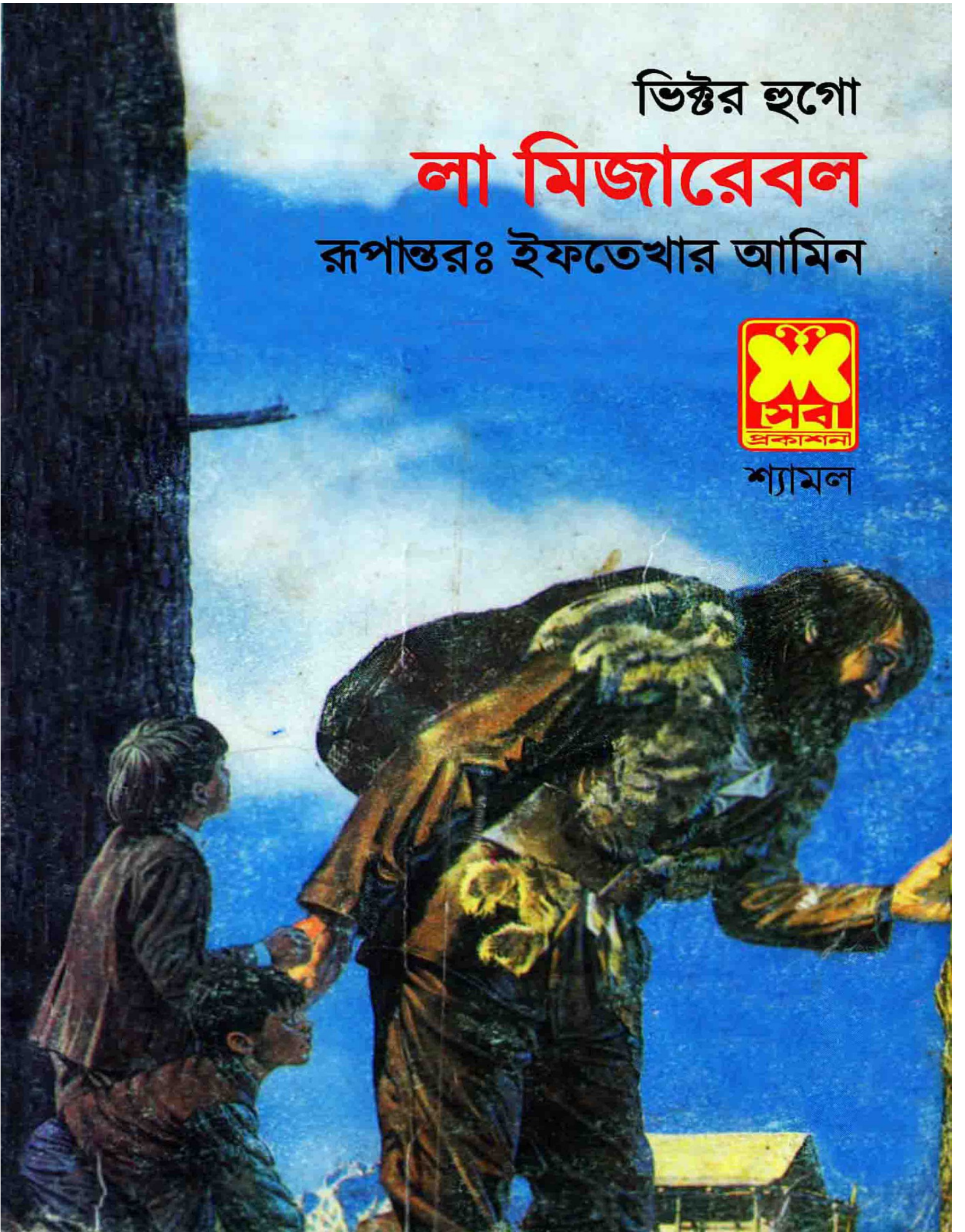
লা মিজারেবল

ভিক্টর হুগো

রূপান্তরঃ ইফতেখার আমিন

সেবা প্রকাশনী

ভূমিকা

বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক, কবি ও নাট্যকার, ভিক্টর মারি হুগো (১৮০২-১৮৮৫) একজন নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও ছিলেন, ১৮৫১ সালে নেপোলিয়নের অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করায় দীর্ঘ বিশ বছরের নির্বাসন দেয়া হয় তাকে। এই সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রচনা করেন ভিক্টর হুগো, যার মধ্যে 'লা মিজারেবল' শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি অর্জন করে। এ উপন্যাসের মূল চরিত্র, জাঁ ভালজাঁর মৃত্যুদৃশ্যের মর্মস্পর্শী, হৃদয়বিদারক বর্ণনা পড়ে অভিভূত হয়ে বিখ্যাত ব্রিটিশ কবি আলফ্রেড টেনিসন হুগোকে 'লর্ড অভ হিউম্যান টিয়ার্স' অ্যাখ্যা দিয়েছিলেন। জর্জ মেরেডিথের মতে 'লা মিজারেবল' 'শতাব্দীর সেরা উপন্যাস'। ওয়াল্টার প্যাটারের বিচারে দান্তের 'ডিভাইন কমেডি', মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' এবং পবিত্র বাইবেলের মতই এক মহান শিল্পকর্ম 'লা মিজারেবল'। হুগোর অনবদ্য রচনা 'হাঞ্চব্যাক অভ নোতরদেম' ও 'টয়লার্স অভ দ্য সী'র মত এটিও ঐতিহাসিক পটভূমির ওপর রচিত একটি সামাজিক উপন্যাস।

ফ্লবার্টের ম্যাডাম বভারি, মেলভিলের ক্যাপ্টেন আহাব আর ডিকেন্সের ম্যাগউইচ চরিত্রের মত এই উপন্যাসের জাঁ ভালজাঁও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গনে।

'লা মিজারেবল' সামাজিক-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে কেন্দ্র করে রচিত একটি অত্যন্ত গতিশীল ঘটনাবহুল মানবিক উপন্যাস। সারা পৃথিবীতে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে এটি। ১৮৬২ সালে বেলজিয়াম থেকে এক যোগে নয়টি ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয় 'লা মিজারেবল'। এর প্রথম প্যারিস সংস্করণ ফুরিয়ে গিয়েছিল মাত্র চব্বিশ ঘন্টায়।

'লা মিজারেবল' ছাপা হওয়ার কয়েক বছর পর ভিক্টর হুগো তাঁর বেলজিয়ান প্রকাশককে এক চিঠি লেখেন, যাতে ছিল কেবল বড় করে আঁকা এক '?' চিহ্ন। তিনি জানতে চাইছিলেন কেমন চলছে 'লা মিজারেবল'। জবাবে প্রকাশকও বড় এক '!' চিহ্ন এঁকে পাঠিয়ে দেন—অর্থাৎ বিস্ময়কররকম চলছে। হুগোর সেই চিঠি বিশ্বের সংক্ষিপ্ততম চিঠি হিসেবে খ্যাত হয়ে আছে।

'লা মিজারেবল'-এ বিশপ মিরিয়েল, জাঁ ভালজাঁ, পুলিশ ইন্সপেক্টর জ্যাভার, ফাঁতিন, কোজেত, মারিয়াস, থেনারদিয়ের এবং এপোনাইনসহ প্রচুর চরিত্রের উপস্থিতি, তাদের বিশ্বাস, বেঁচে থাকার সংগ্রাম, ষড়যন্ত্র সংঘাত, প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদি সব মিলিয়ে উপন্যাসটির কাহিনী যে গতিশীলতা লাভ করেছে, তা যেমন শ্বাসরুদ্ধকর, ঘটনাবহুল, তেমনি হৃদয়বিদারক।

'লা মিজারেবল' বাংলায় লেখার ইচ্ছে ছিল আমার বহুদিনের, কিনুত মূল বই জোগাড় করতে পারিনি বলে তা সম্ভব হয়নি। যখন ওটা পেলাম, দেখলাম সে এক বিশাল বই। ওর থেকে কাহিনীর মূল নির্যাস বের করা বড় কঠিন কাজ, তাই কি করা যায় ভাবছিলাম, এই সময় আমার এক ছোট ভাই, 'কিশোরপত্রিকার' সহকারী সম্পাদক, টিপু কিবরিয়া সহযোগিতার হাত বাড়ালেন। তার কাছে ছিল মূল বই থেকে ইংরেজিতেই সংক্ষেপিত করা 'লা মিজারেবল'-এর আমেরিকান এডিশন। সেটিও কম নয়, প্রায় সাড়ে তিনশো পাতার বই। ওটার সংক্ষিপ্ত রূপান্তর এটি। মূল কাহিনীর সবটুকুই আছে এতে, কোন ঘটনা বা চরিত্র বাদ পড়েনি। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এটি পড়লে পুরো কাহিনী জানতে পারবেন পাঠক, বুঝতে পারবেন কেন 'লা মিজারেবল' এত বিখ্যাত। টিপু কিবরিয়ার কাছে চির কৃতজ্ঞ রইলাম।

ছোট-বড় সবার জন্যে লেখা এ বইটি যথাসম্ভব সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টায় কোন ত্রুটি করিনি। আমার প্রচেষ্টা-পরিশ্রম কতটা সফল হয়েছে সে বিচারের ভার পাঠকদের ওপরই রইল।

ধন্যবাদ।

ইফতেখার আমিন
২০.০১.৯৭

এক

ফ্রান্সের ছোট এক শহর ব্রাই। এ শহরের খুবই গরীব এক কাঠুরের ঘরে জন্ম নিল এক ছেলে—তার নাম রাখা হলো ভালজাঁ। জাঁ ভালজাঁ। তার বাবার নাম জাঁ ভালজাঁ, মায়ের নাম জিনি ম্যাথিউ। এক বোন ছিল ভালজাঁর, তার থেকে বেশ কয়েক বছরের বড় ছিল সে।

বাবা-মা আর দুই ভাই-বোনের সংসার, তবু পেট ভরে খেতে পারে না সবাই দুবেলা, এতই গরীব ছিল ওরা। কাঠ বিক্রি করে বাবার যা আয় হয়, সংসারের প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অপর্যাপ্ত। তবু, গরীবের যেমন কাটে, তেমনি কেটে যেতে থাকল জাঁ ভালজাঁদের দিন।

ভাল করে জ্ঞান হওয়ার আগেই মাকে হারায় সে। বুকে ঠাণ্ডা জমে ধুকে ধুকে মারা গেল ভালজাঁর মা, পয়সার অভাবে তার চিকিৎসা করানো গেল না। এর কয়েক বছর পর পাশের ফ্যাভেরোলস শহরের এক ওদেরই মত গরীবের সাথে বিয়ে হলো জাঁ ভালজাঁর বোনটির, চলে গেল সে নিজের সংসারে।

লেখাপড়ার দিকে ঝোক ছিল ভালজাঁর, কিন্তু আর্থিক দূরবস্থার জন্যে শেখার সুযোগ হলো না। কিছুকাল পর জাঁ ভালজাঁর বাবাও মারা গেল। গাছের ডাল কাটার সময় ওপর থেকে পড়ে একদিন আচমকা চিরবিদায় নিল সে। একা হয়ে গেল জাঁ ভালজাঁ।

বড় বোন বাধ্য হয়ে তাকে আশ্রয় দিল নিজের সংসারে। তার সংসারের অবস্থা তখন ভীষণ শোচনীয়। অবর্ণনীয় অভাব সেখানে। কারণ ততদিনে সে সাত-সাতটি সন্তানের মা হয়েছে। বড়টির বয়স সবে আট, আর ছোটটির মাত্র এক। ওদিকে ভগ্নিপতির স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছে তখন।

সংসারে পেট যত বেড়েছে, তার পরিশ্রমও বেড়েছে সেই হারে, অথচ পরিমাণমত খাবার জোটেনি। অতিখাটুনির ফলে দিনে দিনে তার অবস্থার অবণতি ঘটতেই থাকল। বোন যদিও টুকটাক কাজ করে, কিন্তু তাতে কিছুই হয় না। সংসারে সারাক্ষণ কেবল নাই নাই, খাই খাই লেগেই আছে তার, সেই সাথে নিত্য অশান্তি আর খিটিমিটি।

জাঁ ভালজাঁর বয়স যখন পঁচিশ, হঠাৎ একদিন মারা গেল তার ভগ্নিপতি। বাজ পড়ল যেন বোনের সংসারে। সে তো বটেই, জাঁ ভালজাঁও চোখে আঁধার দেখল। এতগুলো পেট কি করে চলবে, ভাবতে গিয়ে দু'জনেরই মাথা খারাপ হওয়ার দশা। বেশি চিন্তা-ভাবনার সময় ছিল না, কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল জাঁ ভালজাঁ।

দুর্দিনে বোন তাকে আশ্রয় দিয়েছে, খেতে দিয়েছে, কাজেই আজ এই বিপদে তাকে সাহায্য করা তার কর্তব্য। বোঝ বওয়া, গরু চরানো, ফসল কাটা ইত্যদি যা যখন জোটে, তাই করতে লেগে গেল জাঁ ভালজাঁ। আয় যা হয়, পুরোটাই বোনের হাতে তুলে দেয়। দিন-রাত গাধার মত খাটে সে। এই করতে গিয়ে নিজের জীবনের সমস্ত স্বপ্ন-সাধ হাওয়ায় উবে গেল জাঁ ভালজাঁর, সংসারের নির্দয় যাতাকলে পড়ে নিষ্পেষিত হতে থাকল সে।

কিছুদিন পর বুঝল সে, কেবল মোট বয়ে আর গরু চরিয়ে বাঁচা যাবে না, অন্য কিছু করতে হবে। খাটুনিকে ভয় পায় না জাঁ ভালজাঁ। বয়সের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে সে। দেখতে ছোটখাট এক দৈত্যের মত হয়েছে। প্রচণ্ড শক্তি দেহে, চারজনের কাজ একাই করতে পারে অনায়াসে। কিন্তু আকারে-গঠনে যাই হোক, মনটা খুবই কোমল জাঁ ভালজাঁর। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখলে মন কাঁদে।

কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতে টের পেল সে, এত করেও আসলে লাভ হচ্ছে না কোন। উদয়-অস্ত অমানুষিক পরিশ্রম করেও ভাগ্নে-ভাগ্নিদের দুবেলা পেট পুরে খাওয়াতে পারছে না সে। চোখের সামনে দিনে দিনে শুকিয়ে হাড্ডিসার হয়ে যাচ্ছে ওরা। দেখে খুব কষ্ট হয় জাঁ ভালজাঁর।

শেষ পর্যন্ত সব ছেড়ে বাপের পেশা বেছে নিল সে। দিনের আলো ভাল করে ফোটার আগেই বাড়ি ছাড়ে জাঁ ভালজাঁ। জঙ্গলে গিয়ে গাছ কাটে সারাদিন ধরে। সন্ধের আগে কাঠের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে শহরে ফেরে সে, ওগুলো বেচে যা পায়, তাই দিয়ে রুটি, বাঁধা কপি, বীন, কোনদিন বা পয়সা কিছু বেশি হলে সামান্য মাংস কিনে বাড়ি ফেরে।

দিন যায়, অথচ পরিস্থিতির কোন উন্নতি নেই। ওদিকে বাজারে জিনিসপত্রের দাম একটু একটু করে চড়তে শুরু করেছে। দেশে তেমন ফলন হয়নি সেবার, যে কারণে এই মূল্যবৃদ্ধি। সবাই বলাবলি

করছে, খুব শীগগির আকাল দেখা দেবে। শুনে ভয়ে বুক কাঁপে জাঁ ভালজাঁর। কি করবে দিশা পায় না। এখনই যে সর্বগ্রাসী অভাব সংসারে, আকাল দেখা দিলে কি করবে সে? কি করে বাঁচাবে এতগুলো ছেলেমেয়েকে? এদিকে বোনটিও আজকাল মনে হয় ভাল চোখে দেখে না জাঁ ভালজাঁকে, বদলে গেছে সে অনেক। বুঝতে পারে, ওর কষ্টার্জিত টাকা-পয়সা শুষে নেয়ার জন্যে সারাক্ষণ মুখিয়ে থাকে বোন।

যদিও কোনদিনই নিজের জন্যে আলাদা করে কিছু রাখেনি জাঁ ভালজাঁ। রাখে না। উপার্জনের শেষ কড়িটি পর্যন্ত তুলে দেয় বোনের হাতে। অথচ ইদানীং বোনের অসহনীয় স্বার্থপরতা দেখলে মনে হয় ভালজাঁ বুঝি তাকে ফাঁকি দিতে আরম্ভ করেছে। নীরবে সব সহ্য করে যায় সে, বরং বোনকে খুশি করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারপরও ক্রমেই পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে। অভাব দিনকে দিন বাড়ে, সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ে সংসারের অশান্তি। তিরিক্ষি হয়ে উঠতে শুরু করল বোনের মেজাজ।

রাতে খেতে বসে টের পায় জাঁ ভালজাঁ, তার খাবারের পরিমাণ রোজই একটু একটু করে কমে আসছে। বুঝেও না বোঝার ভান করে সে, মুখ নিচু করে খেয়ে উঠে যায়। ভবিষ্যৎ আকালের কথা ভেবে দুশ্চিন্তা হয় জাঁ ভালজাঁর।

শীতকাল এসে পড়েছে। ফ্রান্স শীতপ্রধান দেশ, এ সময়ে ঘরে ঘরে ফায়ারপ্লেস জ্বালিয়ে রাখতে হয়। যে জন্যে প্রতিবছর কাঠ প্রয়োজন হয় প্রচুর পরিমাণে। অতএব চারদিকে কাঠ কাটার ধুম পড়ে গেল। এ সময়ে দম ফেলার ফুরসতও মেলে না কাঠুরেদের, সারাদিন কেবল কাজ আর কাজ। জাঁ ভালজাঁর কাজও বেড়ে গেল বহুগুণ, সেই সাথে টাকার আমদানিও কিছুটা বাড়ল। ওখান থেকে যতটা পারা যায়, আসন্ন দুর্দিনের কথা ভেবে জমা করতে লাগল ভালজাঁ। কিছু দিন মোটামুটি চলল সংসার, কিন্তু যেই কাজের চাপ কমে এল, অমনি জেঁকে বসল অভাব। ১৭৯৫ সালের শেষদিকের ঘটনা এটা।

সামান্য যে অর্থ জমা করেছিল জাঁ ভালজাঁ, দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। ওদিকে শীতও পড়ল সেবার ভীষণরকম। ঠাণ্ডা মোকাবিলার জন্যে সবার ঘরেই পর্যাপ্ত কাঠ মজুত, কাজেই ভালজাঁ পুরো বেকার। আবার শুরু হলো সেই অভাব, বোনের সারাক্ষণ খিটিমিটি আর বাচ্চাদের কান্নাকাটি। পাগল হওয়ার দশা হলো জাঁ ভালজাঁর। অন্য কোন কাজ করবে, তাও পারছে না। নেই তেমন কোন কাজ। শীতকালে এমনিতেই ঝিমিয়ে পড়ে দেশটা, সবকিছুর গতি মন্থর হয়ে পড়ে। উপোস করতে করতে ভাগ্নে-ভাগ্নিরা সব শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে গেল।

উপায় না দেখে সাহায্যের খোঁজে ছুটল জাঁ ভালজাঁ। এতদিন যাদের কাঠ কেটেছে, তারা ছাড়াও পরিচিত সবার দ্বারে দ্বারে ভিখিরীর মত ঘুরে বেড়াতে লাগল সে, অনেক কাকুতি-মিনতি করল, কিন্তু কোথাও কিছু হলো না। ওদিকে প্রায় অনাহারে আধমরা হয়ে গেছে বাড়ির প্রত্যেকে। কান্নার জন্যে যে শক্তি প্রয়োজন, তাও নেই বাচ্চাদের। সারাদিন বিছানায় পড়ে থাকে নিথর হয়ে। একেক সময় বুকের মধ্যে কাঁপন উঠে যায় জাঁ ভালজাঁর ভয়ে, মনে হয় সত্যিই বুঝি মরে গেছে ওরা। নিজেকে বড় অক্ষম মনে হয় তার। অবশেষে এল সেই বিশেষ দিনটি, যেদিন জাঁ ভালজাঁর জীবনের গতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল।

সেদিন ছিল রবিবার। রাত খানিকটা গভীর তখন। অনাহারক্লিষ্ট বোন তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে মরার মত পড়ে আছে বিছানায়। জাঁ ভালজাঁ নিজেও খুব দুর্বল, প্রায় দু'দিন বলতে গেলে কিছুই খেতে পায়নি। মাথা ঘুরছে তার একটু একটু, পেটের নাড়ি জ্বলছে। অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভাবল জাঁ ভালজাঁ। মনে হলো, সে যেন ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্যে নিজের সাথেই লড়াই করছে। অবশেষে মনস্থির করল ভালজাঁ। চোখে তার পানি। সবল-সুঠাম, দৈত্যাকার জাঁ ভালজাঁ কাঁদছে মনের দুঃখে। বিছানার দিকে তাকাল সে করুণ চোখে। গতকাল আর আজ সারাদিন এক টুকরো শুকনো রুটিও খেতে পায়নি ছেলে-মেয়েরা। আহা! না জানি কত কষ্ট পাচ্ছে ওরা।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল জাঁ ভালজাঁ। নোংরা বস্তি ছেড়ে পাড়ার বড় রাস্তায় উঠল এসে। দোকানপাট সব আগেই বন্ধ হয়ে গেছে, অন্ধকারে ডুবে আছে চারদিক। রাস্তা ফাঁকা, কেউ নেই।

পায়ে পায়ে সবচেয়ে কাছের পরিচিত এক রুটির দোকানের দিকে এগোল ভালজাঁ। উত্তেজনায় শুকিয়ে উঠেছে গলা, বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে। দোকানটার বন্ধ এক কাচের জানালার সামনে এসে দাঁড়াল সে। তার ধারণা এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে দোকানের মালিক, মবার্ট ইসাবু।

আসলে ঘুমায়নি লোকটা তখনও। সবে শোয়র আয়োজন করছিল। হঠাৎ সামনের কোথাও থেকে কাচ ভাঙার আওয়াজ কানে এল তার, চমকে উঠল ইসাবু, কান খাড়া করল। আবার উঠল আওয়াজটা। নিশ্চয়ই চোর! ভাবল সে, জানালার কাঁচ ভাঙছে তার দোকানের। পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল লোকটা। আবছা আলোছায়ায় এক লোককে দেখতে পেল সে, দোকানের জানালা ভেঙে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে লোকটা, কি যেন বের করে আনছে। কাজের ফাঁকে ভীত চোখে বারবার এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

এক সময় হাত বের করে আনল সে, দু'তিনটা বড় আকারের পাউরুটি ধরা আছে সে হাতে। ওগুলো একটা ঝোলায় পুরে আরও কয়েকটা রুটি বের করে নিল লোকটা, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগল। ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে সে অন্ধকারে। হঠাৎ হুঁশ হলো যেন দোকান মালিকের, 'চোর!', 'চোর!' করে চেঁচিয়ে উঠল সে প্রাণপণে। পড়িমরি করে ছুটল চোর ধরতে।

পিছনে আচমকা হাঁকডাক শুনে চমকে উঠল জাঁ ভালজাঁ। ঘাড় ঘোরাতেই দোকানি লোকটাকে তীরবেগে ছুটে আসতে দেখে অন্তরাত্মা কেঁপে গেল। সর্বনাশ! এক মুহূর্ত পাথরের মত স্থির হয়ে থাকল জাঁ ভালজাঁ, তারপর দৌড় দিল। কিনুত কয়েক পা যেতে না যেতেই অন্ধকারে কিসের সাথে যেন হোঁচট খেল সে, পড়ে গেল পথের ওপর। ততক্ষণে দোকানির চেচামেচিতে আরও অনেকে বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়, হৈ-হৈ শব্দে ছুটে আসছে তারা চোর ধরার জন্যে। হাঁচড়ে পাচড়ে উঠে পড়ল ভালজাঁ; আবার ছুটল, রুটির ঝোলাটা বুকের সাথে শক্ত করে চেপে ধরে আছে। যে করে হোক, ওগুলো নিয়ে বাসায় পৌঁছতেই হবে আজ। আজ ভালজাঁ প্রতিজ্ঞা করেছে, ভাগ্নে-ভাগ্নিদের মুখে কিছু না কিছু তুলে দেবেই সে। খিদের জ্বালায় ধুকে ধুকে মরতে বসেছে ওরা, মামা হয়ে সে দৃশ্য কি করে সহ্য করবে জাঁ ভালজাঁ? ডান হাতের কনুইয়ের কাছে ভীষণ জ্বালা করছে। ভাঙা কাচে লেগে অনেকখানি জায়গা কেটে গেছে ওখানে, রক্ত ঝরছে দর দর করে। সেদিকে লক্ষই নেই ভালজাঁর, জানপ্রাণ বাজি রেখে ছুটছে সে।

কিনুত দুর্ভাগ্য, আবারও হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। এর মধ্যে অনেক কাছে এসে পড়েছিল ধাওয়াকারীরা, চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল তারা ভালজাঁকে। ধরা পড়ে গেল সে। 'কে রে, ব্যাটা?' এগিয়ে এসে ওর চুল মুঠো করে ধরল দোকানি।

আরেকজন বলে উঠল, জনমের শিক্ষা দেব আজ তোমাকে, শালা!'

বিপদ বুঝে রক্তাক্ত হাত তুলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল জাঁ ভালজাঁ। নিজের অপরাধ স্বীকার করে তাকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে অনুনয় করতে লাগল। কিনুত কে শোনে ওর কথা! মুহূর্তে বৃষ্টির মত নির্দয় কিল-ঘুসি শুরু হয়ে গেল চারদিক থেকে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল জাঁ ভালজাঁ, রুটির ঝোলাটা ছিটকে কোথায় গিয়ে পড়ল কে জানে!

অমানুষিক মারের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ল জাঁ ভালজাঁ, চোখ ভরে গেল পানিতে। ওর মাঝেও বারবার অনুনয় করতে লাগল সে, "দোহাই আপনাদের! আমাকে একটু দয়া করুন। ঘরে সাতটা ছোট ছোট বাচ্চা, দুদিন ধরে না খেয়ে আছে। অনেক চেষ্টা করেও কোথাও কোন কাজ পাইনি। আমি ওদের কথা দিয়ে এসেছি, আজ ওদের জন্যে রুটি নিয়ে যাব। দয়া করে ছেড়ে দিন আমাকে।"

কারও কানে গেল না ভালজাঁর করুণ মিনতি। দয়া করা দূরে থাক, মনের সুখে পিটিয়ে ওকে আধমরা করে ফেলল তারা, তুলে দিল পুলিশের হাতে। চুরির অপরাধে আদালতে হাজির করা হলো জাঁ ভালজাঁকে, শুরু হলো বিচার। অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হলো তাকে, জাহাজের দাঁড় বাইতে হবে ভালজাঁকে এই পাঁচ বছর। রায় শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল সে। তার অনুপস্থিতিতে বোন আর ভাগ্নে-ভাগ্নিদের কি ভয়াবহ পরিণতি হবে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল ভেতরে ভেতরে। নিঃসন্দেহে মরে যাবে ওরা। একজনও বাঁচবে না। ভালজাঁ নিজে শক্ত সমর্থ এক পুরুষ হয়ে যা পারেনি, বোনটি একা কি করে পারবে তা?

সমাজের উঁচু স্তরের মানুষের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মাল জাঁ ভালজাঁর অন্তরে। ভেবে পেল না সে, যারা দীনহীন, ক্ষুধার্তকে সামান্য দয়া করতে জানে না, তারা কেমন মানুষ? এত নির্দয়, এত নিষ্ঠুর কি করে হয় মানুষ?

দণ্ডের মেয়াদ পুরো করার জন্যে ১৭৯৬ সালের এপ্রিল মাসে ফ্রান্সের বিখ্যাত সমুদ্র বন্দর তুলে পাঠানো হলো জাঁ ভালজাঁকে। ঘোড়ার গাড়িতে দীর্ঘ সাতাশ দিন লাগল সেখানে পৌঁছতে। ভালজাঁকে পরানো হলো কয়েদীদের জন্যে নির্ধারিত লাল রঙের পোশাক, যার পিঠে বড় করে লেখা: ২৪৬০১। ওটা ছিল তার ক্রমিক নম্বর। একটা জাহাজে তুলে দেয়া হলো ভালজাঁকে। সে আমলে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতদের প্রায় সবাইকে দাঁড় বাইতে হত। বাষ্পীয় ইঞ্জিন তখনও আবিষ্কার হয়নি, সমুদ্রগামী জাহাজ চলত পাল আর দাড়ের সাহায্যে। দাঁড় বাওয়া কঠিন পরিশ্রমের কাজ, স্বেচ্ছায় কেউ ও কাজ করতে চাইত না। তাই ক্রীতদাস, যুদ্ধবন্দী আর ভালজাঁর মত সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিতদের দিয়ে করানো হত কাজটা।

তাদের কেউ যাতে পালাতে না পারে, সে জন্যে লোহার শেকল দিয়ে সবার পা বেঁধে রাখা হত। শেকলের এক মাথা বাঁধা থাকত জাহাজের গায়ে মজবুত করে লাগানো লোহার আংটার সাথে, তার আরেক মাথায় থাকত তালাওয়ালা বেড়ি। পায়ের গিরের সামান্য ওপরে বেড়ি পরিয়ে তালা মেরে দেয়া হত। এভাবে জাহাজের একটা অঙ্গে পরিণত করা হত তাদেরকে। হঠাৎ ঝড়ে বা অন্য কোন কারণে যদি তলিয়ে যেত জাহাজ, দাঁড়িরাও ডুবে মরত।

শুরু হলো জাঁ ভালজাঁর দাঁড় বাওয়া। দিন নেই রাত নেই, কেবলই দাঁড় বাওয়া আর দাঁড় বাওয়া। কাজের তুলনায় পর্যাপ্ত খেতে দেয়া হয় না কয়েদীদের, যা দেয়া হয় তা এক কথায় অখাদ্য। মুখে দেয়ার মত নয়। উপায় নেই বলে আর সবার মত জাঁ ভালজাঁকেও গিলতে হয় সে সব। সাথে আছে আরেক যন্ত্রণা, দিনে অসংখ্যবার কারণে-অকারণে রক্ষীদের অকথ্য-অশ্রাব্য গাল, আর কথায় কথায় চাবুকের বাড়ি। মুখ বুজে সয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। প্রতিবাদ করতে গেলে সেধে যন্ত্রণা বাড়ানো ছাড়া আর কোন লাভ হয় না।

দিন যায় এক এক করে, জাঁ ভালজাঁও বদলে যেতে থাকে। কেমন যেন হয়ে যেতে থাকল সে একটু একটু করে। দিনে দিনে ভোতা হয়ে যেতে লাগল ভালজাঁর অনুভূতি। সবকিছুতেই নির্বিকার। ভুলে যেতে চায় অতীত। কিন্তু পারে না। থেকে থেকে চোখের সামনে ভেসে ওঠে অনাহারক্লিষ্ট ভাগ্নে-ভাগ্নিদের কঙ্কালসার চেহারা, বোনের আকুতিমাখা নিষ্প্রভ চাউনি।

ওরা সবাই কেমন আছে এখন? ভাবতে গিয়ে আনমনা হয়ে পড়ে জাঁ ভালজাঁ, বেঁচে আছে তো? কি করে চলছে অতবড় সংসার? হায়! অসহ্য খিদে আর শীতে কাতর বাচ্চাগুলো না জানি কত কাঁদছে! এ সব ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতর দুমড়ে-মুচড়ে ওঠে ভালজাঁর। মনটা বিদ্রোহ করে বসে কখনও কখনও, ইচ্ছে করে শেকল ছিঁড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু পারে না, ভীষণ মজবুত ওটা, পরখ করে দেখেছে ভালজাঁ। ওই বাঁধন ছেড়ার ক্ষমতা তার নেই।

ক্রমে আরও বদলে গেল জাঁ ভালজাঁ। ভারবাহী পশু হয়ে গেল সে। দিনরাত দাঁড় টানে মুখ বুজে, তবু মন ভরে না রক্ষীদের, থেকে থেকে সপাং সপাং চাবুক চালায় তারা, হজম করে যায় ভালজাঁ নীরবে, অন্যদের মত। মাঝেমধ্যে অন্য ধরনের শাস্তিও জোটে কপালে। ছুতোনাতা কারণ দেখিয়ে হয়তো একদিন ঘোষণা করা হলো, পরপর তিন দিন পোড়া রুটি খেয়ে থাকতে হবে ভালজাঁকে, বা এর চাইতেও আরও কঠিন কিছু, তাই সই। রা শব্দটিও না করে মেনে নেয় সে। কিন্তু তাই বা কতদিন চলে?

অবশেষে একদিন ধৈর্য হারাল জাঁ ভালজাঁ, দণ্ডবাসের চতুর্থ বছর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন। নানান অনিয়ম আর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল সে, ভেতরে সুপ্ত বিদ্রোহের বীজ নতুন করে অঙুকরিত হলো। কয়েকজন কয়েদীর সাহায্যে বেড়ি ভেঙে জাহাজ ছেড়ে পালাল একদিন জাঁ ভালজাঁ। নিজ শহরে ফিরে যাবে, তার উপায় নেই। পকেট একেবারে শূন্য। পুলিশের ভয়ে এদিক-ওদিক পালিয়ে বেড়াতে লাগল সে। দুদিন এই করেই কাটল তার। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, কেবলই এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে ছোটাছুটি করে বেড়াল।

দুর্ভাগ্য ভালজাঁর, দু'দিন যেতে না যেতেই ধরা পড়ে গেল। মোরটাইম ট্রাইবুনালে হাজির করা হলো তাকে। পালানোর জন্যে নতুন করে বিচার হলো, তাতে তিন বছর অতিরিক্ত সাজা যোগ হলো আগের দণ্ডের সাথে। অর্থাৎ পাঁচ বছরের দণ্ড ঠেকল গিয়ে আট বছরে। এই বাড়তি সাজা মন থেকে মেনে নিতে পারল না জাঁ ভালজাঁ, তাই নতুন মেয়াদ শুরু হওয়ার দিন থেকেই আবার পালানোর ফন্দি আঁটতে আরম্ভ করল।

ছয় বছরের মাথায় পেয়েও গেল সে দ্বিতীয় সুযোগ। পালাল জাঁ ভালজাঁ। কিন্তু মাত্র বারো ঘণ্টা ব্যবধানে ধরাও পড়ে গেল। দণ্ডের মেয়াদ আরও পাঁচ বছর বাড়ল, তেরো বছর হলো সব মিলিয়ে। দশ বছরের মাথায় পালাবার আরেকটা সুযোগ পেল ভালজাঁ, পালিয়ে গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তখনও পিছু ছাড়েনি, তাই আবার ধরা পড়তে হলো। নতুন বিচারে আরও তিন বছরের সাজা যোগ হলো ভালজাঁর, মোট মেয়াদ দাড়াল ষোলো বছর। অতিরিক্ত সাজা হিসেবে এবার তার গলায়ও পরানো হলো আরেকটা বেড়ি।

বারবার ধরা পড়ায় জেদ চেপে গেল ভালজাঁর, খেপে গেল সে। তেরো বছরের মাথায় শেষবারের মত বেড়ি ছিড়ে পালাল। এবার মাত্র চার ঘণ্টার মাথায় ধরা পড়ে গেল ভালজাঁ। এই দফায় আরও তিন বছর বাড়ল তার দণ্ডের মেয়াদ, মোট হলো উনিশ বছর।

কেন কে জানে, এরপর আর পালানো চেষ্টা করল না জাঁ ভালজাঁ। খাটতে এসেছিল পাঁচ বছরের সাজা, বের হলো উনিশ বছর খেটে। এসেছিল ১৭৯৬ সালে সাতাশ বছরের তরতাজা যুবক জাঁ ভালজাঁ, মুক্তি পেল ১৮১৫ সালের অক্টোবর মাসে ছেচল্লিশ বছরের প্রৌঢ় হয়ে। সময় যদিও কাবু করতে পারেনি তাকে, আগের মতই শক্ত-পোক্ত আছে সে, বরং আরও পেশীবহুল হয়েছে কঠোর পরিশ্রমের ফলে। কেবল চোখেমুখে তার ক্লান্তি আর অবসাদের ছাপ পড়েছে, এবং বুকের ভেতর উঁচুতলার মানুষদের প্রতি ঘৃণা দিনে দিনে জমে পাহাড় হয়েছে।

প্রতিবছর কারাবাসের জন্যে সরকারের তরফ থেকে কয়েদীদের ভাতা দেয়া হয় নয় ফ্রাঁ করে। সেই হিসেবে উনিশ বছরে ভালজাঁর পাওনা হয় একশো একাত্তর ফ্রাঁ। কিন্তু পুরো অর্থ পেল না সে। পেল একশো নয় ফ্রাঁ, বাকিটা মেরে দিল প্রধান রক্ষী। কম দেয়ার কারণ জানতে চাইল জাঁ ভালজাঁ, জবাবে লোকটা তেড়ে মারতে এল তাকে। এ নিয়ে তর্ক করার প্রবৃত্তি হলো না ওর। হলুদ রঙের একটা পরিচয়পত্র ধরিয়ে দেয়া হলো জাঁ ভালজাঁর হাতে, ওটা পকেটে পুরে বেরিয়ে এল।

সাধারণ ফরাসীদের পরিচয়পত্র সাদা রঙের হয়ে থাকে। ভালজাঁরটা হলুদ হওয়ার কারণ সে সাধারণ নয়, একজন দণ্ড খাটা আসামী। বিপজ্জনক অপরাধী। পথে বেরিয়ে ভাবনায় পড়ল জাঁ ভালজাঁ, কোথায় যাবে সে? কার কাছে? কে আছে তার ফ্যাভেরোলস ফিরে গেলে কেমন হয়? ভাবতে লাগল ভালজাঁ, এখনও কি বেঁচে আছে তার বোন, ভাগ্নে-ভাগ্নিরা? ওখানে গেলে কি দেখা পাবে সে ওদের?

মুক্তি পাওয়ার পরদিন হেঁটে গ্রাজি শহরে পৌঁছল জাঁ ভালজাঁ। এক গুদামের সামনে কুলিগোছের কয়েকজনকে ঠেলাগাড়ি থেকে বস্তা নামাতে দেখে এগিয়ে গেল। কিছু উপার্জন হবে ভেবে কুলি সর্দারের কাছে কাজের অনুমতি চাইল। ভালজাঁর আকার গঠন দেখে রাজি হলো সর্দার। কিছুক্ষণের মধ্যে টের পেল সে, আগন্তুক লোকটা চারজনের কাজ একাই করছে। প্রচুর শক্তি তার দেহে। খুশি হলো সর্দার।

দুপুরের দিকে এক টহল পুলিশ ঘুরতে ঘুরতে গুদামের সামনে এল। ভালজাঁকে দেখে কেমন সন্দেহ জাগল তার মনে। এত দীর্ঘ, জঙ্গলের মত দাড়ি-গোঁফওয়ালা মানুষটিকে সুবিধের মনে হলো না। কাছে এসে ভালজাঁর পরিচয়পত্র দেখতে চাইল সে, বিনা বাক্য ব্যয়ে দেখাল ওটা ভালজাঁ। কুলি সর্দারও দেখল। আগন্তুক যে কয়েদি ছিল, জানতে পেরে খুশি আরও বাড়ল তার।

কাজ শেষ হলে কুলিদের মজুরি দেয়ার সময় প্রত্যেককে ত্রিশ সাউ করে দিল সর্দার, অথচ ভালজাঁকে দিল মাত্র পনেরো সাউ।

'আমাকে কম দিলে কেন?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল জাঁ ভালজাঁ। সবার চেয়ে আমি বেশি কাজ করেছি, 'আমি কেন কম পাব?'

‘তোমার মত চোর-ছ্যাচোরের জন্যে এই বেশি,’ গম্ভীর গলায় বলল সর্দার। ‘জলদি কেটে পড়ো, নইলে বিপদে পড়ে যাবে। ভাগো!’

তিক্ততায় অন্তর ছেয়ে গেল জাঁ ভালজাঁর। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভাবল সে, আমি কি মানুষ নই?

নিতান্ত তুচ্ছ এক অপরাধে কতবড় শাস্তিটাই না দিল তাকে উঁচুতলার মানুষের তৈরি সমাজ। তারপর আইন। দেশের আইন রক্ষার দায়িত্ব যাদের ওপর, তাদেরই ক্ষমতাবান একজন কেড়ে নিল তার নায্য পাওনার বড় এক অংশ। সবশেষে এই কুলি সর্দার, এর কাছেও শোষিত হলো জাঁ ভালজাঁ। আর কত লাঞ্ছনা সইতে হবে তাকে? ভাবতে ভাবতে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে পথে নামল জাঁ ভালজাঁ।

দুই

ছোট একটা শহর, নাম ডি। সূর্য ডোবার ঘণ্টাখানেক আগে আজবদর্শন এক আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটল ডির রাস্তায়। খুব একটা লম্বা নয় সে, তবে গাট্টাগোট্টা। বয়স ছেচল্লিশ কি সাতচল্লিশ হবে। রংচটা হলদে শার্ট তার গায়ে, খুব ঢোলা। তার ওপর ধূসর রঙের বেঢপ কোট, তার আস্তিনে আবার সবুজ কাপড়ের তালি। পরনে মলিন নীল ট্রাউজার, সেটাও ঢলঢলে। গলায় দড়ির মত পেঁচানো মাফলার। পায়ে ভোতা নাকের ভারী জুতো। মোজা নেই।

পিঠে বড় একটা কাপড়ের ঝোলা আগন্তুকের, হাতে ছড়ি। মাথায় চওড়া কিনারাওয়ালা টুপি অর্ধেক মুখ ঢেকে রেখেছে তার, চেহারা দেখা যায় না ভাল করে। অযত্নে বেড়ে ওঠা দাড়িগোঁফে মুখ ভরে আছে। লোকটাকে সুবিধের মনে হলো না শহরবাসীদের। তার চেহারা, ভাবভঙ্গি যেন কেমন অদ্ভুত।

বুলেভার্ড গ্যাসেনডির এক ঝর্ণা থেকে প্রচুর পানি খেল আগন্তুক। তারপর রু পোশেভার্ট হয়ে মেয়রের অফিসে গিয়ে ঢুকল। এরমধ্যে তাকে পাগল ধরনের কিছু ভেবে শহরের বেশ কিছু ছেলে-ছোকরা পিছু নিয়েছিল, বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল তারা লোকটির বেরিয়ে আসার অপেক্ষায়। বেশ অনেকক্ষণ পর বের হলো সে। কোনদিক না তাকিয়ে সোজা বাজারের দিকে চলল।

বাজারে ঢোকার মুখে লা ক্রোইক্স ডি কলবাস নামে বড় একটা সরাইখানা দেখতে পেয়ে তার সামনে থমকে দাড়াল সে। ভেতর থেকে মাংস রান্নার সুগন্ধ আসছে। মুহূর্তে জিভে পানি এসে গেল আগন্তুকের, খিদেয় মুচড়ে উঠল পেট। আজ সারাদিন হেঁটেছে সে প্রায় অভুক্ত অবস্থায়। তেমন কিছু খাওয়ার সুযোগ পায়নি। খাওয়া আর রাতে মাথা গোজার একটা ঠাঁইয়ের সন্ধানেই বাজারে এসেছিল আগন্তুক। নাকে মাংসের গন্ধ পেয়ে আর সহ্য হলো না, তাড়াতাড়ি সরাইখানায় ঢুকে পড়ল সে।

সামনেই চুলোর কাছে বসে ছিল সরাইখানার মালিক, মুখ নিচু করে কাজ করছে। দরজার শব্দ কানে যেতে না তাকিয়েই বুঝল সে ভেতরে খদ্দের ঢুকেছে। 'কি সেবা করতে পারি আপনার, মাঁসিয়ে?' আগের মতই মুখ নিচু করে আছে সে। 'বলুন, কি চাই?'

'প্রথমে খাবার চাই। তারপর রাতে থাকার জায়গা।'

'কোন সমস্যা নেই, হাসিমুখে অতিথির দিকে তাকাল মালিক, থমকে গেল পরক্ষণে তার চেহারা-সুরত, বেশভূষা দেখে। তবে টাকা লাগবে,' খানিক ইতস্তত করে যোগ করল সে।

পকেট থেকে চামড়ার বড় একটা মানিব্যাগ বের করে দেখাল আগন্তুক। 'অবশ্যই! টাকা আছে আমার কাছে।'

আশ্বস্ত হলো মালিক। ঠিক আছে, বসুন।

কাঁধের ঝোলা মেঝেতে রেখে একটা টুল নিয়ে চুলোর কাছে গিয়ে বসল আজবদর্শন খদ্দের। চুলোটা প্রবেশপথের পাশেই, মালিক ওটার মুখোমুখি বসা। ডি পাহাড়ের ওপরে। অক্টোবরে প্রচণ্ড শীত পড়ে এখানে। ছড়ির ওপর থুতনি রেখে আগুন পোহাতে লাগল আগন্তুক। অন্যমনস্কের মত তাকিয়ে আছে চুলোর দিকে। কোন এক গভীর চিন্তায় ডুবে আছে।

হাতের কাজ রেখে উঠে পড়ল মালিক। সন্ধে হয়ে এসেছে প্রায়, রাতে ডিনারে প্রচুর খদ্দের হয়, তাদের আপ্যায়নের জোগাড়যন্ত্রে লাগতে হবে তাকে। ঘুরে ঘুরে এটা-ওটা করতে লাগল সে, কিন্তু চোখ লেপটে থাকল তার আগন্তুকের ওপর।

'ডিনার রেডি?' এক সময় জানতে চাইল লোকটা।

'এই তো, আরেকটু,' বলল মালিক। কিছু একটা ভাবল সে। তারপর আগন্তুকের দিকে পিছন ফিরে এক টুকরো কাগজে কিছু লিখল পেন্সিল দিয়ে। কাগজটা হোটেলের এক কিশোর কর্মচারীর হাতে দিয়ে কি যেন বলল নিচু কণ্ঠে। মাথা ঝাকাল ছেলেটা, তারপর তীরবেগে ছুটল মেয়রের অফিসের দিকে। এসবের কিছুই চোখে পড়ল না অন্যমনস্ক আগন্তুকের, পলকহীন চোখে আগুন দেখছে সে। তার ঘোরে ঢুলছে থেকে থেকে।

কিছুক্ষণ পর সিধে হলো সে। 'ডিনারের আর কত দেরি?'

‘এই তো, হয়ে এসেছে প্রায়। আর দেরি নেই।’ নিজের আসনে সল লোকটা। কিছু একটার প্রতীক্ষা করতে লাগল অস্থির চিত্তে। মিনিট দশেক পর ছুটতে ছুটতে ফিরে এল কিশোর, কাগজের টুকরোটা তুলে দিল তার হাতে। ভাঁজ খুলে ওটা পড়ল সে, তারপর মাথা ঝাকাল সনুতষ্টমনে, যেন এমন কিছুই জানতে চাইছিল। কাগজ পকেটে পুরে আসন ছাড়ল লোকটা। পায়ে পায়ে আগনুতকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

‘মঁসিয়ে,’ গভীর কণ্ঠে বলল সে। ‘আপনাকে খেতে দিতে পারছি না আমি।’

বিস্মিত হয়ে মুখ তুলল আগনুতক। ‘কেন? ভয় পাচ্ছেন আমি খাবারের দাম দেব না ভেবে? আমি তো বলেছি টাকা আছে আমার। আপনি চাইলে অগ্রীমও দিতে পারি।’

না, তা নয়।

তাহলে কি? বিস্ময় আরও বাড়ল আগনুতকের।

‘থাকার জায়গা দিতে পারব না আপনাকে।

‘এই কথা? ঠিক আছে, আমি না হয় আস্তাবলেই থাকব। একট রাতেরই তো ব্যাপার, আমার কোন কষ্ট হবে না।’

‘তাও সম্ভব নয়,’ একরোখা গলায় বলল মালিক।

কেন?

‘ওখানে জায়গার অভাব।’

“ঠিক আছে,” একটু ভেবে বলল আগনুতক। ‘না হয় চিলেকোঠাতেই থাকব আমি। সে খাওয়ার পর দেখা যাবে। আগে ডিনারের ব্যবস্থা তো করুন!'

‘বললাম না খাবার দেয়া যাবে না?' রেগে উঠল লোকটা।

উঠে দাঁড়াল আগনুতক। 'দেখুন, মঁসিয়ে, সারাদিন আজ হেঁটেছি আমি। প্রায় বারো লীগ (এক লীগ=সাড়ে তিন মাইল) হেঁটেছি, চল্লিশ বেয়াল্লিশ মাইল পথ। কিছু খাইনি, খিদের যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি আমি। দয়া করে কিছু খেতে দিন।’

‘হবে না। বাড়তি খাবার নেই।'

চুলোর দিকে ইঙ্গিত করুল আগনুতক। পাশে সার দিয়ে রাখা বড় বড় কয়েকটা হাঁড়ি দেখাল। ‘এত খাবার কে খাবে?’

‘খদ্দেরের অভাব নেই। অনেক বিদেশী অতিথি এসেছে আজ আমার এখানে। বারোজন। তারা খাবে।'

কিনুত বিশজন খেলেও তো এত খাবার শেষ হবে না!

‘তবু আপনাকে খেতে দিতে পারব না আমি, মঁসিয়ে। চলে যান আপনি।’

ধপ করে বসে পড়ল ক্লান্ত আগনুতক। ‘এটা একটা সরাইখানা। আমি ক্ষুধার্ত এক পথিক, আমাকে থাকতে এবং খেতে দিতে আপনি বাধ্য, মঁসিয়ে। কাজেই আমি যাচ্ছি না।'

‘চলে যাও!' চাপা কণ্ঠে বলল মালিক। রাগে কাঁপছে। ‘আমি চিনেছি তোমাকে! জানি তুমি কে, কি তোমার পরিচয়। তোমাকে প্রথম দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, জা ভালজাঁ। পরে মেয়রের অফিসে খোঁজ নিয়ে নিশ্চিত হয়েছি। বেরিয়ে যাও! আমাকে দুর্ব্যবহার করতে বাধ্য কোরো 'না! এটা ভদ্রলোকের জায়গা, সরাইখানা বানিয়েছি আমি তাদের জন্যে। তোমার মত চোরের জন্যে নয়! চলে যাও।’

মুখ কালো হয়ে গেল জাঁ ভালজাঁর। কয়েক মুহূর্ত মাথা নিচু করে বসে থাকল সে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, ঝোলা কাঁধে তুলে ক্লান্ত পায়ে বেরিয়ে গেল। ততক্ষণে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে, এখনই রাত নামবে। আলপস পর্বতমালা থেকে ভেসে আসা হীম বাতাসে গায়ে কাঁটা দিল ভালজাঁর। রাতটা কোথায় কাটানো যায় ভেবে অস্থির হয়ে উঠল সে, এই ঠাণ্ডায় খোলা জায়গায় থাকা কোনমতেই সম্ভব নয়। খাবার না হয় নাই পেল, অন্তত মাথা গোঁজার একটা ঠাই তাকে পেতেই হবে যে করে হোক।

অনেক দূরে, এ রাস্তার প্রায় শেষ মাথায় আরেকটা সরাইখানা দেখে আশান্বিত হয়ে উঠল জাঁ

ভালজাঁ, তাড়াতাড়ি এগোল সেদিকে। ওদিকে পিছনে লেগে রয়েছে দুই ছেলের দল, নানারকম মন্তব্য, কটুক্তি চুড়ছে তারা ভালজাঁকে লক্ষ করে। খেয়াল নেই তার, হেঁটে চলেছে আপনমনে। খিদে, তৃষ্ণা আর পথ চলার প্রচণ্ড ক্লান্তিতে সম্পূর্ণ কাহিল জা ভালজাঁ।

প্রথম অভ্যর্থনা এখানেও আগেরবারের মতই হলো। ওকে ঢুকতে দেখে প্রশ্ন করল মালিক, 'কে?'

'পথিক। খাবার আর রাতে থাকার জায়গা চাই,' বলল জাঁ ভালজাঁ। ধরেই নিয়ে ছিল এটাতেও জায়গা হবে না। কিন্তু লোকটার প্রতি উত্তরে সামান্য আশার আলো দেখতে পেল যেন।

'ঠিক আছে। ভেতরে এসে বসুন।'

ঢুকে পড়ল জাঁ ভালজাঁ। ঝোলাটা দরজার কাছে রেখে তাড়াতাড়ি ফায়ারপ্লেসের সামনে গিয়ে বসল। মোজা না থাকায় জুতোর ভেতর পায়ের পাতা, আঙুল, সব প্রায় জমে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে তার। দু'পা আগুনের যত কাছে সম্ভব এগিয়ে দিয়ে বল জাঁ ভালজাঁ। আগুনের উত্তাপ পেয়ে ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে পেল সে। আবেশে দু'চোখ মুদে এল। খেয়াল করেনি, আরও একজন খদ্দের এসে ঢুকেছে ভেতরে।

চোখ বুজে বসে থাকা জাঁ ভালজাঁকে দেখামাত্র কপাল কুঁচকে উঠল লোকটার। স্থানীয় এক জেলে সে। আজ সকালে ওই কিম্ভুতদর্শন, সন্দেহজনক মানুষটিকে প্রথম দেখেছে সে ব্রাস ডি আসি আর এসকুরন শহরের মাঝামাঝি স্থানে, জোর কদমে ডির দিকে আসতে দেখেছে সে তাকে। অনেক দূরের এক জেলে পল্লী থেকে মাছ কিনে স্থানীয় বাজারে রেসুটরেন্টে বিক্রি করার জন্যে ডি ফিরছিল সে তখন।

আধঘণ্টা আগে দ্বিতীয়বার লোকটাকে দেখেছে সে জ্যাকুইন ল্যাবারের সরাইখানায়, যেখান থেকে বের করে দেয়া হয়েছে তাকে। কয়েক মুহূর্ত ভালজাঁকে দেখল জেলে লোকটা, তারপর এগিয়ে গেল মালিকের দিকে। মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলল কিছু তাকে। সাথে সাথে চেহারা পাল্টে গেল মালিকের কাছে গিয়ে জাঁ ভালজাঁর কাধ ধরে ঝাকি দিল সে জোরে। 'এখনই বেরিয়ে যাও এখান থেকে!'

মুখ তুলে তাকে দেখল ভালজাঁ। এবার তেমন একটা অবাক হতে দেখা গেল না তাকে। শান্ত কণ্ঠে শুধু বলল, 'ওহ্! আপনিও তাহলে জেনে গেছেন?'

হ্যাঁ

'আগে এক সরাইখানায় গিয়েছিলাম, সেখান থেকেও বের করে দেয়া হয়েছে আমাকে,' বিড়বিড় করে বলল ভালজাঁ।

'এখান থেকে বের করে দেব আমি।'

'কোথায় যাব তাহলে?'

'যেখানে খুশি,' ব্যঙ্গের সুরে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল মালিক।

ঝোলা আর ছড়ি নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ল জাঁ ভালজাঁ। ধীরপায়ে হাঁটতে লাগল অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। তখনও ছেলে-ছোকরার দল লেগে আছে তার পিছনে। ওদের মধ্যে বাঁদরগোছের কয়েকটা ছোট ছোট পাথর ছুঁড়তে লাগল ভালজাঁকে লক্ষ্য করে। প্রথমে আমল দিল না ও, ভাবল, সন্ধে হয়ে গেছে, এখনই যার যার বাড়ি ফিরে যাবে ওরা। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পেরিয়ে যাওয়ার পরও তেমন কোন লক্ষণ ওদের মাঝে দেখা গেল না। বরং 'পাগল' কিছু বলছে না দেখে উৎসাহ হাজারগুণ বেড়ে গেছে, বিপুল বিক্রমে নিজেদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তারা। এক সময় ব্যাপারটা অসহ্য লাগল ভালজাঁর, হাতের ছড়ি তুলে ধাওয়া করল সে ওদের। ভয় পেয়ে দিগ্বিদিক ছুটল সবাই, মুহূর্তে এ গলি ও গলিতে ঢুকে পড়ল।

হাঁটতে হাঁটতে শহরের জেলখানার সামনে চলে এল জাঁ ভালজাঁ। মূল ফটকের সামনে শেকলের সাথে ঝোলানো একটা ঘণ্টা দেখে সেদিকে এগোল। ঘণ্টী বাজাল সে। ফটকের গায়ের চৌকো একটা অংশ পাশে সরে গেল ভেতর থেকে, ছোট একটা ফোকর উন্মুক্ত হলো। ভেতর থেকে হেঁকে উঠল ফটকের এক রক্ষী, 'কে?'

মঁসিয়ে, আজকে রাতটা ভেতরে কাটাতে পারি?

'এটা সরাইখানা নয়, বাপু, জেলখানা। কিছু একটা ঘটিয়ে এসো, তাহলে থাকতে পারবে।' ঘটাং শব্দে বুজে গেল ফোকরটা।

হতাশ হয়ে আবার পা চালাল জাঁ ভালজাঁ। কিছুক্ষণের মধ্যে এক আবাসিক এলাকায় এসে পড়ল। পথের দুদিকে সুন্দর সুন্দর একতলা দোতলা বাড়ি। প্রতিটির সামনে বেশ খানিকটা করে খোলা জায়গা, চমৎকার ফুলের বাগান সেখানে। একটা প্রকাণ্ড একতলা বাড়ির জানালায় আলো দেখে আশান্বিত হয়ে উঠল ভালজাঁ। ধপধপে সাদা রং করা বাড়িটা দেখলেই বোঝা যায় মালিক খুব পয়সাওয়ালা। সাহস করে এগোল জাঁ ভালজাঁ, বাগান পেরিয়ে বাড়িটার বারান্দায় উঠে এল।

পর্দা সরানো কাঁচের জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে তাকাল ভালজাঁ। যা ভেবেছিল ঠিক তাই, এক পলক দেখেই বুঝল সে, এ বাড়ির মালিক খুব বড়লোক। সামনের বিশাল হলরুমের মাঝখানে পাতা বড় একটা ডাইনিং টেবিলের একপাশে বসে আছে গৃহকর্তা। সুখী মানুষের মত চেহারা। একটা তিন-চার বছরের শিশু খেলা করছে তার কোলে বসে। কর্তার মুখোমুখি বসা এক অল্পবয়সী মহিলা। তার কোলেও একটি শিশু, বড়জোর বছরখানেক বয়স হবে শিশুটির।

কর্তার সামনে একটা গ্লাসে গলা সমান ওয়াইন চিকচিক করছে। ওটার পাশে একটা সুপ ডিশ, ধোঁয়া উড়ছে অল্প অল্প। পেটের মধ্যে আবার মুচড়ে উঠল জাঁ ভালজাঁর। বন্ধ দরজায় টোকা দিল সে। হাসি গল্পে ব্যস্ত বাড়ির কর্তা-গিন্নি, তাই শুনতে পেল না আওয়াজটা। আবার টোকা দিল ভালজাঁ। তৃতীয়বার নক করতে ভেতরের কথাবার্তা থেমে গেল, উঠে এসে দরজা খুলল কর্তা। এক হাতে পিতলের তৈরি সুন্দর একটা ল্যাম্প। আলো উচু করে সামনে তাকাল লোকটা। 'কে?'

'মাফ করবেন, মঁসিয়ে,' বিনীত কণ্ঠে বলল ভালজাঁ। আমি এক পথিক, খুব ক্লান্ত। উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে যদি আমাকে এক বাটি সুপ আর আজকের রাতটা থাকার মত একটা জায়গা দিতেন, এই বারান্দার এক কোণে হলেও কোন অসুবিধে নেই, খুবই উপকৃত হতাম আমি।

আপনি কে? সন্দিগ্ধ গলায় প্রশ্ন করল কর্তা।

আমি অনেক দূর থেকে এসেছি, মঁসিয়ে। সেই পাই-মইসন থেকে বারো লীগ পথ হেঁটে একটু আগে পৌঁছেছি এখানে।

কিন্তু এখানে কেন এসেছেন আপনি? কোন সরাইখানায় যাননি কেন?

'গিয়েছিলাম, মঁসিয়ে, গলা নেমে গেল ভালজাঁর। কিন্তু জায়গা পাইনি।'

'দুটো সরাইখানার একটাতেও না?' সন্দেহ আরও বাড়ল কর্তার। 'দুটোতেই গিয়েছিলেন?'

মাথা দোলাল ভালজাঁ। এ বাড়িতে রাত কাটানোর যে দূরাশা করেছিল, কর্তার কঠিন জেরার মুখে পড়ে ততক্ষণে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে তা।

এ অসম্ভব! হতেই পারে না।

সত্যি বলছি, মঁসিয়ে, গিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা কেউ থাকতে দিল না আমাকে।

আলোটা আরেকটু উঁচু করে ধরল কর্তা, ভালজাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘন ঘন চোখ বোলাল কয়েকবার। দেখতে দেখতে চেহারায় গভীর সন্দেহ আর অবিশ্বাস ফুটল তার। বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, বুঝতে পেরেছি! তুমিই সেই লোক, তাই না?

উত্তর দিল না জাঁ ভালজাঁ, মাথা নত হয়ে এল তার আপনাআপনি।

চট করে পিছিয়ে গেল কর্তা, আলো রেখে থাবা দিয়ে দেয়ালে ঝোলানো বন্দুক হাতে তুলে নিল। আগন্তুকের সাথে কর্তার কথাবার্তা শুনতে পায়নি গিন্নি, তাই বুঝতে পারেনি কি চলছে সামনে। হঠাৎ অগ্নিমূর্তি হয়ে তাকে বন্দুক হাতে নিতে দেখে চমকে উঠল সে, দ্রুত আঁকড়ে ধরল শিশু দুটিকে।

দূর হও এখান থেকে? হুঙ্কার ছাড়ল কর্তা।

বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল জাঁ ভালজাঁর। যাচ্ছি, মৃদু স্বরে বলল ও। একগ্লাস পানিই না হয় দিন, মঁসিয়ে। তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

আর এক মুহূর্ত দেরি করলে পানি নয়, গুলি খাবে তুমি। বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।

নীরবে বেরিয়ে এল ভালজাঁ। পিছনে দড়াম শব্দ শুনে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে তাকাল এক পলক। দরজা বন্ধ হয়ে গেছে দেখল সে। জানালার সামনে মুহূর্তের জন্যে দেখা গেল কর্তাকে। পর্দা টেনে দিল সে জানালার। পথের দিকে মন দিল জাঁ ভালজাঁ। ঠাণ্ডা বাতাসের তোড় আরও বেড়েছে এর মধ্যে। হাড়ের ভেতরের মজ্জা পর্যন্ত কাপতে শুরু করেছে তার প্রচণ্ড শীতে, হিহি করছে সে।

বেশ খানিকটা দূরে এসে পথের পাশে একটা কুঁড়ে দেখে থমকে দাঁড়াল ভালজাঁ। ঘরটা নিচু, ভেতরে অন্ধকার। মানুষজন আছে বলে মনে হলো না। খুশি হয়ে উঠল সে, দ্রুত পায়ে এগোল সেদিকে। ঘরটার প্রবেশপথ বেশ অপ্রশস্ত, এবং নিচু। অতসব দেখার সময় নেই, হামাগুঁড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল জাঁ ভালজাঁ। খুশি হয়ে উঠল সে মেঝেতে খড়ের পুরু গদি বিছানো আছে টের পেয়ে। বেশ উষ্ণ ভেতরটা। ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাল ভালজাঁ, তাড়াতাড়ি কাঁধের ঝোলা নামিয়ে ওটাকে বালিশ বানিয়ে শোয়ার আয়োজন করল। খাওয়ার চিন্তা কাল করা যাবে, ভাবল সে, এখন ঘুমানো যাক। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে আর এক পা ও এগোবার শক্তি নেই।

হঠাৎ গর গর গভীর আওয়াজ শুনে চমকে উঠল জাঁ ভালজাঁ, ঘুরে তাকাল দরজার দিকে। বিশাল একটা বুল ডগের ওপর চোখ পড়ল তার, ভেতরে মাথা ভরে দিয়ে ভালজাঁকে দেখছে ওটা, তার থাকার জায়গায় কার এতবড় সাহস যে ঢুকেছে, ভাবছে হয়তো। রাগে গজরাচ্ছে। আচমকা বাঘের মত হুঙ্কার ছাড়ল কুকুরটা।

এটা তাহলে কুকুরের ঘর! চরম হতাশ হয়ে ভাবল জাঁ ভালজাঁ। আবার হুঙ্কার ছাড়ল বুল ডগ। এমনিতে গায়ে প্রচণ্ড শক্তি ধরে ভালজাঁ, একটা-দুটো কুকুরকে পরোয়া করার কোন কারণ নেই তার। কিন্তু এখনকার কথা আলাদা। এ পর্যন্ত এখানে যে ধরনের অভ্যর্থনা সে পেয়েছে, তাতে কিছু করতে ভরসা হলো না। জন্তুটার হাঁক-ডাক শুনে যদি মানুষ জমে যায়, নতুন বিপদে পড়তে হবে তাকে।

এক হাতে ঝোলাটা তুলে নিল ভালজাঁ, অন্য হাতে ছড়ি উঁচিয়ে কুকুরটাকে আঘাত করার ভান করল, ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল ওটা, এই ফাঁকে দ্রুত বেরিয়ে পড়ল সে এত আরামের জায়গা ছেড়ে। কিন্তু সহজে মুক্তি পেল না, লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে তার পা কামড়ে দিল বুল ডগ, ফড়াৎ করে অনেকখানি ছিড়ে গেল ভালজাঁর মলিন ট্রাউজার। ভাগ্য ভাল কামড়টা ঠিকমত বসাতে পারেনি কুকুর, তার আগেই ঝটকা মেরে পা মুক্ত করে নিতে পেরেছে জাঁ ভালজাঁ। ছড়ি তুলে তেড়ে গেল সে, ছুটে সামনে থেকে সরে গেল বুল ডগ।

আবার পথে নামল জাঁ ভালজাঁ। চলতে পারছে না, তবু চলতে হবে। ফের কোথায় গেলে আশ্রয় জুটবে, আদৌ জুটবে কি না, কে জানে! ঘুমে চোখ বুজে আসছে তার আপনাআপনি, প্রাণপণ সংগ্রাম করেও খুলে রাখতে পারছে না। একটা কুকুরও আজ তাকে সইতে পারে না ভেবে নিজেকে করুণা করতে ইচ্ছে হলো ভালজাঁর। মাতালের মত টলতে টলতে এগিয়ে চলল সে, থুতনি ঠেকে আছে বুকের সাথে। এ শহর ভালজাঁর অচেনা, রাতের আঁধারে কোনদিক থেকে কোনদিকে চলেছে জানে না সে। জানতেও চায় না। লোকালয় থেকে সরে যেতে চায় সে। দূরে কোথাও।

কিন্তু পা আর এগোতে চায় না। দেহের শক্তি পুরোপুরি নিঃশেষিত হয়ে গেছে তখন জাঁ ভালজাঁর। চারদিকে তাকাল সে, সামনেই বড় গির্জা আর বড়সড় একটা পাকা চত্বর দেখে অনুমান করল, এটা সম্ভবত ক্যাথেড্রাল স্কয়ার হবে। স্কয়ারের এক কোণে একটা ছাপাখানা দেখা গেল, পাথরের একটা বেঞ্চ রয়েছে তার সামনে। ঘোরের মধ্যে সেদিকেই এগোল জাঁ ভালজাঁ। জায়গাটা উন্মুক্ত, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ওখানে যে বেশিক্ষণ টেকা যাবে না, খেয়ালই নেই তার। বেঞ্চের ওপর বসল জাঁ ভালজাঁ, দু'পা তুলে শুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। প্রায় একই সময় এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এল গির্জার ভেতর থেকে। বেঞ্চের ওপর অন্ধকারে কেউ একজন শুয়ে আছে দেখে তাড়াতাড়ি কাছে এসে দাঁড়াল সে।

'কে ওখানে? এই খোলা জায়গায় কেন শুয়ে আছ তুমি?' প্রশ্ন করল বৃদ্ধা।

'আমি ভিনদেশী, বুড়িমা,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল জাঁ ভালজাঁ। 'এখানে ঘুমাব বলে শুয়েছি।'

'সে কি!' আঁতকে উঠল বৃদ্ধা। খোলা জায়গায়, 'পাথরের বেঞ্চে ঘুমাবে তুমি এই শীতের মধ্যে?'

'তাতে কি?' তিক্ত কণ্ঠে বলল সে, 'উনিশ বছর ঘুমিয়েছি কাঠের বেঞ্চে, কিছু হয়নি। পাথরের

বেঞ্চে এক রাত ঘুমালে কি আর হবে?'

'ও, বুঝেছি। তুমি তাহলে সৈনিক?'

এত দুঃখেও হাসি পেল জাঁ ভালজাঁর। 'হ্যাঁ, সৈনিকই বটে।'

'কিন্তু, বাবা, প্রচণ্ড শীতে জমে যাবে তুমি বাইরে থাকলে। তারচে কোন সরাইখানায় আশ্রয় নাও না কেন?'

বুড়ির কণ্ঠে দরদ আছে টের পেয়ে ভাল লাগল জাঁ ভালজাঁর।

'গিয়েছিলাম, বুড়িমা। কিন্তু কেউ আশ্রয় দিল না।'

'ও মা! বিস্মিত হলো বদ্ধা। সে কি কথা? আশ্রয় দেবে না কেন?' বলে কিছুক্ষণ ভাবল সে, এদিক-ওদিক তাকাল। হঠাৎ কি খেয়াল হতে চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। 'তুমি এক কাজ করো, বাপু। ওই যে বাড়িটা দেখছ,' ক্যাথেড্রালের সাথে বড় বাড়িটা দেখাল নে। 'ওখানে যাও। ওখানে নিশ্চই একটা রাতের জন্যে আশ্রয় পাবে তুমি।'

উঠে বসল জাঁ ভালজাঁ। আশা করতে ভরসা হলো না, তবু, ত্যাগ করতেও পারুল না পুরোপুরি। 'সত্যি বলছ?'

'নিশ্চই! তাড়াতাড়ি যাও।'

'ওটা কার বাড়ি, বুড়িমা?'

'যাও না, গেলেই দেখবে।'

তিন

শার্ল ফ্রাঁসোয়া বিয়েঁভেনু মিরিয়েল ডির বিশপ। ছিয়াত্তর বছর বয়স তাঁর, কিনুত সুঠাম স্বাস্থ্য দেখলে ষাটের বেশি মনে হয় না। উচ্চতা মাঝারি, একটু মোটাসোটা গড়ন তার। প্রশস্ত কপাল, চুল সব ধপধপে সাদা। চেহারায় দরদী, অমায়িক ভদ্রলোকের ছাপ সুস্পষ্ট। হাসিতে নিষ্পাপ শিশুর সরলতা বিয়েঁভেনু মিরিয়েলের। উদারচিত্ত, দানবীর এই বিশপের জন্যে ডি গর্বিত।

মাত্র কয়েক মাস আগে ডির বিশপ হয়ে এসেছেন মিরিয়েল, এরমধ্যেই চারদিকে ছড়িয়ে গেছে তাঁর সুনাম। দশ বছরের ছোট এক বোন, ব্যাপ্টিস্টিন, আর এক বুড়ি পরিচারিকা, ম্যাগলোয়ের, এই নিয়ে বিশপ মিরিয়েলের সংসার।

মর্যাদার দিক থেকে ফ্রান্সে প্রধান সেনাপতির পরই বিশপের স্থান। সেই অনুযায়ী অন্য সব শহরের মত ডির বিশপের সরকারী বাসভবনও ছিল প্রায় রাজকীয় প্রাসাদের মত, যেমন বিশাল, রক্ষণাবেক্ষণে তেমনি ব্যয়বহুল। প্রথম যখন ডি এলেন ফাদার মিরিয়েল, ব্যাপারটা খুবই বেখাপ্পা ঠেকল তার। কারণ পাশেই শহরের সরকারী হাসপাতাল। বেশ ছোট আর পুরনো ভবন সেটা, ভীষণ স্যাঁতসেঁতে। জায়গার অভাবে গাদাগাদি করে থাকতে হয় রুগীদের। অথচ ওদিকে তার জন্যে অহেতুক বিশাল প্রাসাদের আয়োজন।

হাসপাতাল সুপারের সাথে কথা বললেন ফাদার মিরিয়েল, সাতদিনের মধ্যে হাসপাতাল স্থানান্তরিত হলো বিশপের প্রাসাদে, আর তিনি চলে গেলেন হাসপাতালে। এমনি উদার ও মহানুভব মানুষ তিনি।

এ মুহূর্তে নিজের রুমে বসে আছেন ফাদার মিরিয়েল। ইদানীং এক বিশেষ কাজে হাত দিয়েছেন তিনি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুখী-সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলতে হলে কি করতে হবে, তারই ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ গবেষণামূলক এক বই লেখা। তাই নিয়ে ব্যস্ত ফাদার এ মুহূর্তে। রাত আটটা। ম্যাগলোয়ের এসে ঢুকল ঘরে। ফাদারের বিছানার মাথার দিকের একটা তাক থেকে দুটো সুদৃশ্য রূপোর থালা নিয়ে বেরিয়ে গেল। রাতের খাবার তৈরি, বুঝলেন ফাদার, থালা নিতে এসে তাই বুঝিয়ে গেল মহিলা।

লেখা বন্ধ করে উঠলেন তিনি। পাশের ডাইনিং রূমে চলে এলেন। ততক্ষণে টেবিল সাজানো হয়ে গেছে। লক্ষ করলেন ফাদার, কি নিয়ে যেন নিচু কণ্ঠে আলোচনা করছে ব্যাপ্টিস্টিন আর ম্যাগলোয়ের। দুজনকেই বেশ চিন্তিত মনে হলো তার।

'কি ব্যাপার?' প্রশ্ন করলেন ফাদার মিরিয়েল। 'কি হয়েছে?'

ম্যাগলোয়ের হড়বড় করে যা বলল, তা এরকমঃ একটু আগে বাজার থেকে ফিরেছে সে। বাজারের সবার মুখে এক অদ্ভুত আগন্তুকের কথা শুনে এসেছে। অপরিচিতলোক সে, কোত্থেকে এসেছে কেউ জানে না। খুবই সন্দেহজনক মানুষ, স্বভাব-চরিত্র ভাল না। এ শহরেরই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে সে, সবাই আশঙ্কা করছে, কিছু একটা অঘটন ঘটাবে লোকটা আজ রাতে।

'এই কথা?' স্মিত হাসি ফুটল ফাদারের মুখে। 'তাতে এত চিন্তার কি আছে আপনাদের?'

'বলেন কি, ফাদার!' বিস্ময় প্রকাশ করল পরিচারিকা। 'সামনের দরজার ছিটকিনিটা কোন কাজেরই না। কতদিন থেকে আপনাকে বলছি ঠিক করাবার কথা, আপনি শোনেননি। চেষ্টা করলে একটা বাচ্চা ছেলেও খুলে ফেলতে পারে ওটা বাইরে থেকে। তারওপর রাস্তায় বাতি নেই, সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকার, কি মুশকিলের কথা ভাবুন তো? সত্যি যদি লোকটা এদিকে আসে রাতে, কি অবস্থা হবে?'

একটু থেমে আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল বৃদ্ধা, এমন সময় বন্ধ দরজায় করাঘাতের শব্দ হলো। চট করে মুখ বুজে ফেলল সে।

'ভেতরে আসুন!' আহবান জানালেন ফাদার।

খুলে গেল ভেড়ানো দরজা। ভেতরে এসে দাঁড়াল জাঁ ভালজাঁ। ভেতরের সবার ওপর চোখ বোলাল সে। তার চেহারা আর পোশাক আশাক দেখে জায়গায় জমে গেল ম্যাগলোয়ের, এতই ভয় পেয়েছে যে চিৎকার করার সাহসও হারিয়ে ফেলেছে। চোখ বড় করে একদৃষ্টে ভয়ঙ্কর দর্শন

আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে থাকল বৃদ্ধা। তাকে দেখামাত্রই বুঝেছে সে, এ সেই লোক না হয়েই যায় না, যার কথা বাজারে শুনে এসেছে একটু আগে। অশুভ কিছু একটা ঘটার অপেক্ষায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে।

ব্যাপ্টিস্টিন ভয় পেলেন না বটে, তবে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন। ওদিকে ফাদার মিরিয়েল আগ্রহী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন লোকটির দিকে। প্রথম দর্শনেই বুঝলেন, চেহারা যাই হোক, মানুষটা খুবই ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত।

তাঁকে দেখল জাঁ ভালজাঁ, চেহারায় বেপরোয়া একটা ভাব ফুটে আছে তার। ঠিক করে এসেছে সে, প্রথম চোটেই নিজের সত্যিকার পরিচয় জানাবে এখানে। অপরাধের কথা, দণ্ড খেটে আসার কথা জানাবে। তাতে যদি আশ্রয় জোটে, খাবার জোটে, ভাল। না জোটে নেই। 'দেখুন, মঁসিয়ে,' বলে উঠল সে। 'আমার নাম জাঁ ভালজাঁ। আমি একজন অপরাধী, উনিশ বছর সশ্রম দণ্ড খেটেছি জাহাজে। মুক্তি পেয়েছি সবে চারদিন হলো। এই চারদিন হাঁটার ওপর আছি আমি, তুলোঁ থেকে আসছি, যাব পতারলিয়ের।'

'আজ একদিনেই হেঁটেছি বারো লীগ পথ। সন্ধের একটু আগে এ শহরে পৌঁছে একটা ইনে গিয়েছিলাম। দাম দিতে চাইলাম, এমনকি অগ্রীমও দিতে চেয়েছিলাম, তবু খেতে দেয়নি ওরা আমাকে। থাকতে দিল না, বের করে দিল। কারণ আমার পরিচয়পত্র আর সবার মত সাদা নয়, হলুদ, তাই। শহরে পা রেখে আইন অনুযায়ী প্রথমেই মেয়রের অফিসে গিয়েছিলাম আমি, আমার আসার খবর জানাতে, সেটাই বোধ হয় কাল হলো আমার।'

নীরবে ভালজাঁকে দেখছে সবাই। ফাদারের দৃষ্টিতে বেদনার আভাস। তার প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনছেন তিনি। বলে চলেছে জাঁ ভালজাঁ, 'আরেক ইনে গেলাম, সেখান থেকেও বের করে দিল ওরা। পরে এক বাড়িতে গেলাম, অর্থের বিনিময়ে এক বাটি সুপ, আর রাতটা তাদের বারান্দায় থাকতে চাইলাম, দিল না। বরং বন্দুক তুলে আমাকে গুলি করার ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিল। এক গ্লাস পানি চাইলাম, তাও দিল না।

তারপর গেলাম শহরের জেলখানায়, রাতটা ভেতরে কাটাবার অনুমতি চাইলাম। দিল না পাহারাদার। না বুঝে খালি দেখে একটা কুকুরের ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম, ওটাও শেষ পর্যন্ত তাড়িয়ে দিল আমাকে। উপরি পাওনা হিসেবে কামড়েও দিয়েছে পায়ে। আর আর কোন জায়গা না পেয়ে ঘুরতে ঘুরতে আপনাদের সামনের ওই ছাপাখানার বেঞ্চে এসে শুয়ে পড়েছিলাম। দেখে এক সদয় বুড়ি বললেন, এখানে এসে আশ্রয় চাইতে।

তাই এসেছি আমি। এটা কোন জায়গা, মঁসিয়ে? কোন ইন? দেখুন, মঁসিয়ে, আমি খুবই ক্ষুধার্ত, তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে আমায়। ভীষণরকম ক্লান্ত আমি। যদি দয়া করে আমাকে কিছু খেতে দেন, রাত কাটাবার জায়গা দেন, তাহলে ভাববেন না, আমার টাকা আছে। একশো নয় ফ্রাঁ আছে আমার কাছে। আমি দাম দেব।'

ম্যাগলোয়েরের দিকে তাকালেন ফাদার মিরিয়েল। 'আরেকটা প্লেট দিন টেবিলে।'

থতমত খাওয়া চেহারা করে প্রথমে বিশপ, তারপর বুড়ি পরিচারিকাকে দেখল জাঁ ভালজাঁ। মনে হলো বিশপের বক্তব্যের অর্থ বোঝেনি সে। 'দাড়াঁন! আমার সব কথা বুঝতে পেরেছেন তো আপনি, মঁসিয়ে? উনিশ বছর জাহাজে সশ্রম দণ্ড খেটে এসেছি আমি। আমি একজন অপরাধী। সাতটি ক্ষুধার্ত, মৃতপ্রায় ছোট ছোট ভাগ্নে-ভাগ্নিকে খেতে দিতে না পেরে রুটি চুরি করতে গিয়েছিলাম, তারপর ধরা পড়ে...এই দেখুন!' পকেট থেকে হলুদ রঙের কয়েক ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করল জাঁ ভালজাঁ। বাড়িয়ে ধরল বিশপের দিকে। 'এই দেখুন, মঁসিয়ে, পড়ে দেখুন। পড়বেন? ঠিক আছে, আমিই পড়ছি। শুনুন, কি লেখা আছে এতে। আমি লেখাপড়া কিছু কিছু শিখেছি এই উনিশ বছরে। আমার জাহাজেই কয়েদীদের লেখাপড়া শেখার স্কুলমত ছিল একটা। এখন তাই লিখতে-পড়তে পারি। পড়ছি, শুনুন।'

'এতে লেখা আছে: "জাঁ ভালজাঁ, মুক্তিপ্রাপ্ত অপরাধী, স্থায়ী নিবাস—, উনিশ বছর দণ্ড খেটেছে জাহাজে। প্রথম পাঁচ বছর চুরি করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ার কারণে, পরের চোদ্দ বছর পর পর

চারবার জাহাজ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার অপরাধে। এই লোকটি খুবই বিপজ্জনক”।

মুখ তুলল ভালজাঁ। কাগজটা ভাজ করে পকেটে রাখল। ‘শুনলেন তো? তারপরও খেতে দেবেন আমাকে, আশ্রয় দেবেন এক রাতের জন্যে? এখানে থাকতে চাই না, যদি আপনার আস্তাবলের এক কোণে...’।

‘মাদামোয়াজেল ম্যাগলোয়ের,’ শান্ত কণ্ঠে বললেন বিশপ মিরিয়েল। ‘এঁর জন্যে গেস্টরূমের বিছানা তৈরি করুন। নতুন চাদর বিছিয়ে দিয়ে আসুন।’

নীরবে মনিবের নির্দেশ পালন করতে চলে গেল বৃদ্ধা।

মঁসিয়ে, ভালজাঁর উদ্দেশে বললেন ফাদার। ‘আপনি ফায়ারপ্লেসের সামনে খানিক বসে গরম হয়ে নিন। তারপর খেতে বসব আমরা একসাথে। ততক্ষণে বিছানা তৈরি হয়ে যাবে আপনার।’

অনেকক্ষণ ধরে ফাদারের দিকে তাকিয়ে থাকল জাঁ ভালজাঁ। প্রথমে বিশ্বাস হতে চাইল না, ভাবল লোকটা বোধহয় তামাশা করছে তার সাথে। কিন্তু ফাদারের সৌম্য চেহারার কোথাও সেরকম কোন আভাস নেই দেখে একটু একটু করে পূর্ণ আস্থা ফিরে এল। বুঝল ভালজাঁ, মানুষটি তামাশা করছে না ওর সাথে, যা বলেছে অন্তর থেকেই বলেছে। বুকের গুরুভার নেমে গেল ভালজাঁর।

‘সত্যি বলছেন!’ খুশির চোটে পাগলের মত প্রলাপ বকতে শুরু করল সে। আপনি আশ্রয় দেবেন আমাকে, খেতেও দেবেন? তাড়িয়ে দেবেন না? আমার মত এক ঘৃণ্য কয়েদীকে আপনি “মঁসিয়ে” বলে সম্বোধন করেছেন। আমাকে বিছানায় ঘুমাতে দেবেন? জানেন, উনিশটি বছর স্রেফ কাঠের তক্তার ওপর ঘুমিয়েছি আমি, ভুলে গেছি বিছানা কাকে বলে। সত্যি আপনি খুব ভাল মানুষ, মঁসিয়ে। মাফ করবেন, মঁসিয়ে, আপনার সরাইখানার নাম কি? আপনার নাম কি? আপনি যা চাইবেন, তাই দেব আমি।

শিশুর হাসি ফুটল ফাদারের মুখে। ‘এটা কোন সরাইখানা নয়, মঁসিয়ে। আমার বাসা। আমি একজন ধর্মযাজক।’

থমকে গেল জাঁ ভালজাঁ। ‘ধর্মযাজক! ও, আচ্ছা! কী বোকা আমি, এতক্ষণে আপনার টুপিটার দিকে ভাল করে এক নজর তাকাইনি পর্যন্ত। আপনি খুব ভাল মানুষ, মঁসিয়ে কিউরে। বাইরে যে বড় গির্জা দেখলাম, ওটার কিউরে তো আপনি? কী বোকা আমি, কী বোকা! তার মানে আপনাকে কোন পয়সা দিতে হবে না আমাকে?’

মাথা দোলালেন ফাদার। ‘না, দিতে হবে না। কত ফ্রাঁ আছে। আপনার বললেন, একশো নয়, তাই না?’

হ্যাঁ। এগুলো সরকারের তরফ থেকে ভাতা হিসেবে পেয়েছি। বছর প্রতি নয় ফ্র্যাঙ্ক হিসেবে।

দীর্ঘসময় জাঁ ভালজাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেন বিশপ বিয়েঁভেনু মিরিয়েল। অজান্তেই গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

মনিবের নির্দেশ পালন করে ফিরে এল পরিচারিকা। আগন্তুককে ফায়ারপ্লেসের সামনে ঝিম্ মেরে বসে থাকতে দেখে ফাদারের দিকে তাকাল। ‘হয়ে গেছে?’ বললেন তিনি। ‘এক কাজ করুন, আরও দুটো মোমবাতি জেলে দিন টেবিলে, আমাদের নতুন বন্ধুর সম্মানে।’

তাই করল বৃদ্ধা। জাঁ ভালজাঁ অবাক চোখে ফাদারকে দেখল খানিক, তারপর অনেকটা আপনমনে বলে উঠল, ‘সত্যি, মঁসিয়ে কিউরে, আপনার মত মানুষ হয় না। অন্যদের মত আমাকে তাড়িয়ে না দিয়ে নিজের ঘরে আশ্রয় দিলেন আপনি। আমার মত এক দীনহীন, নিঃশকে...’ থেমে গেল জাঁ ভালজাঁ। ফায়ারপ্লেসের জলন্ত কুণ্ডের দিকে তাকিয়ে ভাবল কি যেন। ‘আপনার মত এত ভাল মানুষ আমি আর দেখিনি ফাদার। জানা নেই, শোনা নেই, কাউকে এভাবে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেয়া...’।

‘এ আমার বাড়ি নয়, ভাই,’ মোলায়েম কণ্ঠে বললেন বিশপ মিরিয়েল। একটা হাত রাখলেন তিনি জাঁ ভালজাঁর কাধে। ‘এ বাড়ি প্রভু যিশুর। সবার জন্যে এ বাড়ির দরজা খোলা। আপনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন, আপনি ক্লান্ত, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, তাই এ বাড়িতে বিশ্রাম নেয়ার, পানাহারের পূর্ণ অধিকার আছে আপনার। এ বাড়ি যতটা না আমার, তারচে’ বেশি আপনার, মঁসিয়ে। এখানে যা

আছে, তার সবই আপনার। আপনি এক ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত মুসাফির, এর বেশি আর কিছু জানার প্রয়োজন নেই আমার। তাছাড়া আপনার সবকিছু তো জানাই ছিল আমার।'

'সত্যি!' তাজ্জব হয়ে ফাদারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল জাঁ ভালজাঁ। সব জানতেন আপনি আমার সম্পর্কে?

'জানতাম।'

আমার নাম জানতেন?

'হ্যাঁ, জানতাম আপনার নাম "আমার ভাই"।'

'দাঁড়ান, মঁসিয়ে। থামুন। আপনি সব ওলট-পালট করে দিচ্ছেন আমার। নিজের কাছেই এখন নিজেকে অপরিচিত লাগতে শুরু করেছে আমার। বুঝতে পারছি না গত উনিশ বছরের আমি আর এই আমি এক কি না।'

'খুব কষ্টে কেটেছে আপনার এতগুলো বছর, তাই না?' মোলায়েম কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন বিশপ মিরিয়েল।

আনমনা হয়ে পড়ল জাঁ ভালজাঁ। 'ওহ্, সে কী কষ্ট! লাল কয়েদীর পোশাক, শেকলে বাঁধা অবস্থায় দিন-রাত দাঁড় বাওয়া, কথায় কথায় চাবুকের মার, কবরের মত অন্ধকার জাহাজের তলকুঠুরিতে দিনের পর দিন বন্দী থাকা, তক্তার বিছানায় ঘুমানো, কী অমানুষিক কষ্ট!'

'বুঝতে পারছি, অনেক আঘাত সইতে হয়েছে আপনাকে। তবে এ ও ঠিক, মঁসিয়ে, অতীত অপরাধের জন্যে এর মধ্যে কখনও যদি অজান্তেও অনুশোচনা জেগে থাকে আপনার মনে, এক ফোঁটা চোখের পানি পড়ে থাকে সে কারণে, জানবেন আপনার জন্যে স্বর্গের দরজা খুলে গেছে। যদি এর মধ্যে একবারও নিজেকে শুধরে নেয়ার চিন্তা জেগে থাকে আপনার অন্তরে, জানবেন আপনি আমাদের সবার চাইতে মানুষ হিসেবে অনেক উত্তম।'

'টেবিল রেডি, ফাদার,' মৃদু কণ্ঠে জানান দিল ম্যাগলোয়ের।

'উঠুন, মঁসিয়ে,' বললেন তিনি। খেয়ে ঘুমুতে হবে, বিশ্রাম প্রয়োজন আপনার। আসুন।

বহু বছর পর ভাল কিছু খেল জাঁ ভালজাঁ। এত ভাল সম্ভবত জীবনে এই প্রথম। মাথা নিচু করে গোগ্রাসে গিলল সে। খাওয়া শেষে ফাদার নিজে তাকে গেস্ট রূমে পৌঁছে দিলেন। বিদায় নেয়ার আগে বললেন, সকালে রওনা হওয়ার আগে পেট পুরে গরম দুধ খেয়ে যাবেন, মঁসিয়ে। কয়েকটা গরু আছে আমার, ভাল দুধ দেয়। শুভরাত্রি।

'শুভরাত্রি, মঁসিয়ে। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

ক্যাথেড্রালের টাওয়ার ক্লকে রাত দুটোর ঘন্টা পড়ল। নীরব, নিস্তব্ধ রাতে আওয়াজটা হলো বিকট। চট করে ঘুমটা ভেঙে গেল জাঁ ভালজাঁর। চোখ মেলে তাকাল সে। আসলে এতক্ষণ ঘুমায়নি সে, পড়ে ছিল তন্দ্রাচ্ছন্নের মত। এত আরামের বিছানায় শুয়ে অভ্যস্ত নয় ভালজাঁ, তাই কিছুতেই ঘুম আসছিল না।

চোখ মেলে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকল জাঁ ভালজাঁ। মাথার মধ্যে আবোল-তাবোল চিন্তা ঘুরছে। তার মধ্যে একটা চিন্তা কিছুতেই মুক্তি দিচ্ছে না ভালজাঁকে। সেটা হচ্ছে এ বাড়ির মূল্যবান ছয়টা চমৎকার রূপোর প্লেট, যার একটায় খেতে দেয়া হয়েছিল তাকে। আর একটা বড় চামচ, যেটা দিয়ে সুপ পরিবেশন করা হয়েছিল ডাইনিং টেবিলে। ওটাও রূপোর তৈরি। দেখতে অবিশ্বাস্যরকম সুন্দর। ওগুলো কোথায় রেখেছে পরিচারিকা, জানা আছে জাঁ ভালজাঁর। দেখেছে সে।

চোখ বুজল ভালজাঁ, পড়ে থাকল মড়ার মত। কিন্তু ঘুম আর আসে না, কেবলই আজেবাজে চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়।

টং টং!

তিনটার ফন্টা পড়ল। ঘণ্টাধ্বনির কাঁপা কাঁপা বেশ ক্রমে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল। উঠে পড়ল জাঁ ভালজাঁ। ঝোলাটা কাধে তুলে নিল, তারপর ছড়ি হাতে নিঃশব্দে ফাদার মিরিয়েলের রূমের দিকে এগোল। ওই রূমেই, ফাদারের মাথার কাছে তাকের ওপর আছে রূপোর প্লেটগুলো আর চামচটা।

এক ঘণ্টা পর চোরাই প্লেট-চামচসহ পাহারাদার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেল জাঁ ভালজাঁ।

ভোরবেলা বাড়ির সামনের বাগানে পায়চারি করছিলেন বিয়েভেনু মিরিয়েল। হঠাৎ ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে দেখলেন তিনি ম্যাগলোয়েরকে। 'ফাদার! ফাদার' ছুটে এল বৃদ্ধা। ফাদার! সর্বনাশ হয়ে গেছে! রূপোর থালা-চামচ কিছু নেই। সব চুরি হয়ে গেছে। সেই হতচ্ছাড়া লোকটিও নেই। সে-ই নিয়ে গেছে আমাদের দামী দামী জিনিসগুলো।

বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না ফাদার। এক মুহূর্ত নীরব থেকে বললেন, 'ওগুলো সত্যিই কি আমাদের? না, মাগলোয়ের, আমাদের নয় ওসব। ছিলও না কোন কালে। ওসব গরীবের সম্পদ। লোকটা গরীব ছিল, অতএব ওগুলো তারই প্রাপ্য। নিজের জিনিস নিয়ে গেছে সে, ভালই হয়েছে।'

হাঁ করে কিছু সময় ফাদারকে দেখল বৃদ্ধা, তারপর নিচু কণ্ঠে বিড়বিড় করতে করতে ভেতরে চলে গেল। একটু পর নাস্তা খেতে এলেন বিশপ। চোখ তুলে তাকে এক পলক দেখলেন কেবল ব্যাপ্টিস্টিন। কিছু বললেন না। তিনি ভালই চেনেন তার ভাইটিকে। অবশ্য বুড়ি পরিচারিকার মুখ বন্ধ হয়নি তখনও। একনাগাড়ে কি সব বকে চলেছে সে নিচু কণ্ঠে।

নাস্তা শেষ করে উঠতে যাবেন ফাদার, এই সময় সামনের দরজায় জোর করাঘাতের আওয়াজ উঠল। 'ভেতরে আসুন!' বললেন তিনি।

দরজা খুলে ভেতরে এসে দাড়াল তিন পুলিশ। নতমুখে জাঁ ভালজাঁও রয়েছে তাদের সাথে। তার কলার শক্ত মুঠোয় ধরে রেখেছে পুলিশদের একজন। দ্রুত পায়ে সেদিকে এগোলেন ফাদার।
'মঁসিয়ে,' বলে উঠল এক পুলিশ। এই লোকটা...'

তার দিকে তাকালেন না বিশপ, সোজা এসে জাঁ ভালজাঁর মুখোমুখি দাঁড়ালেন। 'এই যে, আপনি এসেছেন?' বললেন তিনি। 'রূপোর মোমবাতিদান দুটো ফেলে গিয়েছিলেন কেন আপনি, মঁসিয়ে?'

নিজের অপরাধ সম্পর্কে ভালই অবহিত জাঁ ভালজাঁ, প্রথম থেকেই তাই মাথা নিচু করে ছিল, ফাদারের মুখের দিকে তাকাতে পারেনি লজ্জায়। এইবার মুখ তুলল সে, চরম বিস্ময় নিয়ে তাকাল অদ্ভুত মানুষটির দিকে। নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছিল না ভালজাঁ। ওদিকে দুই মহিলারও চোখ কপালে উঠেছে বিশপের কথা শুনে। থতমত খেয়ে গেল পুলিশের দল। যে ভালজাঁর কলার ধরে রেখেছিল, চট করে হাত নামিয়ে ফেলল সে।

'ওহ্,' বলে উঠল লোকটা। 'আপনিই তাহলে দিয়েছেন একে ওগুলো? ছয়টা রূপের প্লেট আর একটা বড় চামচ?'

'নিশ্চই! আরও দুটো মোমবাতিদানও দিয়েছিলাম ওঁকে, মনে হয় ভুলে ফেলে গিয়েছিলেন। তা আপনারাও বুঝেছি! ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে নিশ্চই!'

'হ্যাঁ, ফাদার, কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলল সে। মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে, অফিসার। আপনারা এবার যেতে পারেন।'

চলে গেল তিন পুলিশ বেকুবের মত চেহারা করে। পাথরের মূর্তি হয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল জাঁ ভালজাঁ, নড়াচড়া করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে যেন। ফায়ারপ্লেসের দিকে এগোলেন ফাদার। তার ওপর থেকে দটো চমৎকার কারুকাজ করা রূপোর মোমবাতিদান নিয়ে এসে এগিয়ে দিলে ভালজাঁর দিকে। 'নিন। এগুলো বিক্রি করলে কম করেও দুশো ফ্রাঁ পাবেন,' বলতে বলতে ও দুটো প্রায় জোর করে তার ঝোলায় পুরে দিলেন তিনি।

'আপনাকে বলেছিলাম, মঁসিয়ে, যাওয়ার আগে পেট ভরে গরম দুধ খেয়ে যাবেন। কেন খাননি? ম্যাগলোয়ের, সিয়ের জন্যে দুধ নিয়ে আসুন।'

'আমি...আমি তাহলে সত্যিই মুক্ত?' অনেক চেষ্টার পর ভাষা ফিরে পেয়ে বিড়বিড় করে বলল জাঁ ভালজাঁ।

'হ্যাঁ, ভাই, আপনি মুক্ত। আপনি যেখানেই থাকুন, মনে রাখবেন, সারাক্ষণ আমার আশীর্বাদ থাকবে আপনার ওপর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজকের পর আপনি সৎ মানুষ হয়ে যাবেন। ভাল হয়ে যাবেন। সেই আশাতেই আজ আপনাকে মুক্ত করেছি আমি ওদের হাত থেকে। আজ আপনার আত্মা

কিনে নিলাম আমি ঈশ্বরের পায়ে অর্পণ করার জন্যে। কথাটা ভুলবেন না যেন।'

তাঁর দিকে এক পলক তাকিয়েই দৃষ্টি নামিয়ে নিল জাঁ ভালজাঁ। চোখে পানি এসে গেছে তার।

'আর হ্যাঁ, এ বাড়ির দরজা সব সময় আপনার জন্যে খোলা থাকবে। যখন খুশি, ইচ্ছে হলেই চলে আসবেন। কিছু প্রয়োজন হলে বিনা দ্বিধায় নিয়ে যাবেন। আজকের মত করে নয়, সবার চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে যাবেন, কেউ নিষেধ করবে না। এ বাড়িতে যা আছে, মনে করবেন সবই আপনার।'

জোর পায়ে হেঁটে ডি ত্যাগ করল জাঁ ভালজাঁ। তার ত্রস্ত হাঁটা দেখলে মনে হবে বুঝি পালাচ্ছে সে, যত দ্রুত সম্ভব অজ্ঞাত কারও নাগালের বাইরে চলে যেতে চাইছে। কোন দিকে যাচ্ছে খেয়াল নেই, মাথা নিচু করে হন্ হন করে কেবলই হেঁটে চলেছে। ক্রমে দুপুর গড়িয়ে গেল, বিকেল হলো, তবু থামল না জাঁ ভালজাঁ। এমনকি কোনদিক যাচ্ছে সে, তাও দেখছে না-হাঁটছে তো হাঁটছেই।

এক সময় পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ল সূর্য, আর বড়জোর এক-দেড় ঘণ্টা, তারপর আলপসের ওপাশে ডুবে যাবে। এই সময় হুঁশ হলো জাঁ ভালজাঁর। চারদিকে তাকিয়ে নিজেকে বিশাল এক মাঠের মাঝে আবিষ্কার করল সে। কম করেও তিন লীগ পথ পেরিয়ে এসেছে সে এরমধ্যে। ফসলহীন, লালচে ন্যাড়া মাঠ। মাঝেমধ্যে এক-আধটা ঝোপ ঝাড় আছে। সূর্য হেলে পড়ায় এবড়ো-খেবড়ো মাটির বুকে ওগুলোর দীর্ঘ ছায়া পড়েছে। ভালজাঁর ছায়া ওগুলোর চাইতে বহুগুণ দীর্ঘ।

এদিক-ওদিক তাকাল সে। সামনে-পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে, কোনদিকেই কোন শহর বা গ্রামের চিহ্ন নেই। কোন গির্জার চূড়াও চোখে পড়ে না। হাঁটার গতি কমে এল জাঁ ভালজাঁর। থেমে পড়ল একসময়। এতক্ষণে যেন ক্লান্তি অনুভব করল সে। সকালে বিশপ মিরিয়েলের বাড়িতে এক গ্লাস দুধ ছাড়া কিছু খায়নি, তবু খিদে বোধ হচ্ছে না। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোমর সমান একটা ঝোপ দেখে এগোল ভালজাঁ, বসে পড়ল ঝোপের আড়ালে, একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার এগোবে।

নানান চিন্তা এসে ভর করল মনের মধ্যে। নিজের অতীত, বর্তমান আর বিশপ মিরিয়েলকে নিয়ে ভাবতে লাগল। অনেকক্ষণ পর হঠাৎ কাছেই কোথাও হাসির শব্দ উঠতে সচকিত হলো জাঁ ভালজাঁ, ঘুরে তাকাল। সে যে মেঠোপথ ধরে এসেছে, সেই পথ দিয়েই, উল্টোদিক থেকে হেঁটে আসছে দশ-বারো বছরের একটি কিশোর। হাতে সম্ভবত কয়েকটা ধাতব মুদ্রা রয়েছে তার। হাঁটার মধ্যেই থেকে থেকে সেগুলো শূন্যে ছুঁড়ে মারছে কিশোর, ক্যাচ ধরছে, হেসে উঠছে আপন খেয়ালে। মনের আনন্দে।

ঝোপটার ওপাশে পৌঁছে থেমে পড়ল ছেলেটি, এপাশে যে কেউ বসে আছে, খেয়াল করেনি। আবারও চার-পাঁচটা মুদ্রা আকাশে ছুঁড়ে মারল সে, মরা রোদ গায়ে পড়তে চিকচিক করে উঠল ওগুলো, পাক খেতে খেতে নেমে এল নিচে। টপাটপ সবগুলো ক্যাচ ধরে ফেলল সে, হেসে উঠল হি হি করে। দুলে উঠল তার মাথা ভর্তি রুক্ষ, সোনালী চুল। আবার ছুঁড়ে মারল সে পয়সাগুলো। এবার লক্ষ্য ঠিক ছিল না কিশোরের, হয়তো শেষ সময় হাত কেঁপে গিয়েছিল বা আর কিছু, একটা চল্লিশ সাউ মুদ্রা ঝোপের ওপর দিয়ে উড়ে এসে পড়ল জাঁ ভালজাঁর পায়ের কাছে। প্রায় সাথে সাথে ওটার ওপর ভারী বুটজুতো পরা একটা পা তুলে দিল অন্যমনস্ক ভালজাঁ।

সে না দেখলেও যার জিনিস সে ঠিকই দেখল কোথায় গেছে ওটা। অন্য পয়সাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে দ্রুত এ পাশে চলে এল কিশোর। ধ্যানময়ের মত বসে থাকা আজব মানুষটিকে দেখে থমকে দাঁড়াল। কিনুত, ঘাবড়াল না সে। যদিও অস্তমিত আলোয় ভালজাঁর চেহারা ভয়ঙ্কর লাগছে, এবং এরকম সময়ে এমন জনহীন তেপান্তরের মাঠে ওরকম কাউকে আচমকা চোখে পড়লে ভয় পাওয়ারই কথা তার মত বাচ্চা ছেলের। তবু এগিয়ে এল সে নির্ভীক পায়ে।

মঁসিয়ে, আমার পয়সাটা!

কি নাম তোমার? জানতে চাইল ভালজাঁ, অন্যমনস্ক।

জার্ভাই, মঁসিয়ে। পেটিট জার্ভাই।

চলে যাও এখান থেকে।

আমার পয়সাটা তো দেবেন।

ততক্ষণে আবার নিজের ভাবনায় ডুবে গৈছে ভালজাঁ। মুখ নিচু করে মাটির দিকে চেয়ে আছে। **শশানেনি** কথাটা।

'আমার পয়সা, মঁসিয়ে!' গলা চড়িয়ে বলল জার্ভাই।

এবারও সাড়া দিল না জাঁ ভালজাঁ। কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে ঝাকি দিল ছেলেটা। কেঁদে ফেলেছে। কাজ না হওয়ায় উবু হয়ে তার পা-টা ধরল সে, টানাটানি করতে লাগল সরাবার জন্যে। 'আমি আমার পয়সা চাই। আমার চল্লিশ সাউ! দিয়ে দিন, মঁসিয়ে দিয়ে দিন দয়া করে!'

বিরক্ত হয়ে উঠল জাঁ ভালজাঁ। রেগে গেল। চোখ গরম করে তাকাল ছেলেটির দিকে। মনে হলো যেন অন্য কোন জগৎ থেকে ফিরেছে সে এইমাত্র। 'অ্যাই, কে তুমি? কি হয়েছে?'

কাঁদতে কাঁদতে বলল কিশোর, 'আমি, মঁসিয়ে। আমি, পেটিট জার্ভাই। আপনার পা-টা সরান, মঁসিয়ে। পয়সাটা দিয়ে দিন আমাকে,' বলতে বলতে রেগে উঠল সে। চেঁচিয়ে উঠল, 'কেন পা সরাচ্ছেন না আপনি? কেন দিচ্ছেন না আমার পয়সা?'

নিজের চিন্তায় এতই আছন্ন ভালজাঁ যে ছেলেটির কান্নার কারণ বুঝতেই পারল না, উল্টে ভয়ঙ্কর রেগে গেল। ছড়িটা তুলেই ভীষণ মুখভঙ্গি করে তেড়ে উঠল, 'ভাগ, ছোঁড়া!' চেঁচিয়ে বলল সে। 'পালা এখান থেকে।'

তার অগ্নিমূর্তি দেখে কান্না থেমে গেল কিশোরের, ভয়ে আঁতকে উঠল সে। কাঁপতে শুরু করল থর থর করে। কয়েক মুহূর্ত বিস্ফারিত চোখে ভালজাঁকে দেখল ছেলেটি, তারপর ঘুরেই তীরবেগে ছুটে পালাতে লাগল। এতই ভয় পেয়েছে যে পিছনে একবার তাকাল না পর্যন্ত। কিছুদূর গিয়ে ভয়ঙ্কর লোকটার নাগালের বাইরে আসা গেছে। ভেবে দম নেয়ার জন্যে কয়েক মুহূর্তের জন্যে থেমে দাড়াল সে। হাঁপরের মত সশব্দে ঘন ঘন দম নিল। তারপর আবার পা বাড়াল। এরমধ্যে ভুলেও পিছনে তাকায়নি সে।

জাঁ ভালজাঁ যখন সচকিত হলো, সূর্য তখন ডুবে গেছে। পেটিট জার্ভাইও অদৃশ্য হয়ে গেছে। রাতের জন্যে একটা আশ্রয় খোঁজার কথা খেয়াল হতে উঠে পড়ল ভালজাঁ। পরক্ষণে মাটিতে পড়ে থাকা ছড়িটা তুলতে গিয়ে স্থির হয়ে গেল। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল সামনেই পড়ে থাকা চকচকে একটা কিছুর দিকে। এক মুহূর্ত মাত্র, আচমকা যেন বিদ্যুৎপৃষ্ট হলো ভালজাঁ, ঝটকা মেরে তুলে নিল জিনিসটা। একটা ধাতব মুদ্রা! চল্লিশ সাউ!

একছুটে ঝোপের এপাশে চলে এল জাঁ ভালজাঁ, ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল জার্ভাইর খোঁজে। নেই সে কোথাও। কাঁপতে শুরু করল সে ভীত হরিণ শাবকের মত। কোনদিকে গেল ছেলেটা? উত্তেজনার মাথায় দ্রুত কয়েক কদম এগিয়ে গেল ভালজাঁ তার ফেলে আসা পথের দিকে। থমকে দাঁড়াল। বিভ্রান্ত। কি করবে, কোনদিকে যাবে বুঝে উঠতে পারছে না।

গলার সমস্ত শক্তি এক করে চেঁচিয়ে উঠল ভালজাঁ ছেলেটির নাম ধরে। তেপান্তরের মাঠ জুড়ে ভৌতিক প্রতিধ্বনি তুলে নেচে বেড়াতে লাগল তার চিৎকার। কোন জবাব এল না। আবার চেঁচিয়ে ডাকল সে, শূন্যে হারিয়ে গেল তার হাহাকার। কিছুক্ষণ পর দূর থেকে একজন যাজককে ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখে ছুটে গেল ভালজাঁ।

মঁসিয়ে কিউরে, কোন ছেলেকে দেখেছেন আপনি পথে?

'না।'

'পেটিট জার্ভাই নাম ছেলেটার। অল্পবয়সী, দশ-বারো বছরের।'

না, কাউকেই দেখিনি আমি, অবাক চোখে ভালজাঁকে দেখতে লাগলেন যাজক।

হতাশ হলো ভালজাঁ। চেহারা দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে এক্ষুণি। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল সে ব্যস্ত হাতে। দুটো পাঁচ ফ্রাঁর নোট বের করে গুঁজে দিল যাজকের হাতে। 'মঁসিয়ে কিউরে, এগুলো ছেলেটাকে দিয়ে দেবেন দয়া করে। তার পিঠে ছিল একটা কাঠবিড়ালির বাক্স, মঁসিয়ে কিউরে। কাধে হার্ডি-গার্ডি (বেহালার মত এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র) ছিল। দশ-বারো বছর বয়স হবে তার, সোনালী রঙের চুল মাথায়। বোধহয় চিমনি ঝাড়ুদার হবে, সেরকমই লাগছিল।'

মাথা দোলালেন যাজক। এরকম কাউকে দেখিনি আমি।

‘হায় হায়!’ আরও দুটো পাঁচ ফ্রাঁর নোট ধরিয়ে দিল ভালজাঁ তার হাতে। বকতে লাগল, ‘মহাসর্বনাশ ঘটিয়ে ফেলেছি আমি, মঁসিয়ে কিউরে! মহাডাকাতি করে বসেছি না জেনে! আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিন, মঁসিয়ে, পুলিশে ধরিয়ে দিন। কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত আমার।’

‘ডাকাতি’ কথাটা কানে যাওয়ামাত্র ঘাবড়ে গেলেন যাজক, পলকে চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠল তাঁর। স্পার দিয়ে জোর গুঁতো মেরে বসলেন ঘোড়ার পেটে, ব্যথা পেয়ে তীরবেগে ছুটল ঘোড়া। ধুলো উড়িয়ে মুহূর্তে দিগন্তে হারিয়ে গেলেন যাজক। কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে সেদিকে তাকিয়ে থাকল জাঁ ভালজাঁ, তারপর ছেলেটা যেদিকে যাচ্ছিল, সেদিকে ছুটল উদভ্রান্তের মত। সেই সাথে চেচাচ্ছে তার নাম ধরে। এক সময় চাঁদ উঠল, তার আলোয় হন্যে হয়ে ছেলেটিকে খুঁজে বেড়াতে লাগল জাঁ ভালজাঁ। ডাকতে ডাকতে গলা দিয়ে রক্ত তুলে ফেলার জোগাড় করল, তবু সাড়া মিলল না জার্ভাইর।

ক্লান্ত হয়ে পথের ওপর বসে পড়ল জাঁ ভালজাঁ। কেঁদে ফেলল হাউমাউ করে। উনিশ বছর আগে, রুটি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে শেষ কেঁদেছিল সে মনের দুঃখে। তারপর আজ এই কাঁদল। একই কারণে। কতক্ষণ কেঁদেছে ভালজাঁ কেউ জানে না। সেখান থেকে উঠে কোনদিক গেল সে, তাও কেউ জানে না। রাত, ভোর হওয়ার আগে সেফ উধাও হয়ে গেল জাঁ ভালজাঁ।

কেবল এক স্টেজ-কোচ ড্রাইভার, ভোর তিনটের দিকে আজব চেহারা সুরতের এক লোককে দেখেছিল, বিশপ বিয়েভেনু মিরিয়েলের বাড়ির দরজায় হাঁটু মুড়ে বসে প্রার্থনা করছিল সে। তার পাশে পড়ে ছিল বড় একটা কাপড়ের ব্যাগ, আর একটা গাঁটওয়ালা ছড়ি।

এরপর আর কেউ দেখেনি তাকে।

চার

সে সময়ে প্যারিসের কাছে মন্তফারমেলে এক মোটামুটি নাম করা চপ-হাউস ছিল, তার মালিক ছিল কোন এক থেনারদিয়ের দম্পতি। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে চালায় হোটেলটা।

একদিন, হোটেলের সামনের এক চিলতে আঙিনায় খেলা করছিল দু'টি ছোট্ট শিশু। দুটিই মেয়ে-একটির আড়াই বছর বয়স, অন্যটির দেড়। থেনারদিয়ের দম্পতির মেয়ে ওরা। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে মা, মিসেস থেনারদিয়ের। বাচ্চাদের ওপর নজর রাখছে। মহিলা মজবুত গড়নের, বিশালদেহী। খাণ্ডারনী মার্কা চেহারা। পুরুষালী চাল চলন, গলার স্বরও তেমনি। চুলের রং লাল। বয়স ত্রিশের মত হবে।

দূরে দাঁড়িয়ে তার বাচ্চাদের খেলা দেখছে এক যুবতী। মোটামুটি সুন্দরী সে। তবে অভাবী, চেহারায় বিষাদ। পরনের কাপড়চোপড়ে ঝি-চাকরানীর মত দেখাচ্ছে তাকে। তার কোলেও একটি মেয়ে শিশু, ঘুমাচ্ছে। কাধে বড় এক কার্পেট ব্যাগ ঝুলছে যুবতীর, দেখে মনে হয় বেশ ভারী ওটা। কোলের শিশুটির চেহারা এতই সুন্দর, এতই মিষ্টি, যা কেবল স্বপ্নে অথবা কল্পনায় দেখা যেতে পারে। গায়ের রং দুধে-আলতায় মেশানো তার, ফোলা গাল দুটি গোলাপী। নাদুস-নুদুস স্বাস্থ্য। চমৎকার ডিজাইনের লিনেন হেড ড্রেস আর ঝালরওয়ালা টুপি হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে শিশুটির সৌন্দর্য। বোজা থাকলেও বোঝা যায়, চোখ তার হরিণ চোখ। পাপড়ি দীর্ঘ, ঘন, কুচকুচে কালো।

একটু একটু করে থেনারদিয়ের পত্নীর কাছে এসে দাঁড়াল যুবতী। মুখ তুলে তাকাল সে। খানিক পর বাচ্চাদের প্রশংসা ইত্যাদি নিয়ে আলাপ শুরু হলো দু'জনের, একে অন্যের সাথে পরিচিত হলো তারা। নিজের পরিচয় জানাল প্রথমজন, তারপর যুবতীর নাম-পরিচয় জানতে চাইল। বলল সে, যদিও সব সত্যি নয়।

'আমার নাম ফাঁতিন,' বলল যুবতী। 'প্যারিসে থাকতাম। অল্পদিন আগে স্বামী মারা গেছে। সামান্য যা সঞ্চয় রেখে গেছে স্বামী, তা প্রায় শেষ। নতুন কোন কাজও পেলাম না, অনেক খুঁজেছি। তাছাড়া এই দুধের বাচ্চাকে একা রেখে কাজ করতে যাওয়াও সম্ভব নয়।'

'বুঝলাম, তা যাচ্ছিলেন কোথায়?' প্রশ্ন করল মিসেস থেনারদিয়ের।

চেহারা আরও বিষন্ন হয়ে উঠল ফাঁতিনের। 'জানি না। এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি। প্যারিসে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছে, তাই চলে এসেছি, ব্যাস।'

এর মধ্যে ঘুম ভেঙে গেছে তার কোলের শিশুটির। চোখ বড় করে অন্য দুটির খেলা দেখছে সে। থেকে থেকে হেসে উঠছে খিল খিল করে, জোরাজুরি শুরু করে দিয়েছে মায়ের কোল থেকে নেমে যাওয়ার জন্যে।

'ছেড়ে দিন না ওকে, বলল মিসেস থেনারদিয়ের। খেলা করুক আমার বাচ্চাদের সাথে।'

মেয়েকে নামিয়ে দিল ফাঁতিন। মহা হুটোপুটি, দৌড়-ঝাপ শুরু করে দিল শিশু তিনটি। তাদের প্রাণখোলা আনন্দ চিৎকার আর হাসিতে ভরে উঠল আঙিনা।

দেখেছেন, ওরা কত তাড়াতাড়ি একে অন্যের আপন হয়ে যায়?

মাথা দোলাল ফাঁতিন। হ্যাঁ। কিন্তু বড়রা পারে না, পরেরটুকু বিড়বিড় করে বলল।

'কি নাম আপনার পুতুলটির?'

'কোজেত।'

বয়স কত?

'প্রায় তিন বছর।'

'আমার বড়টারও তাই।' শিশুদের দিকে তাকাল মিসেস থেনারদিয়ের, হেসে উঠল ওদের অন্তরঙ্গতা দেখে। 'দেখুন, দেখুন! কেউ বলবে ওরা আপন তিন বোন নয়?'

যেন এমন একটা কিছুর অপেক্ষাতেই ছিল ফাঁতিন। চট করে মহিলার একটা হাত ধরে বসল। 'আমার মেয়েটাকে রাখবেন আপনি?' অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল মালিকপত্নী, কোন মন্তব্য করল না। বলে চলল ফাঁতিন, 'আপনার সাথে হঠাৎ এই পরিচয় সম্ভবত ঈশ্বরই ঘটিয়ে দিয়েছেন। মেয়ে সাথে থাকলে কাজ করা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। আর কাজ যদি না করতে পারি, খাব কি?

বাঁচব কেমন করে? রেখে দিন ওকে, বোন! নিজের মেয়ে মনে করে! আপনার কাছে ওকে রেখে যেতে পারলে খুব নিশ্চিন্ত হতে পারতাম আমি।' বলা শেষ হতে গভীর প্রত্যাশা নিয়ে মহিলার দিকে অকিয়ে থাকল ফাঁতিন।

'একটু ভেবে দেখতে হবে,' কিছু সময় চিন্তা করে বলল থেনারদি

'ওর খোরপোষের জন্যে মাসে ছয় ফ্রাঁ করে দেব আমি।'

ভেতর থেকে এক পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল জবাবে, 'সাত ফ্রাঁর কমে হবে না। আর ছয় মাসেরটা অগ্রীম দিতে হবে।'

'তার মানে বেয়াল্লিশ ফ্রাঁ,' বলল মিসেস থেনারদিয়ের।

মাথা দুলিয়ে সায় দিল ফাঁতিন, 'দেব।'

'সেই সাথে প্রাথমিক খরচ হিসেবে আরও পনেরো ফ্রাঁ,' পুরুষ কণ্ঠটি বলে উঠল আবার।

'মোট সাতান্ন ফ্রাঁ,' সন্তুষ্টির সাথে অঙ্কটা জানান দিল মালিকপত্নী।

'তাই দেব। আশি ফ্রাঁ আছে আমার সাথে। আপনাদের দিয়ে যা থাকবে, তাতে কয়েকদিন চলে যাবে আমার। কোথাও একটা কাজ জোগাড় করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসে মেয়েকে নিয়ে যাব। ততদিনে কিছুটা বড় হবে মেয়ে, সুবিধে হবে আমার।'

'ওর কাপড়-চোপড় সব আছে তো?' জানতে চাইল অদৃশ্য পুরুষটি।

সব আছে, কার্পেট ব্যাগটা দেখাল ফাঁতিন মহিলাকে। সবকিছু এক ডজন করে আছে এর মধ্যে। দামী, সিলকের সব।

উনি আমার স্বামী, ভেতরের দিকে ইঙ্গিত করল মিসেস থেনারদিয়ের।

বুঝতে পেরেছি। ব্যাগটা রেখে যাচ্ছি আমি আপনাদের কাছে।

মেয়েকে রেখে চোখের পানিতে বুক ভাসাতে ভাসাতে বিদায় নিল ফাঁতিন। সেই যে গেল, জীবনের তরে গেল। আর কোনদিন এক পলক চোখের দেখাও দেখতে পেল না সে তার নাড়ীছেড়া ধনকোজেতকে।

ফাঁতিন চোখের আড়ালে চলে যেতে মুখে চালবাজ হাসি ফুটিয়ে নিজের প্রায় দ্বিগুণ সাইজের স্ত্রীর দিকে তাকাল থেনারদিয়ের। হাতে তার মুঠ করে ধরা আছে সাতান্ন ফ্রাঁ। 'বাচঁলাম!' বলল সে, একশো দশ ফ্লাঁর যে দেনাটা ছিল, কাল তা শোধ করার শেষ দিন। অথচ আমার কাছে ছিল মাত্র ষাট ফ্রাঁ। ফাদ পেতে ভালই ইদুর ধরেছিলে তুমি, নইলে কাল ঠিক সমন ধরিয়ে দিয়ে যেত শেরিফ।

'তাই নাকি?' বলল গিন্নি। জানতাম না তো!

এই থেনারদিয়ের মানুষটি ছিল অত্যন্ত জঘন্য স্বভাবের। মহাবদমাশ। নানান বেআইনী কার্যকলাপের সাহায্যে অর্জিত টাকায় সমাজের খুব নিচু স্তর থেকে উঠে এসেছে সে। এমন স্বার্থপর, হৃদয়হীন আর কুটবুদ্ধির মানুষ ছিল থেনারদিয়ের, ভাবাই যায় না। স্ত্রীটিও তেমনি।

ওদিকে ফাঁতিন ছিল জন্ম অভাগী। মন্ট্রিল-সুর-মেয়ারে জন্ম ফাঁতিনের। বাবা-মাকে দেখেনি সে, অন্য এক পরিবারের আশ্রয়ে বড় হয়েছে। ওর নামটিও তাদের দেয়া। পনেরো বছর বয়সে প্যারিসে আসে ফাঁতিন জীবিকার খোঁজে। খুবই সুন্দরী ছিল সে। এক মাথা সোনালী চুল, মুক্তোর মত দাঁত ছিল। পরীর মত দেখাত। ফাঁতিন যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেত, ছেলে-ছোকরাদের তো কথাই নেই, বুড়োরা পর্যন্ত হাঁ করে চেয়ে থাকত তার দিকে।

ক্রমে ফেলিক্স টলেমি নামে এক ছেলের সাথে প্রেম হলো ফাঁতিনের। কয়েক বছর যেন হাওয়ায় ভর করে শূন্যে ভেসে ভেসে বেড়াল সে প্রেমিকের সাথে। এরপর, কোজেতের জন্মের আগেই পালিয়ে গেল তার প্রেমিক। পেটের দায়ে ক্রমে সমাজের পঙ্কিল আবর্তে তলিয়ে গেল ফাঁতিন। বহু কষ্টে মেয়েকে বছর তিনেকের করে তুলল সে। তারপর হঠাৎ করে কী এক অসুখে ধরে বসল ফাঁতিনকে। ঘন ঘন কাশি হয়, সেই সাথে যখন-তখন আসে জ্বর। দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করে সে। প্রেমিকের প্রতারণার কারণে প্যারিসের ওপর থেকে মন উঠে গিয়েছিল তার আগেই, এইবার নিজ দেশে ফিরে যাবে ঠিক করল ফাঁতিন।

শত হলেও মন্ট্রিল-সুর-মেয়ার তার জন্মস্থান, পরিচিত কাউকে না, কাউকে নিশ্চয়ই পাবে সে

ওখানে, যে তার এই বিপদে সাহায্য করবে। কিন্তু মেয়ের কথা ভেবে কটা দিন দোটানায় ভুগল ফাঁতিন। ওকে নিয়ে যাবে কি না, কাজটা ঠিক হবে কি না ভেবে বারবার পিছিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে কোজেতকে কোন অনাথ আশ্রম বা ভদ্র কোন পরিবারে লালন-পালনের জন্যে রেখে যাওয়ার বুদ্ধি এল মাথায়। মনস্থির করে ফেলল ফাঁতিন। খুব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়া সংসারের যৎসামান্য যা সম্পদ ছিল, বিক্রি করে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল মেয়েকে কোলে নিয়ে। থেনারদিয়ের দম্পতির হাতে ওকে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে ফিরে গেল সে তার জন্মস্থানে। ভাগ্য ভাল ফাঁতিনের, মন্ট্রিল-সুর-মেয়ারে পৌঁছার কয়েকদিনের মধ্যে যেমন-তেমন একটা চাকরিও জুটিয়ে নিল। বেতন যদিও অল্প, তবু, একেবারে অচল হয়ে পড়ার আগেই এমন একটা সুযোগকে সে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হিসেবে নিল।

ফাঁতিনের দিয়ে যাওয়া টাকায় সে যাত্রা সম্মান রক্ষা হলো থেনারদিয়েরের। সে জন্যে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল তার, কোজেতের প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ঘটল উল্টোটা। লোভে পড়ে গেল স্বামী-স্ত্রী। হোটেল থেকে তেমন আয় হত না, তাই পরের মাসে ফের অনটন দেখা দিল তাদের।

একদিন কোজেতের কার্পেট ব্যাগসহ তার সমস্ত কাপড়-চোপড় প্যারিসের এক বন্ধকী প্রতিষ্ঠানের কাছে ষাট ফ্রাঁর বিনিময়ে বন্ধক রেখে এল থেনারদিয়ের পত্নী। এরপর আর কিছু বিক্রি করার মত ছিল না কোজেতের, তাই নানারকম অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করে দিল তারা অবোধ শিশুটির ওপর। তার একমাত্র সম্বল, পরনের কাপড় ছিড়েফেটে খসে পড়েছিল আগেই।

নতুন কাপড়ের প্রশ্নই আসে না, কাজেই পরিবারের বড় মেয়ে, এপোনাইনের ফেলে দেয়া শতচ্ছিন্ন পোশাক পরে দিন কাটতে লাগল কোজেতের। সবার ফেলে দেয়া উচ্ছিষ্ট খেতে দেয়া হয় তাকে, তাও অপর্যাপ্ত। তিন বেলা ডাইনিং টেবিলের তলায় বসে একটা কাঠের প্লেটে করে তাই খায় কোজেত, সঙ্গে থাকে পরিবারের পোষা বেড়াল আর কুকুর।

ওদিক থেকে ফাঁতিন প্রতি মাসে দুটো করে চিঠি লেখে থেনারদিয়ের দম্পতিকে। নিজে লেখাপড়া জানে না ফাঁতিন, অন্য একজনকে দিয়ে লেখায়। প্রতি চিঠিতে মেয়ের জন্যে আকুল উৎকণ্ঠা থাকে তার। উত্তরে প্রতিবার গৎ বাধা জবাব দেয় তারা : আপনার মেয়ে চমৎকার আছে।

ছয় মাস পেরিয়ে গেল দেখতে দেখতে। সপ্তম মাস থেকে মেয়ের খরচের জন্যে নিয়মিত সাত ফ্রাঁ করে পাঠাতে থাকল কোজেত প্রতি মাসে। বছর ঘোরার আগেই কোজেতকে লিখল থেনারদিয়ের, 'সাত ফ্রাঁ প্রয়োজনের তুলনায় কম হয়ে যায়। এখন থেকে বারো ফ্রাঁ করে পাঠাতে হবে।'

বিনা ওজরে তাই মেনে নিল কোজেতে। পরের মাস থেকে বারো ফ্রাঁ করে পাঠাতে থাকল। ওদিকে থেনারদিয়ের দম্পতি লোক শোনানো আক্ষেপ করে বেড়াতে লাগল, মেয়েটির মা ওকে ভুলে গেছে। এখন আর কোজেতের লালন-পালনের খরচ পাঠায় না সে। প্রতিবেশীরা ভাবে, আহা! থৈনারদিয়ের কত ভাল মানুষ। এই অভাবের দিনে গরীব হয়েও এক অনাথ মেয়েকে পেলে পুষে বড় করছে বিনে পয়সায়। এ কি যা-তা কথা?

ভাল করে জ্ঞান হওয়ার আগেই কোজেত বুঝে গেছে, এ বাড়ির কর্তা-গিন্নির অবহেলা-অত্যাচার, আর কারণে-অকারণে মারধরই তার নিয়তি। পাঁচ বছর পুরো হতে না হতে পুরোদস্তুর বাড়ির কাজের মেয়েতে পরিণত হলো কোজেত। এর মধ্যে কিভাবে যেন জেনে গেল থেনারদিয়ের যে কোজেত ফাঁতিনের অবৈধ প্রেমের ফসল। অমনি নতুন দাবি ঝেড়ে বসল সে, প্রতি মাসে পনেরো ফ্রাঁ করে দিতে হবে মেয়ের খরচ বাবদ। নইলে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হবে।

কষ্ট হলেও মেনে নিল ফাঁতিন এক কথায়। পরের মাস থেকে নিয়মিত পনেরো ফ্লা করে পেতে থাকল থেনারদিয়ের।

শীত এল। ছয় বছরও পরা হয়নি তখন কোজেতের। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে শতচ্ছিন্ন, ছেড়া-ফাসা পুরনো কাপড় পরে দিন কাটে তার। সারাক্ষণ হি হি করে কাঁপে মেয়েটি। দাঁত দাঁতে বাড়ি খায় প্রতি মুহূর্তে। ভোরের আলো ফোটার অনেক আগে খড়ের বিছানা আর চটের কম্বল ত্যাগ করতে হয় কোজেতকে। নিজের থেকে দেড়গুণ বড় এক ঝাড়ু নিয়ে হোটেলের সামনের রাস্তা ঝাট দেয়ার মধ্যে

দিয়ে শুরু হয় তার দিন। ঝট দেয় আর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে। দুই হরিণ চোখে পানি টলমল করে কোজেতের।

সুন্দর, মিষ্টি চেহারার জন্যে এলাকার সবাই তাকে ‘লার্ক’ বলে ডাকে আদর করে। যদিও পুরো সার্থক হয়নি এ নামকরণ, একটা ঘাটতি আছে। দেখতে কোজেত লার্ক পাখির মতই বটে। ছোট্ট, সারাক্ষণ ভীত-সন্ত্রস্ত, কম্পিত।

ঘাটতি হলো, গান কাকে বলে এই লার্ক তা জানে না।

ইমিটেশনের অলঙ্কার তৈরি করা ছিল মন্ট্রিল-সুর-মেয়ারবাসীদের বহু প্রাচীন ব্যবসা। জেট নামে এক খনিজ ধাতব আর জার্মানির ‘কালো কাঁচ’ দিয়ে তৈরি হত এসব গহনা। গত কয়েক বছর ধরে বেশ মন্দা যাচ্ছিল তাদের ব্যবসা। কারণ এ কাজে যে রেজিন প্রয়োজন হয়, তার দাম বেশ বেড়ে গিয়েছিল, আমদানী করে পোষাত না। সে ফাঁতিন এখানে আসার বছর তিনেক আগের কথা।

১৮১৫ সালের শেষদিকে অজ্ঞাতপরিচয় এক লোক এসে হাজির হলো শহরে। এসেই নতুন এক অলঙ্কার তৈরির কারখানা খুলে বসল সে। লাক্ষা নামের এক আঠা খুব সস্তায় পাওয়া যায় স্থানীয় বাজারে, রেজিনের বদলে তাই দিয়ে কাজ শুরু করল লোকটি। আগে ধাতব ব্রেসলেট তৈরির ক্ষেত্রে দুই প্রান্ত ঝালাই করে দেয়া হত, সে পাটও তুলে দিল সে। তার বদলে দুই প্রান্ত ভাজ করে জুড়ে দিতে শুরু করল। এই সামান্য পরিবর্তন বিপ্লব ঘটিয়ে দিল শহরের ঝিমিয়ে পড়া অলঙ্কার ব্যবসায়।
হু হু করে বেড়ে গেল অজ্ঞাত লোকটির ব্যবসা। কাঁচামালের দাম, বিশেষ করে রেজিনের বিকল্পের দাম নেমে এল নামমাত্র স্তরে। আগের চেয়ে কম দামে বিক্রি করেও তিনগুণ বেশি লাভ পেতে লাগল সে। ফলে শ্রমিকদের বেতন বাড়িয়ে দিল লোকটি। ওদিকে অলঙ্কারের গুণগত মান আর উৎকর্ষতাও দিন দিন বাড়তে থাকল। মাত্র তিন বছরে বিরাট ধনী বনে গেল মানুষটি।

যদিও, তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না কেউ। কোথায় তার বাড়ি, কি বৃত্তান্ত, কিচ্ছু জানে না শহরবাসী।

শোনা যায় সে যখন শহরে আসে, সামান্য কয়েকশো ফ্রাঁ পুঁজি ছিল তার। পরিধেয়, আচার-আচরণ আর চেহারা দেখে তখন তাকে দিনমজুরের চেয়ে বেশি কিছু মনে হয়নি কারও। ডিসেম্বরের এক বিকেলে এ শহরে যখন পা রাখে লোকটি, তখন তার কাঁধে ছিল একটা ঝোলা, হাতে ছড়ি। ওইদিনই শহরের টাউন হাউসে আগুন ধরে গেল কি ভাবে যেন। সে বড় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ছিল। ভেতরে এক পুলিশ অফিসারের দুই ছেলে আটকা পড়ে গেছে। চিৎকার করে কাঁদছে তারা প্রাণের ভয়ে, কিনুত কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার সাহস পাচ্ছে না। সামনের রাস্তায় জটলা পাকিয়ে হায় হায় করছে কেবল মানুষ। পুলিশ অফিসারটিও ছিল তাদের মধ্যে।

হঠাৎ ভিড় ঠেলে ছুটে গেল সেই লোক। গোঁয়ারের মত আগুনের ওপর দিয়ে লাফিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে ছেলে দুটোকে উদ্ধার করে নিয়ে এল। হুড়োহুড়ির মধ্যে তার নাম-পরিচয় জেনে রাখার কথা মনে ছিল না তখন কারও। তবে মন্ট্রিল-সুর-মেয়ারের সবার কাছে সেদিন থেকে সে ফাদার ম্যাডেলিন বনে গেল আপনা আপনি। কে তাকে এ নাম দিল, তাও কেউ জানে না।

তিন বছর পর ফাদার ম্যাডেলিনের কারখানাতেই চাকরি পেল ফাঁতিন।
পঞ্চাশের মত বয়স ফাদার ম্যাডেলিনের। মজবুত দেহের গড়ন। অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ। নিজের ব্যাপারে মুখ খোলেন না একেবারেই। পথ চলেন ধীর পায়ে, মুখ নিচু করে। মনে হয় সব সময় যেন গভীর কোন চিন্তায় ডুবে থাকেন। আসলেও তাই। সর্বক্ষণ চিন্তা করেন ফাদার, নিজের জন্যে যতটা না ভাবেন, তার বহুগণ বেশি ভাবেন অন্যদের কথা, বিশেষ করে গরীবের কথা।

১৮২০ সালের দিকে শহরের প্রায় সবাই জেনে গেল, প্যারিসের এক ব্যাংকে ফাদারের ছয় লাখ ত্রিশ হাজার ফ্রাঁ জমা আছে, এবং এ পর্যন্ত এই শহর ও এর গরীব অধিবাসীদের উন্নতির পিছনে এক মিলিয়নেরও বেশি খরচ করেছেন তিনি। এ খবর কে বা কারা ছড়িয়েছে কেউ জানে না, তবে ফাদার ম্যাডেলিন যে নন, তাতে সন্দেহ নেই। যে নিজের সম্পর্কেই মুখ খোলে না, সে তার জমা-খরচ সম্পর্কে কানাঘুষার সুযোগ সৃষ্টি করবে, তা হতে পারে না।

ততদিনে অন্য সব অলঙ্কার ব্যবসায়ীরাও তাঁর উদ্ভাবিত পথ অনুসরণ করে লাল হয়ে গেছে। দেশে তো বটেই, বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে মন্ট্রিল-সুর-মেয়ারের অলঙ্কারের গুণকীর্তন। আগের বছর, ১৮১৯ সালে ফাদার ম্যাডেলিনের সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কাজে সনুতষ্ট হয়ে রাজা অষ্টাদশ লুই তাকে এখানকার মেয়র নিয়োগ করেছিলেন, কিনুত বিনয়ের সাথে ফাদার সে পদ নিতে অস্বীকার করেন। সে বছরই মন্ট্রিল-সুর মেয়ারে খুব বড় এক অলঙ্কার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় ফাদারের উদ্যোগে।

স্থানীয় প্রসুততকারীদের অলঙ্কারের মান দেখে অভিভূত হন রাজা, ফাদার ম্যাডেলিনকে এই মৃত শিল্পের নব জন্মদাতা আখ্যা দিয়ে তাকে 'শেভালিয়ের অভ দ্যা লেজিয়ন অভ অনার' পদক দেন তিনি। দিন যায়, ফাদারের সুনাম-সুকীর্তির কথা মুখে মুখে ছড়াতে লাগল আরও বেশি বেশি।

২০ সালে আবার তাকে মেয়র নিযুক্ত করলেন রাজা, এবারও অস্বীকার করলেন ম্যাডেলিন। কিনুত শহরবাসী মুক্তি দিল না তাঁকে এবার, ধরে বসল খুব করে। শেষ পর্যন্ত হার মানতে হলো তাকে, মন্ট্রিল-সুর-মেয়ারের মেয়র হলেন ফাদার ম্যাডেলিন। হলেন মঁসিয়ে মেয়র।

ছোট ছেলে-মেয়েদের খুব ভালবাসতেন তিনি, বিশেষ করে যারা গরীব। তাকেও ওদের দারুণ পছন্দ। যেখানেই যান মেয়র ম্যাডেলিন, সেখানেই ঝাক ঝাক শিশু কিশোর ঘিরে থাকত তাকে। শিশুদের সাথে শিশু হয়ে যেতেন তিনি। তাদের নিয়ে খোলা মাঠে হেঁটে বেড়াতে পছন্দ করতেন।

সব সময় চওড়া কিনারার হ্যাঁট পরেন মেয়র ম্যাডেলিন, গায়ে থাকে গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা ওভারকোট। শিশুরা ছাড়া অন্যদের সাথে তেমন একটা কথা বলেন না প্রয়োজন ছাড়া। কারও মুখে নিজের প্রশংসা শুনলে লজ্জা পান। রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটেন, প্রায় সারাক্ষণই এক হাত অভিবাদন জানানোর ভঙ্গিতে হ্যাঁটের কিনারা ছুঁয়ে থাকে, যেন পথের পাশের সবাইকে সম্মান জানাচ্ছেন তিনি। পুরুষেরা খুশি হয়। মহিলারাও হয়। আড়ালে তারা মেয়রকে আদর করে 'চমৎকার ভল্লুক' বলে ডাকে।

এত টাকা, তবু খুব সাধারণ জীবন যাপন করেন মেয়র ম্যাডেলিন। বাসায় ছোটখাট এক লাইব্রেরি আছে। অবসরে বই পড়েন তিনি। এমনকি যখন খেতে বসেন, তখনও সামনে বই খোলা থাকে তার বয়স যা-ই হোক, দেহে প্রচণ্ড শক্তি মেয়রের। চারজন জোয়ান পুরুষ যে ভার বইতে পারে, ম্যাডেলিন একাই তা পারেন। পথে যখন বের হন, ওভার কোটের পকেট ভরা টাকা থাকে তার, কোথায় কোন গবীর-দুঃখী সামনে পড়ে যায়, সাহায্য প্রয়োজন হয় তার, কে জানে!

গরীবের জন্যে অনেক কিছুই করেন মেয়র ম্যাডেলিন। তার মধ্যে একটা ছিল খুবই অদুভত। প্রায় রাতেই কোন না কোন অভাবী মানুষের বাসাবাড়িতে ঢুকে পড়েন তিনি চোরের মত তালা ভেঙে। গৃহকর্তা বা কর্ত্রী যে-ই হোক, যখন অনুপস্থিত থাকে, তখন.কাজটা করেন মেয়র। তারা ফিরে এসে যখন দেখে দরজার তালা ভাঙা, চেঁচিয়ে পাড়া মত করে প্রথমে। এরপর যখন কি কি চুরি গেছে দেখার জন্যে ভেতরে ঢোকে, মহাবিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যায় তাদের।

ঢুকতেই নজর পড়ে, এমন কোন জায়গায় সোনার চকচকে মুদ্রা পড়ে আছে দেখে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে তারা, এ কেমন চোর! কেউই জানে না এই মহানুভব চোরটির পরিচয়, তবে কেউ কেউ অনুমান করতে পারে। সে যে-ই হোক, তারা তার নাম রেখেছে দয়ালু চোর।

মেয়রের আরেক অদুভত স্বভাবের কথা অনেকেই জানে। যখনই তিনি খবর পান শহরে কোন কিশোর চিমনি ক্লীনার এসেছে বাইরে থেকে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে আসার জন্যে লোক পাঠান তিনি। তাকে কাছে বসিয়ে তার নাম-ধাম জিজ্ঞেস করেন। বিদায়ের সময় মুঠো মুঠো ফ্রাঁ খুঁজে দেন তার পকেটে।

১৮১৯ সালের প্রথমদিকে আরেক অদুভত আচরণ দেখা গেল মেয়রের মধ্যে। পত্রিকায় ডির বিশপ বিয়েভেনু মিরিয়েলের মারা যাওয়ার খবর ছাপা হওয়ার পরদিন কালো পোশাক পরতে দেখা গেল তাকে। এ নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হলো শহরে। সবার ধারণী হলো, নিশ্চয়ই বিশপের সাথে মঁসিয়ে মেয়রের আত্মীয়তা আছে।

এক বৃদ্ধা সাহস করে জানতে চাইল মেয়রের কাছে খবরটা সত্যি কি না। জবাবে মাথা

দোলালেন বিষন্ন ম্যাভেলিন। ‘না, ম্যাডাম।’

‘তাহলে শোকের পোশাক কেন পরেছেন আপনি?’

‘কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে বসে থাকলেন মেয়র। ছোট বেলায় তাঁর বাসায় কাজ করেছি আমি কিছুদিন।’

পাঁচ

সমাজে এমন কিছু মানুষ থাকে, কারও উন্নতি দেখলে যাদের চোখ টাটায়। প্রতিপদে তার ভুল, খুঁত বের করার জন্যে উঠেপড়ে লাগে। কি করে তাকে হেয় করা যায়, সেই ফিকিরে থাকে। মন্ট্রিল-সুর-মেয়ারেও তেমন কিছু ছিল যারা ফাদার ম্যাডেলিনের এই দ্রুত উন্নতি সহ্য করতে পারত না। তার প্রতিটি কাজের পিছনেই মতলব আছে বলে প্রচার করে বেড়াত তারা।

কিন্তু যখন কিছুতেই ঘায়েল হলেন না ম্যাডেলিন, বরং দিন দিন উন্নতির শিখরে উঠে যেতে লাগলেন, তখন ঝিমিয়ে পড়ল তারা। তারপর একসময় মুখ বুজে তাঁর আরোহণ, সমাজসেবা, পদক পাওয়া, মেয়র হওয়া ইত্যাদি স্রেফ দেখে গেল। তারপর মেয়রের জনপ্রিয়তা যখন তুঙ্গে, তখন আর তাদের কারও পাত্তা নেই। হাওয়া হয়ে গেল মানুষগুলো। সমাজেই আছে তারা, তবে নিজের অতীত ভূমিকা চেপে রাখতে সচেষ্ট। উল্টে মেয়রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

এক সময় সবাই ভুলে গেল সেসব দিনের কথা। শহরের সবার চোখে মেয়র ম্যাডেলিন এখন স্বর্গের দূত। অতিবড় দুর্মুখের মুখেও আর নিন্দা শোনা যায় না মেয়রের। দেবতার মত মানে সবাই তাকে, দেখেও তেমনি ভক্তির চোখে।

একজন কেবল আলাদা। দূর থেকে সর্বক্ষণ ফাদারের ওপর নজর রাখে সে, গভীর সন্দেহের চোখে তাকে যেন চেনার চেষ্টা করে। প্রায়ই বিড় বিড় করে নিজেকে শোনায় লোকটা, একে কোথায় যেন দেখেছি আমি! নিশ্চই দেখেছি! নইলে এত চেনা চেনা কেন মনে হয়? কেন ওর হাঁটার ভঙ্গি এত পরিচিত লাগে?

এখানকার এক পুলিশ ইন্সপেক্টর এই লোক, গোয়েন্দা। কিছুদিন আগে বদলি হয়ে এসেছে। নাম জ্যাভার। মানুষটা ঢ্যাঙা। মাথা ছোট দেহের তুলনায়, চৌকো চোয়াল। চুল ঝুলে থাকে কপাল পর্যন্ত, চওড়া জুলফি। ভুরু কুঁচকে থাকে তার সারাক্ষণ। চাউনি অন্তর্ভেদী। কারও দিকে তাকালে মনে হয় যেন তার ভেতরটাও নিমেষে দেখে ফেলে সে।

মনে মনে আজব এক দর্শন পোষণ করে ইন্সপেক্টর, রাজা থেকে শুরু করে রাজ কর্মচারী যত আছে দেশে, সবাই ভাল। অন্যেরা সব খারাপ। বিদ্রোহী। চোর-ডাকাত, ধনী, মাতাল, বারবণিতা, সবাই বিদ্রোহী। কারণ এরা রাজার আইন অমান্য করে। যে রাজার আইন অমান্য করে, সে বিদ্রোহী ছাড়া আর কি? ফ্রান্সের আন্ডারওয়ার্ল্ডে জ্যাভার ছিল মূর্তিমান এক ত্রাস। একবার তার ছোঁয়া যে পেয়েছে, সে জীবনে ভুলত না জ্যাভারকে। এক সময় তুলোঁ শহরে চাকরি করেছে সে গ্যালি গার্ড বাহিনীতে।

প্রতিটি মুহূর্ত মেয়র ম্যাডেলিনকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করে ইন্সপেক্টর। এর মধ্যে ম্যাডেলিনের সাথে পরিচয় হয়েছে তার, কিন্তু জ্যাভারকে দেখে কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি মেয়রের। সবার সাথে যেমন ব্যবহার করেন তিনি, ইন্সপেক্টরের সাথেও তাই। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আচরণ মেয়রের। ফলে দ্বিধায় পড়ে গেল জ্যাভার। যদিও সন্দেহ দূর হলো না তার।

একদিন কোন এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে মেয়র ম্যাডেলিনের উদ্দেশে এমন এক মন্তব্য করল জ্যাভার যে ভেতরে ভেতরে চিন্তিত হয়ে পড়লেন তিনি।

এদিকে বছরখানেক ভালই কাটল ফাঁতিনের। চাকরি করে, নিয়মিত যা, হোক পায়, মেয়ের জন্যে পাঠিয়ে নিজের খাওয়া-পরা মোটামুটি চলে যায়, ফলে অল্পদিনেই চেহারার হারানো জৌলুস ফিরে এল তার। তখনই বোঝা গেল ফাঁতিন যেমন-তেমন সুন্দরী নয়, খুবই সুন্দরী এবং আকর্ষণীয়। সহকর্মী মেয়েরা হিংসায় জ্বলতে লাগল, ওকে অপদস্থ করার সুযোগ খুজতে থাকল তারা।

পেয়েও গেল সুযোগ। কারখানার সবার জানা হয়ে গেল, ঘন ঘন কাকে যেন চিঠি লেখে ফাঁতিন। নিজে নয়, আরেকজনকে দিয়ে লেখায়। কোথায় চিঠি লেখে সে, তাও খুব অল্পদিনেই জানা হয়ে গেল। কি থাকে চিঠির বক্তব্য, তাও অজানা রইল না কারও। মেয়ে আছে ফাঁতিনের, অথচ ব্যাপারটা গোপন রেখেছে সে। তারওপর তাকে নিজের কাছে না রেখে মন্তফারমেলের এক হোটেল মালিকের হেফাজতে রাখা হয়েছে যখন; সবাই ভাবল নিশ্চই এর মধ্যে গলদ আছে। কথা ছড়িয়ে গেল, ফাঁতিন দুশ্চরিত্র মেয়ে।

চাকরিটা হারাল ফাঁতিন। ফাদার ম্যাডেলিনের কারখানায় অসৎ কেউ থাকতে পারে না, এ সবাই জানে। এখানে প্রতিটি কর্মচারীকে 'আমি সৎ থাকব', এই প্রতিজ্ঞা করে যোগ দিতে হয়। একদিন সকালে পঞ্চাশ ফ্রাঁর একটা নোট ধরিয়ে দেয়া হলো ফাঁতিনের হাতে। জানিয়ে দেয়া হলো তার চাকরি নেই। ফাদারের নির্দেশ। অথচ ম্যাডেলিন এর কিছুই জানতেন না।

আকাশ ভেঙে পড়ল ফাঁতিনের মাথায়। অনেক কান্নাকাটি করল সে, অনেক হাতে-পায়ে ধরল পদস্থ মহিলা কর্মকর্তার, কিছুতেই কিছু হলো না। চাকরি খুইয়ে ঘুম হারাম হয়ে গেল ফাঁতিনের, মাস শেষে কি করে, কোত্থেকে মেয়ের জন্যে টাকা পাঠাবে দিশে করে উঠতে পারল না সে। হাত একেবারে শূন্য, যে সামান্য টাকা দেয়া হয়েছিল ওকে বিদায়ের মুহূর্তে, বাকি পড়া বাড়ি ভাড়া শোধ করতে ফুরিয়ে গেছে তার বেশিরভাগ। এছাড়া বাকিতে বাসার জন্যে সামান্য আসবাব কিনেছিল সে, তাও শোধ করতে হয়েছে। নতুন করে সাজাতে চেয়েছিল তিন নিজের জীবন, সংসার। চুরমার হয়ে গেল সব।

ফাদার ম্যাডেলিনের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মাল তার মনে! পেটের ধান্ধায় নামতে হলো ফাঁতিনকে নতুন করে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে হয়রান হলো সে, ঝি-র কাজও পেল না কোথাও। কিছুদিন সৈনিকদের কাপড় সেলাই করে কাটল তার। যা আয় হলো, তা থেকে মেয়ের জন্যে পাঠিয়ে প্রায় কিছুই থাকল না। প্রচণ্ড অনটনের মধ্যে পড়ল ফাঁতিন। অবস্থা যত খারাপের দিকে যায়, ম্যাডেলিনের প্রতি ঘৃণা ততই বাড়তে থাকে তার। এক সময় কোজেতের জন্যে টাকা পাঠানোর ব্যাপারটাও অনিয়মিত হয়ে পড়ল। রেগে গেল থেনারদিয়ের, ঘন ঘন তাগাদা পাঠাতে লাগল।

মাসিক পনেরো ফ্রাঁ ছাড়াও প্রায়ই নানান বাহানায় বাড়তি টাকা চেয়ে পাঠাতে শুরু করল। একবার লিখল : 'শীতে খুব কষ্ট পাচ্ছে কোজেত। উপযুক্ত গরম জামা নেই ওর একটিও। এখনই দশ ফ্রাঁ পাঠান, গরম জামা কিনতে হবে।'

কি করে টাকা জোগাড় করবে ফাঁতিন ভেবে পেল না। শেষে অনেক ভেবে এক নাপিতের দোকানে গিয়ে হাজির হলো সে। নিজের কোমর সমান দীর্ঘ, ঘন সোনালী চুলের গোছা খুলে দেখাল তাকে। অবাক হলো নাপিত। 'এগুলো বিক্রি করব,' বলল ফাঁতিন। 'দশ ফ্রাঁ দাম চাই, কিনবেন?'

খুশি মনেই রাজি হলো লোকটা। কাঁচি দিয়ে একেবারে গোড়া থেকে কেটে নিল সব চুল। সেই টাকায় মেয়ের জন্যে সুন্দর একটা গরম জামা কিনে থেনারদিয়েরের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিল ফাঁতিন। ওটা পেয়ে খেপে গেল লোকটা। সে আসলে চেয়েছিল টাকা। শেষ পর্যন্ত কোজেতের ভাগ্যে জুটল না জামাটা, নিজের বড় মেয়েকে পরিয়ে দিল ওটা মিসেস থেনারদিয়ের। কোজেত আগের মতই ঠাণ্ডায় কাঁপে। ওদিকে ফাঁতিন ভাবে, এখন আর শীতে কষ্ট করতে হচ্ছে না তার মেয়েকে।

কিছুদিন যেতে না যেতেই আরেক চিঠি এল থেনারদিয়েরের। তাতে সে লিখেছে : ম্যালেরিয়া হয়েছে কোজেতের। ভয়ঙ্কর অসুখ। এ রোগের ওষুধ খুব দামী। আমার অবস্থা খুবই খারাপ, ওষুধ কেনার ক্ষমতা নেই। তাড়াতাড়ি চল্লিশ ফ্রাঁ পাঠান। নইলে মেয়ে বাঁচবে না।

চিঠি পড়ে উন্মাদের মত টাকার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল ফাঁতিন। কোথায় পাবে সে এত টাকা? আনমনে পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক জটলার কাছে এসে দাঁড়াল সে। এক হাতুড়ে দাঁতের ডাক্তার ক্যানভাস করছে, দাঁত তোলা, নকল দাঁত লাগানো ইত্যাদি তার পেশা। লোকেরা ভিড় করে তার ভাষণ শুনছে। জানা গেল, কেউ বেচতে চাইলে আসল দাতও কেনে সে।

সামনের দাঁত দুটো তার কাছে বেচে দিব ফাঁতিন চল্লিশ ফ্রাঁর বিনিময়ে। পাঠিয়ে দিল টাকাটা। এ শহরে এসে একটা বাসা ভাড়া নিয়েছিল সে, ভবিষ্যতের কথা ভেবে এটা ওটা কিনেছিল, বেশিরভাগই বাকিতে। ওসব আগেই গেছে। বাকি ছিল একটা আয়না, দাঁত দুটো যেদিন বিক্রি করল, সেদিন ওটাও জানালা দিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। আয়নার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে তার জীবনে। ফাঁতিনের সৌন্দর্যের প্রধান দুই উপাদান ছিল চুল আর দাত। সেসব যখন নেই, আয়না দিয়ে কি হবে? ওতে কাকে দেখাবে সে? এই চেহারা না দেখলেই বা, ক্ষতি কি?

সব যায় যাক, তবু মেয়েটা বেঁচে থাকুক। এখন আর ওষুধের অভাবে কোজেত মরবে না, তাই ভেবেই ফাঁতিন খুশি। কিন্তু বেশিদিন সুখ সইল না তার। আবার এল চিঠি : 'অসুখ সেরেছে

কোজেতের, তবে তাকে সুস্থ করে তুলতে পথ্য প্রয়োজন। এখনই একশো ফ্রাঁ পাঠান। নইলে ওকে বের করে দিতে বাধ্য হব আমি। এ যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠেছে আমাদের পক্ষে।'

চিঠি পড়ে দীর্ঘসময় স্তব্ধ বসে থাকল ফাঁতিন। সন্ধের পর মনস্থির করে ঘর ছাড়ল। সে জানে, টাকা রোজগারের অন্য পথও আছে। এখন থেকে সেই পথেই হাঁটবে সে নতুন করে। আগের চেহারা যদিও নেই, তবু, একটা-দুটো পেট কি চালানোর মত পয়সা কি জোটাতে পারবে না সে? নিশ্চয় পারবে।

একদিন সকালে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন মেয়র ম্যাডেলিন। দূরে একটা জটলা এবং মানুষের চেঁচামেচি শুনে তাড়াতাড়ি সেদিকে এগোলেন। দেখা গেল একটা ঘোড়ার গাড়ি বেকায়দা ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে, তার নিচে চাপা পড়ে আছে এক বৃদ্ধ, ফশেলভেঁ নাম তার।

এক পলকে পরিস্থিতি বোঝা হয়ে গেল মেয়রের। যে করেই হোক, ঘোড়াটার সামনের এক পা ভেঙে গেছে, মাটিতে বুক ঠেকিয়ে পড়ে আছে ওটা। গাড়ির সামনের দুই চাকা ধরে থাকা দণ্ডের নিচে আটকে পড়েছে ফশেলভেঁ। ওদিকে গাড়িতে মালপত্র ছিল প্রচুর, এত ভার সহ্য করতে না পেরে আর্তকণ্ঠে অনবরত চেঁচাচ্ছে সে। ভিড়ের মধ্যে ইন্সপেক্টর জ্যাভারও আছে। আরও আগেই এসেছে সে এখানে, টানাটানি করে গাড়ির তলা থেকে বৃদ্ধকে বের করার অনেক চেষ্টা করেছে কয়েকজনকে নিয়ে, একচুলও নড়েনি গাড়ি।

ব্যর্থ হয়ে একজনকে পাঠিয়েছে সে জ্যাক আনতে। লোকটার ফিরে আসার অপেক্ষায় আছে সবাই। ওদিকে ফশেলভেঁর যায় যায় অবস্থা।

মঁসিয়ে মেয়রকে দেখে সসম্মানে জায়গা করে দিল সবাই। 'জ্যাক, জোগাড় করতে পারেন কেউ?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

কে একজন জবাবে বলল, 'জ্যাক আনতে লোক গেছে, মঁসিয়ে মেয়র। কিন্তু তার ফিরতে কম করেও এক ঘণ্টা লাগবে।'

এই সময় 'মুট!' করে মৃদু একটা আওয়াজ উঠল, একই সাথে চেঁচিয়ে উঠল ফশেলভেঁ, বাঁচাও আমাকে! পা ভেঙে গেছে আমার, মরে যাচ্ছি আমি।

ম্যাডেলিন বুঝলেন এখনই কিছু না করলে বাচানো যাবে না মানুষটিকে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই চট করে গাড়ির তলায় ঢুকে পড়লেন তিনি ফশেলভেঁর গা ঘেঁষে, 'হায়! হায়!,' করে উঠল সবাই। শুধু জ্যাভারের মধ্যে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না, শিকারী বাজের দৃষ্টিতে মেয়রের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

ওদিকে মেয়রের কাণ্ড দেখে ফশেলভেঁও চেঁচিয়ে উঠল। করছেন কি, মঁসিয়ে বেরিয়ে যান, নইলে আপনিও মরবেন আমার সাথে!

কানেই তুললেন না মেয়র, তার পাশে, দণ্ডটার তলায় জায়গা করে নিয়ে বহু কষ্টে উপড় হলেন তিনি, তারপর দুই প্রচণ্ড শক্তিশালী বাহুতে ভর দিয়ে পিঠের সাহায্যে ওপরদিকে ঠেলা দিলেন গাড়িটাকে। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল সবাই, প্রায় নিশ্চিত বুঝে গেছে তারা, ফশেলভেঁ তো গেছেই, মেয়রও শেষ। মানুষটা বোকার মত নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছে।

কিন্তু অনেক বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তাদের জন্যে। প্রথম প্রচেষ্টায় আট দশজন যা পারেনি, মেয়র একাই তা করে ফেললেন। প্রথম কয়েক মুহূর্ত অনড় থাকল গাড়ি, তারপর নড়ে উঠল হঠাৎ করে। উঠে পড়ল শূন্যে। 'হাত লাগান সবাই!' অসুফটে কোনরকমে বললেন মেয়র। 'তাড়াতাড়ি বের করুন একে!'

এইবার একযোগে ঝাপিয়ে পড়ল সবাই, অল্পক্ষণেই মুক্ত করে ফেলল দু'জনকে। ততক্ষণে ঘেমে গোসল হয়ে গেছেন মেয়র, পরনের কাপড় ছিড়ে একাকার। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। আপনি ঠিক আছেন তো, 'মঁসিয়ে মেয়র?' এগিয়ে এসে জানতে চাইল জ্যাভার।

'হ্যাঁ,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন ম্যাডেলিন।

'ওহ, যা দেখালেন! ঠিক আপনার মত শক্তিশালী আরেকজনকে চিনতাম আমি, মঁসিয়ে।

প্রচণ্ড শক্তি ছিল তার দেহে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ,' মেয়রের চোখে চোখ রেখে বলল সে চিবিয়ে চিবিয়ে, কয়েক বছর আগে তুলোয় পরিচয় হয়েছিল তার সাথে। কয়েদী ছিল লোকটা, এক জাহাজে দণ্ড খাটছিল তখন।

জ্যাভার টের পেল না বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে চিন্তায় পড়ে গেলেন মেয়র।

'জানেন, একবার তুলোর নগরসভার এক ঝুল বারান্দা মেরামতের কাজ চলছিল। দুর্বল ছিল বলে ওটার নিচ থেকে ঠেকা দিয়ে নেয়া হয়েছিল। একদিন দুপুরে মিস্ত্রিরা যখন খেতে গেছে, হঠাৎ ঠেকি ভেঙে গেল, আস্ত বারান্দাটাই পড়ে পড়ে অবস্থা। এই সময় কোত্থেকে এসে হাজির হলো সেই লোক, এইমাত্র আপনি যেমন করলেন, তেমনি পিঠ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখল বারান্দা। খবর পেয়ে মিস্ত্রিরা ছুটে আসা পর্যন্ত একাই ওটাকে সামলে রেখেছিল সে।'

বাসায় ফিরে এলেন মেয়র। মাথার মধ্যে জ্যাভারের চিন্তা। ওদিকে এক পা ভেঙে বেকার হয়ে গেল বৃদ্ধ ফশেলভেঁ। ঘোড়াটাও গেছে। ভাড়া টেনে দিন চলত তার। তাকে প্যারিসের এক কনভেন্টে চাকরি পাইয়ে দিলেন ম্যাডেলিন।

ফাঁতিন চাকরি হারানোর সাত-আট মাস পরের ঘটনা।

একদিন বিকেলে শহরের অফিসার'স কাফের সামনে হাঁটাহাঁটি করছে ফাঁতিন। প্রচণ্ড শীত পড়েছে গত কদিন থেকে। তুষার পড়ছে অবিরাম। অথচ ফাঁতিনকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সে খেয়ালই নেই তার। কাঁধখোলা পাতলা কাপড়ের জামা পরে আছে ফাঁতিন, খদ্দের জোগাড়ের ধান্ধায় ঘুর ঘুর করছে। এই ক'মাসে চুল বেড়ে ঘাড় ছুঁয়েছে ফলে চেহারা খানিকটা ফিরেছে। তবে দাঁত দুটোর জন্যে আফসোসের সীমা নেই তার। মুখ বুজেই থাকে যথাসম্ভব, নইলে দেখতে বিশ্রী লাগে। ওকে দেখে কোত্থেকে ছুটে এল এক সুবেশী বখাটে যুবক নানারকম অশ্লীল মন্তব্য করতে লাগল। প্রথমে পাত্তা দিল না ফাঁতিন, ভেবেছিল খানিকপর নিজে থেকেই বিদায় হবে আপদ। কিন্তু হলো না, বরং ক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে থাকল তার আচরণ। কিছুতেই যখন ফাঁতিনকে চটানো গেল না, তখন অন্য পথ ধরল বখাটে যুবক। বড় এক মুঠো তুষার তুলে ওর কাধের উন্মুক্ত ফাঁক দিয়ে ঠেসে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল।

রাগে অন্ধ হয়ে গেল ফাঁতিন, ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মত ঝাপিয়ে পড়ল যুবকের ওপর। ক্রমাগত কিল-ঘুসি আর লাথি মারতে মারতে শুইয়ে ফেলল তাকে। এতটা আশঙ্কা ভুলেও করেনি যুবক, আত্মরক্ষার কোন উপায় খুঁজে পেল না সে। সমানে চেঁচাচ্ছে ফাঁতিন, জঘন্য ভাষায় গালাগাল করছে যুবককে, তার সাথে হাত-পা দুটোই চলছে তার অবিরাম।

দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল উৎসাহী দর্শকের। তবে বেশিদূর এগোতে পারল না অপ্রীতিকর ব্যাপারটা। ধারেকাছেই কোথাও ছিল ইন্সপেক্টর জ্যাভার, ছুটে এসে ফাঁতিনকে ধরে ফেলল সে। বাহু ধরে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে চলল সে তাকে। হুড়োহুড়ির মধ্যে কোনদিকে যে পালিয়ে গেল বখাটে যুবক, খেয়ালই করল না কেউ।

ফাঁতিনকে থানায় নিয়ে এল জ্যাভার। তাকে বসিয়ে রেখে এজাহার লিখতে বসে গেল তক্ষুণি। একজন ভদ্র নাগরিককে জনসমক্ষে প্রচণ্ডভাবে অপমান করেছে ফাঁতিন, এই ছিল তার অভিযোগ। লেখা শেষ হতে এজাহারের একটা কপি এক সেপাইর হাতে দিল জ্যাভার। তারপর ফাঁতিনকে লক্ষ করে বলল, 'যাও, ছয় মাস জেল খেটে এসে গিয়ে।'

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল ফাঁতিন। সবলে জ্যাভারের পা জড়িয়ে ধরে তাকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে কাকুতি মিনতি করতে লাগল। 'আমি জেলে গেলে আমার ছোট্ট মেয়ে না খেতে পেয়ে মরে যাবে, ইন্সপেক্টর সাহেব! আমাকে দয়া করুন, মঁসিয়ে। সত্যি বলছি, আমার কোন দোষ নেই, ওই ছেলেটাই দায়ী এ জন্যে। আমার জামার মধ্যে বরফ ভরে দিয়েছিল ও, তারপর আমি মেরেছি। আমি জেলে গেলে আমার কচি বাচ্চা বাচবে না।'

মন গলল না কঠোর জ্যাভারের। সেপাইদের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল সে, 'একে নিয়ে

যাও।’

কেউ খেয়াল করেনি, আরেকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে রুমের বাইরে, অনেকক্ষণ আগেই এসেছে সে। ভেতরের কথাবার্তা শুনছে নীরবে। ফাঁতিন তখন কান্নার ফাঁকে ফাঁকে জ্যাভারকে তার দুঃখের কাহিনী শোনাচ্ছে। তবুদয়া হলো না জ্যাভারের। ‘ওসব বুঝি না। আইন অমান্য করছ, কাজেই তার শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে।’

এইবার ভেতরে চলে এল বাইরে দাঁড়ানো লোকটা। তাকে দেখে মনে হলো যেন বেশ বিরক্ত হয়েছে জ্যাভার। ‘মাফ করবেন, মঁসিয়ে মেয়র। আপনি এখানে?’

জবাব দেয়ার সময় পেলেন না মেয়র। জ্যাভারের সম্বোধন শুনেই তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছে ফাঁতিন, ছুটে ম্যাডেলিনের সামনে এসে দাঁড়াল সে। তীব্র ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠল, ‘ওহ! আপনি সেই মহানুভব মেয়র, যার জন্যে আজ আমার এই অবস্থা?’ কথা শেষ করেই একদলা থুথু ছুঁড়ে দিল মেয়েটি তার মুখের ওপর। স্তম্ভিত হয়ে গেল উপস্থিত প্রত্যেকে। জ্যাভার পর্যন্ত হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। সবাই নির্বাক। কিনুত যাকে কেন্দ্র করে এত বড় অঘটন, তিনি বিন্দুমাত্র রাগলেন না। কিছুই বললেন না ফাঁতিনকে। রুমালে মুখ মুছে জ্যাভারের উদ্দেশে শান্ত কণ্ঠে বললেন, ‘ইন্সপেক্টর, মেয়েটাকে ছেড়ে দিন।’

বেকুব হয়ে গেল জ্যাভার। অবশ্য পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। ‘মঁসিয়ে মেয়র, আমি দুঃখিত। একে ছাড়া যাবে না।’

‘কেন?’

‘একটু আগে মেয়েটা একজন ভদ্র নাগরিককে অপদস্থ করেছে প্রকাশ্যে।’

‘জানি, বললেন মেয়র। কিনুত সে জন্যে এ দায়ী নয়। ওখানে প্রচুর লোক ছিল, যারা ঘটনাটা দেখেছে। তারা সবাই বলেছে দোষ ছেলেটার, এর নয়। কাজেই অনর্থক মেয়েটিকে শাস্তি দিতে পারেন না আপনি।’

‘কিনুত ও এইমাত্র আমাদের সবার চোখের সামনে শহরের মেয়রকে অপমান করেছে, মঁসিয়ে।’

‘সে আমার ব্যাপার, আমি বুঝব।’

‘না,মঁসিয়ে। ব্যাপারটা শুধু আপনার নয়, মহান রাজার মনোনীত জনপ্রতিনিধিকে অপমান করার অর্থ তাঁকেও অপমান করা।’

কিছুটা নরম হলেন ম্যাডেলিন। ‘ইন্সপেক্টর, আমি জানি আপনি একজন সৎ অফিসার। তাই বলছি, বখাটে ছেলেটার দোষ বিচার না করে যদি একা এই মেয়েকে সাজা দেন আপনি, তাহলে নিজের সততাকেও আপনি অপমান করবেন। আমি বিশ্বাস করি আপনি তা করতে পারেন না।’

কিনুত, মঁসিয়ে...

‘আর কোন কথা নয়, অফিসার। একে আমি নিজ দায়িত্বে নিয়ে, যাচ্ছি।’

ততক্ষণে স্তম্ভিত হয়ে গেছে ফাঁতিন। বুকের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে চলেছে তার। অবাক চোখে মেয়রকে দেখছে তো দেখছেই সে। এদিকে যুক্তি-তর্কে হার মেনে রেগেমেগে রুম থেকে বেরিয়ে গেল জ্যাভার। ফাঁতিনের দিকে ফিরে ম্যাডেলিন বললেন, ‘বাইরে দাঁড়িয়ে আমি তোমার সব কথা শুনেছি। তোমার দুর্ভাগ্যের কথা কিছুই আমি জানতাম না। যা ঘটেছে, সব আমার অজান্তে ঘটেছে। সে যাক, এখন চলো। আমি তোমার দায়িত্ব নিলাম। তোমার কোজেতকে আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসব, মেয়েকে নিয়ে যেখানে খুশি থাকতে পারবে তুমি। এসো।’

অসহ্য আনন্দে-আবেগে কেঁদে ফেলল ফাঁতিন। নিজের কারখানার শ্রমিকদের জন্যে একটা দাতব্য হাসপাতাল খুলেছিলেন ম্যাডেলিন, সেখানে নিয়ে এলেন তিনি মেয়েটিকে। সে রাতেই জ্বরে পড়ল সে—প্রচণ্ড জ্বর। সেই সাথে কাশি। একটানা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পরদিন দুপুরে জাগল ফাঁতিন। চোখ মেলেই ম্যাডেলিনকে সামনে বসা দেখে খুশি হয়ে উঠল। ‘কেমন আছ এখন?’ জানতে চাইলেন তিনি।

অনেক ভাল, মঁসিয়ে। আপনি কি করছিলেন এখানে?

মধুর হাসি ফুটল ম্যাডেলিনের মুখে। ‘তোমার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলাম।’ কিছুক্ষণ এটা-ওটা নিয়ে আলোচনা করলেন তিনি ফাঁতিনের সাথে, তার জীবনের সমস্ত কিছু জেনে নিলেন। সেদিনই থেনারদিয়েরের নামে তিনশো ফ্রাঁ পাঠিয়ে দিলেন ম্যাডেলিন। সাথে একটা চিঠি। তাতে বলা হলো, পাওনা বুঝে নিয়ে সে যেন খুব তাড়াতাড়ি কোজেতকে নিয়ে মন্ট্রিল-সুর-মেয়ারে চলে আসে। তার মা খুবই অসুস্থ। মেয়েকে দেখতে চায় সে।

চিঠি আর টাকা পেয়ে থেনারদিয়ের অবাক। স্ত্রীকে বলল, কিছুতেই ছাড়া যাবে না কোজেতকে। মনে হচ্ছে ওর মা খুব মালদার কোন নাগর ধরেছে। খাবার এমন সুযোগ ছাড়া বোকামি হবে।

অনেক হিসেব কষে একটা বিল দাঁড় করাল সে, ডাক্তার ওষুধ আর খোরপোষ বকেয়া বাবদ মোট পাঁচশো ফ্রাঁর। তার জবাব পেয়ে সাথে সাথে আরও তিনশো ফ্র পাঠালেন মেয়র। লিখলেন : ‘তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুন মেয়েটিকে’।

কিন্তু এল না চতুর থেনারদিয়ের, নানা অজুহাতে মাস পার করে দিল লোকটা। এদিকে ফাঁতিনের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। জ্বর কমছে না। কাশি আরও বেড়েছে। দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে সে। একদিন ডাক্তার বললেন, ‘ওর মেয়েটিকে নিয়ে আসা গেলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে হয়তো। সারাক্ষণ মুখে কেবল মেয়ের কথা ফাঁতিনের।’

আশায় আশায় আরও কয়েকদিন গেল। আরও সঙ্গীন হয়ে উঠল ফাঁতিনের অবস্থা। প্রায় সময়ই অজ্ঞান থাকে সে প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে। জ্ঞান ফিরলেই ঘোলাটে চোখে এদিক-ওদিক তাকায়। বিড়বিড় করে বলতে থাকে, ‘আমার মেয়ে কই? আমার কোজেত কই? আসেনি এখনও?’।

অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন ম্যাডেলিন, তিনি নিজেই যাবেন কোজেতকে আনতে। ফাঁতিনকে জানালেন, কাল-পরশুর মধ্যে মন্তফারমেল যাচ্ছেন তিনি। কিন্তু নানান কাজের ঝামেলায় যাত্রা পিছিয়ে গেল তার কয়েকদিন।

হাসপাতালবাসের দেড় মাস পেরিয়ে গেছে তখন ফাঁতিনের।

ছয়

একদিন সকালে নিজের অফিসে জরুরী কিছু জমে থাকা কাজ করছিলেন মেয়র ম্যাডেলিন। এগুলো সেরে ফাঁতিনের মেয়েকে আনতে যাবেন। এই সময় ইন্সপেক্টর জ্যাভার এল তার সাথে দেখা করতে। তাকে ভেতরে ডেকে পাঠালেন ম্যাডেলিন। এল লোকটা। খেয়াল করলেন মেয়র, আজ তার চাউনি অন্যরকম লাগছে। অনেকটা লজ্জা পাওয়ার, ক্ষমা প্রার্থনার দৃষ্টি।

কি ব্যাপার, জ্যাভার?

'মঁসিয়ে মেয়র, একটা মহাঅপরাধ ঘটে গেছে। ব্যাপারটা আপনাকে জানানো আমার কর্তব্য, তাই এসেছি।'

'সেটা কি?'

সাধারণ এক পুলিশ অফিসার ম্যাজিস্ট্রেটের সমান পদমর্যাদার এক জনপ্রতিনিধিকে প্রশাসনের কাছে হেয় করতে চেয়েছে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে গভীর দৃষ্টিতে জ্যাভারকে দেখলেন মেয়র। কে সেই পুলিশ অফিসারটি?

'আমি, মঁসিয়ে মেয়র।'

আর জনপ্রতিনিধিটি?

'আপনি।'

'আচ্ছা!' কৌতূহলী হয়ে উঠলেন ম্যাডেলিন।

'আমি এসেছি এ ব্যাপারে আপনি যাতে আমাকে অভিযুক্ত করেন, বরখাস্ত করেন, সেই অনুরোধ জানাতে।'

তাজ্জব হলেন মেয়র, কিছু বলার জন্যে মুখ খুললেন, কিনুত বাধা দল জ্যাভার। 'মঁসিয়ে মেয়র, আমি ইস্তফা দিতে পারতাম, কিনুত তাতে আমার সম্মান বজায় থাকবে। কিনুত যে অন্যায় আমি করেছি, তাতে সম্মান নয়, আমার শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। আপনি আমাকে বরখাস্ত করুন। সেদিন আমার সততার দোহাই দিয়ে মেয়েটিকে ছাড়িয়ে এনেছেন আপনি। আজ আপনাকে আমি আপনার সততার দোহাই দচ্ছি, আমাকে আমার ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দিন।'

'কিনুত এতকিছু কি নিয়ে তা তো বুঝলাম না, জ্যাভার। ঘটনাটা খুলে বলুন। কি এমন করেছেন আপনি আমার বিরুদ্ধে?'

খানিক ইতসুতত করে জ্যাভার বলল, 'ফাঁতিনকে যেদিন আপনি প্রায় জোর করে ছাড়িয়ে এনেছিলেন, সেদিন আপনার ওপর খুব রেগে গয়েছিলাম আমি।'

'তারপর?'

'এখানে বদলী হয়ে আসার দিন থেকেই সন্দেহের চোখে দেখতাম আমি আপনাকে। কারণ একজনের সাথে আপনার চেহারার হুবহু মিল আছে। কেবল চেহারাই না, স্বাস্থ্য, বয়স, হাটার ধরন সব, অদ্ভুত মিল আপনার তার সাথে। সেদিন যে এক কয়েদীর গল্প বলেছিলাম আপনাকে, সেই লোকের। তার নাম জাঁ ভালজাঁ।'

'কি নাম বললেন?'

'জাঁ ভালজাঁ, মঁসিয়ে। বিশ বছর আগে তুলোঁর গ্যালি গার্ড বাহিনীর অ্যাডজুটেন্ট ছিলাম আমি, তখন দেখেছি তাকে। ভীষণ বিপজ্জনক মানুষ ছিল, পায়ের বেড়ি কেটে কয়েকবার পালিয়েছিল জাহাজ থেকে প্রতিবারই অবশ্য ধরা পড়ে যায়। আট বছর আগে মুক্তি পায় জাঁ ভালজাঁ। ছাড়া পেয়েই আবার ডাকাতি করে বসে।'

'ডাকাতি!'

'হ্যাঁ। খোলা মাঠে একটি ছেলের বুকে অস্ত্র ঠেকিয়ে তার চল্লিশ সাউ ডাকাতি করে পালিয়ে যায়। তারপর থেকেই খোঁজা হচ্ছে তাকে, এই আট বছর বহু খুঁজেছি, কোন হদিসই পাইনি। এখানে এসে যেদি আপনাকে দেখলাম, প্রায় নিশ্চিত হলাম যে আপনি সেই জাঁ ভালজাঁ পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম, এই সময় ফাঁতিনবে ছাড়িয়ে আনলেন আপনি। আমিও রেগে গিয়ে প্যারিসে লিখে পাঠালাম যে জাঁ ভালজাঁকে পাওয়া গেছে, আপনিই সেই লোক।'

অপলক চোখে জ্যাভারকে দেখছিলেন মেয়র। চিন্তিত। এইবার নড়ে বসলেন। ‘তারপর কি হলো?’

‘তারপর...!’ করুণ হাসি ফুটল ইন্সপেক্টরের চৌকো মুখে। ‘ওর জবাবে বলল, আমি পাগল হয়ে গেছি। মাথার ঠিক নেই আমার। আর জানাল, জাঁ ভালজাঁকে কিছুদিন আগেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ মুহূর্তে অ্যারাসে বিচার চলছে তার। কাল বিচারের রায় দেয়া হবে।’

‘ধরা পড়েছে জাঁ ভালজাঁ? তার বিচার হচ্ছে?’ বিড় বিড় করে বললেন ম্যাডেলিন।

‘হ্যাঁ, মঁসিয়ে মেয়র। অবশ্য প্রথমে বিশ্বাস করিনি আমি কথাটা। লোকটা নিজেও বিচারের সময়ে বারবার দাবি করেছে, সে জাঁ ভালজাঁ নয়, তার নাম চ্যাম্পম্যাথিউ। পরে অ্যারাস কোর্টের বিচারক তুঁলো থেকে ভালজাঁর দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কোচেপালি আর সেনেলদিউকে আনিয়ে তাদের দিয়ে সনাক্ত করিয়েছেন তাকে। একই জাহাজে দীর্ঘদিন একসাথে কাজ করেছে ওরা তিনজন, খুব ভাল করে চেনে একে অন্যকে। ওরা দেখামাত্র বলেছে লোকটার দাবি মিথ্যে, সে-ই জাঁ ভালজাঁ। লোকটাকে নিজের চোখে দেখার জন্যে আমিও গিয়েছিলাম অ্যারাস।’

‘তারপর? দেখলেন?’

‘দেখেছি, মঁসিয়ে মেয়র। আর কোন সন্দেহ নেই আমার। সেই লোকই জাঁ ভালজাঁ। আপনাকে আমি মিছেই সন্দেহ করেছি। এ জন্যে অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত আমার। আপনি দয়া করে...’

‘জাঁ ভালজাঁর বিচারের রায় হবে কাল?’

‘হ্যাঁ।’

আসন ছাড়লেন মেয়র। ‘জ্যাভার, আপনি যা করেছেন, সত্যিকার একজন দেশপ্রেমিক অফিসারের কাজই করেছেন। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমার মতে এ জন্যে আপনার প্রমোশন হওয়া উচিত। বরখাস্ত করার তো প্রশ্নই আসে না, বরং আমি আশা করব আপনি পদত্যাগও করবেন না। নিজ পদে বহাল থাকবেন আপনি।’

‘আমি আপনার সাথে একমত হতে পারলাম না, মঁসিয়ে মেয়র। একজন অত্যন্ত সম্মানীয় জনপ্রতিনিধিকে অন্যায়ভাবে সন্দেহ করে তাকে হেয় করতে চেয়েছি আমি, সাধারণ চোর, কয়েদখাটা আসামী ভেবে তাকে আমি পরোক্ষভাবে...’

‘না,’ আত্মগ্লানিতে বিমর্ষ, উত্তেজিত জ্যাভারকে বাধা দিলেন ম্যাডেলিন, আপনার মনোভাব বুঝতে পারছি আমি, জ্যাভার। কিন্তু তবু বলি, এতে কোন অন্যায় হয়নি আপনার, যা করেছেন ঠিকই করেছেন। আমার কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছেন তো? কিন্তু আমি কিছুই মনে করিনি।

‘কিন্তু...’

আর কোন কথা নয় এ প্রসঙ্গে, আবার বাধা দিলেন মেয়র। নিজের কাজ করে যান।

তবু দ্বিধা যায় না ইন্সপেক্টরের! যাই যাই করেও দাঁড়িয়ে থাকল দীর্ঘ সময়। তারপর নীরবে ঘুরে দাঁড়াল। দরজার সামনে পৌঁছে পিছনে তাকাল। ‘আমি পদত্যাগ করব না, মঁসিয়ে মেয়র। আমি আপনার বরখাস্তের সমনের অপেক্ষায় থাকব।’

লোকটা বিদেয় হতে অনেকক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকলেন ম্যাডেলিন। মৃদু মৃদু মাথা নড়ছে তার, মনে হলো যেন অদৃশ্য কারও সাথে তর্ক করছেন। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফিস ফিস করে বললেন তিনি, ‘হা ঈশ্বর! আবার ফিরে যেতে হবে সেখানে? তাও মিথ্যে অভিযোগে?’

খানিক পরই সবেগে মাথা দোলালেন ম্যাডেলিন। ‘না! কক্ষনও না!’

‘কিন্তু তাহলে যে নির্দোষ একজন...’

পরদিন। অ্যারাসের জনাকীর্ণ আদালতে এসে ঢুকলেন মেয়র ম্যাডেলিন। মন্ট্রিল-সুর-মেয়ারের মাননীয় মেয়রকে সবাই চেনে, এমনকি বিচারক পর্যন্ত, কাজেই সসম্মানে বসতে দেয়া হলো তাকে অভিজাত দর্শকদের সারিতে। বিচার তখন প্রায় শেষ পর্যায়ে, রায় ঘোষণা করা হবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে। চ্যাম্পম্যাথিউ যে আসলে জাঁ ভালজাঁ, নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়ে গেছে তা।

বিচারকের বাঁ দিকে পুলিশ পাহারায় বসা জাঁ ভালজাঁকে দেখলেন ম্যাডেলিন। ঠিকই বলেছে জ্যাভার, লোকটা দেখতে হুবহু তারই মত। শুধু বয়স কিছু বেশি। পাশে আরেক বেঞ্চে বসা

কোচেপালি এবং সেনেলদিউ, যে দু'জন সনাক্ত করেছে জাঁ ভালজাঁকে। রায় প্রদানের সময় যতই কাছিয়ে আসছে, ততই উত্তেজিত, ফ্যাকাসে হয়ে উঠতে লাগলেন ম্যাডেলিন। কোর্টরুমে তিল ধরার ঠাই নেই, এত মানুষ। রূমের সর্বত্র নেচে বেড়াচ্ছে তার অস্থির দৃষ্টি।

এক সময় টেবিলে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলেন বিচারক, দর্শকদের গুঞ্জন থেমে গেল। পিনপতন নিস্তব্ধতার মধ্যে জানালেন তিনি, এখনই বিচারের রায় ঘোষণা করা হবে। ধীরে ধীরে আসন ছাড়লেন মেয়র ম্যাডেলিন। 'মাননীয় আদালত,' তাঁর গম্ভীর সম্বোধনে গম গম করে উঠল আদালত কক্ষ, সবিস্ময়ে ঘুরে তাকাল সবাই।

'আপনারা যাকে জাঁ ভালজাঁ ধরে নিয়েছেন, সে জাঁ ভালজাঁ নয়,' বললেন মেয়র।

চমকে উঠল উপস্থিত প্রত্যেকে। বিচারকও। কি বলছেন আপনি?

'ঠিকই বলছি,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ম্যাডেলিন। বেঞ্চে বসা আসামীর দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'ওই লোকটি নয়, আমি সেই জাঁ ভালজাঁ!'

আরেকবার আঁতকে ওঠার পালা সবার। একই সাথে, একই কথা ভাবল তারা, মঁসিয়ে মেয়রের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

'একি বলছেন আপনি, মঁসিয়ে!' চাপা গলায় বিরক্তি প্রকাশ করলেন বিচারক।

'মিথ্যে বলিনি। একটু অপেক্ষা করুন, এখনই প্রমাণ করে দিচ্ছি যে আমিই সত্যিকারের জাঁ ভালজাঁ।'

এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল ইন্সপেক্টর জ্যাভার, তার চেহারায় যে বিস্ময় ফুটে উঠেছে মঁসিয়ে মেয়রের কাণ্ড দেখে, তা এক কথায় অবর্ণনীয়। মেয়র যে এসেছেন, ভিড়ের মধ্যে লক্ষই করেনি সে এতক্ষণ। তার গলা শুনে এদিকে তাকাতে গিয়ে এমনভাবে জমে গেছে সে, দেখে মনে হয় পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে বুঝি।

কোনদিকে খেয়াল নেই মেয়রের। যে দু'জন সনাক্ত করেছিল জাঁ ভালজাঁকে, তাদের একজনের দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়লেন, 'সেনেলদিউ! আমি ছিলাম তোমার ঘনিষ্ঠ বনুধ। তুমি কি করে
আরেকজনকে আমি বলে রায় দিলে?'

হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকল সেনেলদিউ লোকটা।

'তোমার ডাক নাম জে-নি-দিউ, ঠিক না?' বলে উঠলেন মেয়র।

তোমার বা বাহুতে টি.এফ.পি অক্ষর তিনটা টাটুট করা আছে না? সেই হাতে, যে হাত মারাত্মকভাবে পুড়ে গিয়েছিল একবার?

মন্ত্রমুগ্ধের মত মাথা দোলাল লোকটা। 'হ্যাঁ আছে।'

'দেখাও আদালতকে।'

দেখাল হতবাক সেনালদিউ। জুরি বেঞ্চে জোর গুঞ্জন উঠল।

'কোচেপালি! তোমার বাঁ বাহুতেও নীল কালিতে একটা তারিখ লেখা আছে। ১ মার্চ ১৮১৫। দেখাও আস্তিন তুলে।'

তাই করল ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া দ্বিতীয়জন। প্রমাণ হয়ে গেল মেয়রের দেয়া তথ্য নির্ভুল। বিচারক এবং দর্শকের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল জাঁ ভালজাঁ, 'এখন নিশ্চই নিঃসন্দেহ হয়েছেন আপনারা যে আমিই জাঁ ভালজাঁ? যদি না হতাম, এসব আমার জানা থাকার কথা ছিল না, বিজ্ঞ আদালত। আমি চাই না আমার জন্যে নির্দোষ কেউ সাজা পাক, তাই ধরা দিতে এসেছি আমি। আমি যে চল্লিশ সাউ ডাকাতি করেছি বলে দাবি করা হয়েছে, সেই মুদ্রাটি আজও আমার ঘরে আছে। ফায়ারপ্লেসের ছাইয়ের মধ্যে। কি ভাবে ওটা হাতে এসেছিল আমার, সে কথা আজ আর নাই বা বললাম।'

দম বন্ধ হয়ে গেছে যেন উপস্থিত প্রত্যেকের। পলক পড়ছে না কারও। এ যে অবিশ্বাস্য! সবার প্রিয় ফাদার ম্যাডেলিন, মঁসিয়ে মেয়র এক গরীব কিশোরের সামান্য চল্লিশ সাউ কেড়ে নিয়েছে। এতবড় এক জঘন্য মানুষ সে, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে তাদের!

'আদালতের কাজে আর বিঘ্ন ঘটাতে চাই না। এখন চলে যাচ্ছি আমি। হাতে জরুরী কিছু কাজ

আছে, ওগুলো শেষ করতে হবে। মঁসিয়ে প্রসিকিউটিং অ্যাটর্নি যখন চাইবেন গ্রেফতার করতে পারবেন আমাকে। দর্শকদের দিকে ফিরল জাঁ ভালজাঁ। আজ আপনারা যারা উপস্থিত আছেন এখানে, হয়তো আমাকে করুণার পাত্র ভাবছেন। কিন্তু যে কারণে আমি এখানে এসেছি, সে হচ্ছে আমার বিবেক। বিবেকের দৃষ্টিতে আমি করুণার নয়, বরং শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে দেখছি নিজেকে।'

সবার সম্মোহিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে ধীরপায়ে কোর্ট থেকে বেরিয়ে এল জাঁ ভালজাঁ। চেহারায় তার তৃপ্তির, আনন্দের দীপ্তি।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই মঁসিয়ে মেয়রকে পাশে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল ফাঁতিন। গতদিন দেখেনি সে মঁসিয়েকে, কাজেই ধরেই নিয়েছিল তিনি মন্তফারমেল গেছেন কোজেতকে আনতে। দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে উঠল তার, ঘন ঘন দরজার দিকে তাকাচ্ছে। আমার মেয়েকে নিয়ে এসেছেন, মঁসিয়ে? কোথায় সে? কই আমার কোজেত?

'শান্ত হও, ফাঁতিন, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল ভালজাঁ। শান্ত হও। ওকে নিয়ে এসেছি আমি।'

'কোথায় সে নিয়ে আসুন না আমার কাছে।'

'এখনই না। তোমার শরীর বেশি ভাল না। ডাক্তার বলেছেন এ অবস্থায় তাকে তোমার সামনে নিয়ে এলে তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়বে। ক্ষতি হবে তোমার।'

'কিন্তু আমি তো সুস্থ!' চেঁচিয়ে উঠল ফাঁতিন। 'পুরোপুরি সুস্থ। নিয়ে আসুন ওকে, মঁসিয়ে। প্লীজ!' বলতে বলতে আচমকা থেমে গেল সে, আতঙ্কিত চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল। হঠাৎ করেই কাঁপতে শুরু করল থর থর করে।

ফাঁতিন! উদ্বিগ্ন হয়ে ঝুঁকে এল জাঁ ভালজাঁ। কি হয়েছে? 'আমাকে বাঁচান, মঁসিয়ে! আমাকে বাঁচান!' কম্পিত হাতে দরজা দেখাল সে।

ঘুরে তাকাল ভালজাঁ। দোরগোড়ায় মারমুখী চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাভার। চোখাচোখি হতে ভয়ঙ্কর হাসি ফুটল তার মুখে। বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, 'জলদি এসো!' এমনভাবে উচ্চারণ করল সে শব্দ দুটো, শুনে ওটা মানুষের গলা বলে বিশ্বাস করা কঠিন। ঠিক যেন কোন মত্ত জন্তু রাগে গর্জে উঠল।

'ও তোমাকে ধরতে আসেনি, ফাঁতিন,' মৃদু কণ্ঠে বলল ভাল।

'তাহলে? কাকে...?'

'অ্যাই!' ষাঁড়ের মত চেঁচাল জ্যাভার। 'এখনও এলে না?' বলেই লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে, খপ্ করে চেপে ধরল জাঁ ভালজাঁর কলার। এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে ফাঁতিনের মনে হলো চোখের সামনে আছড়ে পড়ে খা খা হয়ে গেল বুঝি পৃথিবীটা, সেই সাথে তার সমস্ত আশা ভরসাও।
কঁকিয়ে উঠল সে, মঁসিয়ে মেয়র।

ভয়ঙ্কর হাসিতে ফেটে পড়ল জ্যাভার। 'কোন মঁসিয়ে মেয়র-ফেয়র নেই এখানে, বুঝলে?' কলার ধরে ভালজাঁকে টেনে দাঁড় করাল সে।

'জ্যাভার! তোমার সাথে...'

'মঁসিয়ে ইন্সপেক্টর বলে সম্বোধন করো আমাকে,' খেকিয়ে উঠল সে বাধা দিয়ে।

'মঁসিয়ে, গলা একেবারে খাদে নামিয়ে বলল জাঁ ভালজাঁ। আড়ালে কিছু কথা বলতে চাই আপনার সাথে।'

'যা বলার এখানেই বলো, এবং জোরে বলো।'

'কিন্তু বিষয়টা আর কাউকে জানতে দিতে চাই না আমি।'

'তাই? তাহলে আমিও শুনতে চাই না।'

অসহায় বোধ করল জাঁ ভালজাঁ। নিরুপায় সে, তবু বলতেই হবে। ফাঁতিনের কানে না যায়, এমন নিচু কণ্ঠে বলল, আমাকে তিনটে দিন সময় দিন, মঁসিয়ে। এর মেয়েটিকে মন্তফারমেল থেকে আনতে যাব। যাব আর আসব। মাত্র তিন দিন সময় দিন। না হয় নিজেও চলুন আপনি আমার সাথে।

কড়া চোখে তাকাল জ্যাভার। 'ফাজলামো হচ্ছে?' চেঁচিয়ে উঠল। 'ওর মেয়েকে আনতে

মন্তফারমেল যাবে, না?’

‘আমার মেয়ে! কেঁদে উঠল ফাঁতিন। মঁসিয়ে মেয়র, ওকে আপনি...তখন তাহলে মিথ্যে বলেছেন আপনি? ও...কোজেত আসেনি?

‘অ্যাই ছুঁড়ি, চুপ কর! বলেছি না এখানে কোন মেয়র-ফেয়র নেই? এর নাম জাঁ ভালজাঁ। চোর একটা, ডাকাত। একে গ্রেফতার করতে এসেছি আমি,’ বলে তার কলার ধরে জোর এক ঝাকি দিল জ্যাভার।

অস্থির হয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসতে গেল ফাঁতিন। ব্যথিত দৃষ্টিতে ভালজাঁকে দেখল, তারপর জ্যাভারকে। চেঁচামেচি শুনে ডাক্তার নার্সরা ছুটে এসেছিল, তাদেরকেও দেখল সে একবার। হঠাৎ কাঁপুনি বেড়ে গেল তার, দাঁত লেগে গেল, ডাক্তার-নার্স ছুটে কাছে পৌঁছার আগেই বিছানায় আছড়ে পড়ল ফাঁতিন, স্থির হয়ে গেল মুহূর্তে।

মারা গেছে।

হাত তুলে কলার ধরা জ্যাভারের হাতটা ধরল জাঁ ভালজাঁ, প্রচণ্ড চাপ দিল সে হাতে, ব্যথা পেয়ে কলার ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো সে। কঠিন দৃষ্টিতে তাকে দেখল ভালজাঁ। ‘মেয়েটাকে মেরে ফেললে তুমি!’

মরেছে ভাল হয়েছে। গলা চড়িয়ে বলল ইন্সপেক্টর। জাহান্নামে গেছে। এখন তুমিও চলো। এই মুহূর্তে!

রুমের এক কোণে পুরনো এক স্টীল কটু পড়ে ছিল। সেদিকে এগিয়ে গেল ভালজাঁ, ঝুঁকে পড়ে সেটার মাথার দিকের ওপরের আড়াটা একটানে ভেঙে ফেলল মড়াৎ করে। ওটা নিয়ে জ্যাভারের দিকে এগোল সে। তার দৈহিক শক্তি সম্পর্কে ভালই জানে ইন্সপেক্টর, ভয়ে কুঁকড়ে গেল সে। চট করে পিছিয়ে গেল দু’পা।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো ওখানে, গম্ভীর কণ্ঠে বলল জাঁ ভালজাঁ। ‘আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিরক্ত করবে না।’

তাই করল জ্যাভার। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল ভালমানুষের মত। দেখে মনেই হয় না এতক্ষণ তর্জন-গর্জন করছিল এই লোক।

এগিয়ে এসে মৃত ফাঁতিনকে যত্নের সাথে ঠিক করে শোয়াল ভালজাঁ। পরম স্নেহে বুজে দিল তার বিস্ফারিত চোখের পাতা। কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে মেয়েটির শুকনো, রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে জ্যাভারের সামনে এসে দাঁড়াল। চলো এবার। যাওয়া যাক।

শহরের জেলখানায় নিয়ে পুরে দিল তাকে জ্যাভার। কিন্তু জাঁ ভালজাঁকে ধরে রাখার ক্ষমতা ছিল না সে কারাগারের, ওইদিনই পালাল সে রাতের বেলা। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবরটা জানাজানি হয়ে গেল। রাতে খাবার দিতে গেল যে গার্ড, সে আবিষ্কার করল ভালজাঁর রুম খালি। পিছনের দেয়ালে, উঁচুতে বাতাস চলাচলের যে ফোকর আছে, তার মোটা শিক ভেঙে হাওয়া হয়ে গেছে সে।

হন্যে কুকুর হয়ে উঠল জ্যাভার। পুরো শহর তোলপাড় করে ফেলল, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না তাকে।

পরদিন দু’তিনজন ঘোড়াগাড়ি চালকের মুখে শোনা গেল, গভীর রাতে নিঃসঙ্গ এক পথিককে খুব জোর পায়ে প্যারিসের দিকে যেতে দেখেছে তারা। হাতে বোচকা ধরনের কিছু একটা ছিল লোকটার।

চারদিন পর প্যারিসে ধরা পড়ল জাঁ ভালজাঁ। খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল, এই সময়ের মধ্যে ব্যাংকে জমা তার যাবতীয় সঞ্চয়, প্রায় ছয় লাখ ফ্রাঁ তুলে ফেলেছে সে। এই বিপুল পরিমাণ টাকা কোথায় রেখেছে সে তা অবশ্য জানা যায়নি। পরে নতুন করে বিচার হলো জাঁ ভালজাঁর। তাতে তাকে আট বছর আগে এক কিশোরের চল্লিশ সাউ অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ছিনিয়ে নেয়ার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। উচ্চতর কোর্টে তাকে আপীল করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করে জাঁ

ভালজাঁ।

পরে রাজা মৃত্যুদণ্ড রদ করে যাবজ্জীবন আটকাদেশ দেন তাকে। আবার তুঁলোয় নিয়ে আসা হলো ভালজাঁকে, তুলে দেয়া হলো জাহাজে। তার ক্রমিক নম্বর ৯৪৩০ হলো এবার।

একই বছর, ১৮২৩ সালের অক্টোবরের শেষদিকের কথা। 'অরিয়ন' নামের এক যুদ্ধজাহাজ মেরামতের জন্যে তুলোঁ বন্দরে ভিড়ল এসে একদিন। যুদ্ধজাহাজ দেখার আগ্রহ সাধারণ মানুষের থাকেই, প্রতিদিন ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত ভিড় করে 'অরিয়ন'কে দেখে তারা।

একদিন সকালে মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করল ঘাটে উপস্থিত সবাই, কয়েকশো মানুষ। আচমকা কারও আর্ত চিৎকার শুনে চমকে উঠল তারা। দেখা গেল অরিয়নের মাস্তুলের একেবারে আগায়, অনেক উঁচুতে, মাথা নিচে পা ওপরে দিয়ে সবেগে নিচে নেমে আসছে এক নাবিক। পড়ে যাচ্ছে লোকটা। হায় হায় করে উঠল সবাই। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত পড়ল না সে, পড়তে পড়তে হাত বাড়িয়ে পাল খাটানোর মোটা একটা দড়ি ধরে ফেলেছে। পতনের হাত থেকে বেঁচেছে ঠিকই, কিন্তু দেহটা দুলছে তার বিপজ্জনক ভাবে। অনেক নিচে সাগর, দেখলে মাথা ঘুরে যায়, পড়লে আর রক্ষা নেই।

নেমে যে আসবে, সে সাহস নেই নাবিকের। জেলে ছিল লোকটা, সবে জাহাজে চাকরি নিয়েছে, ট্রেনিং তখনও পোক্ত হয়নি। আবার ঝুলে থাকবে, তাও শক্তিতে কুলোচ্ছে না। স্রেফ প্রাণের মায়া এখনও ঝুলিয়ে রেখেছে তাকে। দু'হাতের পেশী থর থর করে কাঁপছে তার। মুঠো ছুটে যাবে যে কোন মুহূর্তে।

এই সময় আরেকজনকে দেখা গেল বাঁদরের মত তর তর করে উঠে যাচ্ছে রশি বেয়ে। নাবিক যেটা ধরে ঝুলছে, তার পাশে আরও দড়ি আছে, যার এক মাথা মাস্তুলে, আরেক মাথা নিচে বাঁধা রয়েছে, তারই একটা বেয়ে উঠে যাচ্ছে লোকটা। তার পরনে লাল কয়েদীর পোশাক। মাথায় সবুজ টুপি। হাওয়ায় টুপি উড়ে যেতে লোকটার ধপধপে সাদা চুল বেরিয়ে পড়তে অবাক হলো সবাই। বেশ বয়স্ক মানুষ।

পরে জানা গেল, লোকটি যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী, অরিয়নের দাঁড় টানায় নিযুক্ত ছিল। অসহায় নাবিকটির অবস্থা দেখে জাহাজের গার্ড অফিসারকে সে অনুরোধ করেছিল তাকে যেতে দিতে, যাতে সে নাবিকটিকে রক্ষা করতে পারে গিয়ে। উপায় না দেখে অনুমতি দেয় তাকে অফিসার, পায়ের বেড়ি ভেঙে ছুটে যায় সে।

দেখতে দেখতে ঝুলন্ত নাবিকটির কাছে পৌঁছে গেল দুঃসাহসী কয়েদীটি। একেবারে শেষ মুহূর্তে; নাবিকটির মুঠো যখন প্রায় খুলে যায় যায় অবস্থা, জায়গামত পৌঁছে গেল সে, এক হাতে ধরে ফেলল তাকে।

শেষ পর্যন্ত নাবিকটি বেঁচে গেল বটে, কিন্তু যে তাকে উদ্ধার করল, সেই বয়স্ক কয়েদীটির মৃত্যু হলো। হয়তো বেশি পরিশ্রমের জন্যেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল সে, হাজার হোক বুড়ো মানুষ, যে কারণে নেমে আসার সময় দড়ি থেকে হাত ছুটে গেল তার। সোজা সাগরে পড়ে তলিয়ে গেল সে। হায় হায় করে উঠল শত শত দর্শক। পরে বহু খোঁজাখুজি করা হলো, কিন্তু পাওয়া গেল না তার মৃতদেহ। স্রোতের টানে ভেসে গেছে কোনদিকে কে জানে!

পরদিন 'তুলোঁ জার্নালে' ছাপা হলো সে খবর। বলা হলো: গতকাল ১৭ নভেম্বর বন্দরে এক দুঃখজনক দূর্ঘটনায় যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত এক কয়েদী মারা গেছে। এক ডাকাতি মামলায় সাজা হয়েছিল তার। লোকটির নাম জাঁ ভালজাঁ। ক্রমিক নম্বর ৯৪৩০।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা গেছে...।

সাত

মন্তফারমেল এখন আগের থেকে বড় হয়েছে। সুন্দর হয়েছে। লোকসংখ্যাও বেড়ে গেছে বেশ। কিন্তু সেই অনুপাতে পানি সমস্যার তেমন একটা সুরাহা হয়নি। খাবার পানির জন্যে শহরবাসীকে বেশ সমস্যা পোহাতে হয়, অনেক দূর থেকে আনতে হয় পানি। এক বৃদ্ধ আছে, দুরের পাহাড়ী ঝর্ণা থেকে পানি এনে বাড়ি বাড়ি বিক্রি করে সে।

তবে শীতকালে বিকেল পাঁচটা আর গরমকালে সাতটা, এরপর আর পাওয়া যায় না তাকে। তারপরও যদি কারও পানি প্রয়োজন হয় রাতে, নিজেদেরই গিয়ে নিয়ে আসতে হয়। এদিক থেকে মন্তফারমেলে থেনারদিয়ের পরিবার বড় ভাগ্যবান। যত রাতেই প্রয়োজন পড়ুক, তাদের কাউকে যেতে হয় না পানি টানতে, যায় কোজেতে। পাহাড়ী বন-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একা, ছোট্ট মেয়েটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে পানি নিয়ে আসে বালতি ভরে, যেটার আকার প্রায় তার নিজের সমান। না গিয়ে উপায় নেই, পিঠের চামড়া তুলে ফেলবে থেনারদিয়েরপত্নী। আট বছর চলছে তখন কোজেতের।

শীত খুব একটা পড়েনি সেবার, বরফও না। কাজেই বড়দিন উপলক্ষ করে আনন্দের, উৎসবের জোয়ার বয়ে যেতে লাগল মন্তফারমেলে। আশপাশের গ্রাম থেকে প্রচুর দোকানি এসে পসরা সাজিয়ে বসেছে পথের পাশে, বড়দিনের মেলা বসেছে। গিজগিজ করে মানুষ।

সারাবছর না চললেও এই সময় ভালই চলে থেনারদিয়েরের হোটেল। প্রচুর খদ্দের আসে। এবার আবহাওয়া ভাল, তাই অন্যান্যবারের তুলনায় কাজের চাপ অনেক বেশি পড়ল। মালিকের স্ত্রী দিন-রাত রান্না নিয়ে ব্যস্ত, মালিক ব্যস্ত খদ্দের সামাল দিতে। কষ্ট হলেও দু'জনেই খুশি তারা, পয়সার আমদানী বেড়ে গেছে, খুশি হওয়ারই কথা। তাদের দুই মেয়ে, এপোনাইন আর আজেলমা, তারাও খুশি। এবারের বড়দিনের আনন্দের সঙ্গী আরেকজন বেড়েছে ওদের। এক ভাই হয়েছে তাদের এরমধ্যে, তার নাম রাখা হয়েছে গাভরোচ।

ওদিকে রান্নাঘরের টেবিলের নিচে বসে উলের মোজা বুনছে কোজেত গাভরোচের জন্যে। বেড়ালটা পাশেই শোয়া। কুকুরটা নেই, মরে গেছে। কোজেতের বাঁ চোখ প্রায় বুজে আছে। ফুলে আছে চোখটা, কালসিটে পড়েছে। হুকুম পালনে দেরি হওয়ায় আজ সকালে ঘুসি মেরে চোখের এই হাল করেছে মালিকপত্নী।

শঙ্কিত আছে কোজেত এ মুহূর্তে। পানিওয়ালা বুড়ো যে পানি দিয়ে গেছে তাতে রাত চলে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সন্ধের সময় হঠাৎ করে নতুন চারজন খদ্দের এসে হাজির, তাদের ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়াতে গিয়ে প্রায় খালি হয়ে গেছে চৌবাচ্চা। এখন যদি আর কারও পানি প্রয়োজন পড়ে, তবেই হয়েছে।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়। ডাক পড়ল কোজেতের। পানি ফুরিয়ে গেছে, এখনই ঝর্ণায় যেতে হবে। কি আর করা! উঠে পড়ল সে, টিনের বালতি ঝোলাতে বোলাতে চলল। অন্ধকার পাহাড়ী জংলা পথে ভয় তাড়াবার জন্যে হাতলের ঠং ঠং আওয়াজ তুলে ছুটতে লাগল কোজেত। গা ছমছম করছে।

পানি নিয়ে ফেরার পথে ঘটল অদ্ভুত এক ঘটনা। ভার সামলে টলতে টলতে এগোচ্ছে কোজেত, বারবার থেমে জিরিয়ে নিতে হচ্ছে। কয়েক পা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে কোজেত, ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে হাঁপাতে হাঁপাতে, দম ফিরে এলে আবার এগোচ্ছে। গলায় কান্না আটকে আছে তার। শব্দ করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে খুব, কিন্তু সাহসের অভাবে তাও পারছে না। আবার কয়েক পা এগোল কোজেতে, থেমে পড়ল। ব্যথায় টন টন করছে দুহাত। হঠাৎ করে কেঁদে ফেলল সে, তবে নিঃশব্দে।

খানিক কেঁদে বুকের বোঝা হালকা করে আবার রওনা হলো, এই সময় আচমকা পেশীবহুল সবল একটা হাত বালতিটা তুলে নিল ওর হাত থেকে। অবাক হয়ে পাশে তাকাল কোজেত। লোকটাকে দেখেনি ও কোনদিন। পানি ভরা বালতি যেভাবে দোলাতে দোলাতে হাঁটছে সে, তাতে মনে হচ্ছে ওটা তার কাছে হালকা এক খেলনা। এমন অন্ধকার পাহাড়ী পথে ভূতের মত নিঃশব্দে হাজির হওয়া

অচেনা মানুষটিকে স্বাভাবিকভাবেই ভয় পাওয়ার কথা। কিন্তু আশ্চর্য! বিন্দুমাত্র ভয় পেল না কোজেত।
‘বোঝাটা তোমার পক্ষে খুব ভারী, তাই না?’ বলে উঠল লোকটা।
কৃতজ্ঞ চোখে তাকে দেখল কোজেতে। ‘হ্যাঁ, মঁসিয়ে।’
আগের কথা।
গভীর রাত। মরা সাপের মত নির্জীব হয়ে পড়েছে তুলোঁ বন্দর। বিন্দুমাত্র শব্দ না করে সাঁতরে তীরে পৌঁছল জাঁ ভালজাঁ। তার খোঁজে যখন তোলপাড় চলছে বন্দরে, অরিয়নের পাশেই নোঙর ফেলে থাকা ‘আলজেসিরাস’ নামের এক ফ্রিগেটের তলায় ঘাপটি মেরে ছিল সে।
সে রাতেই প্যারিসের উদ্দেশে রওনা হলো ভালজাঁ দুর্গম হাঁটা পথে। প্যারিসে জরুরী কিছু কাজ সেরে এল মন্তফারমেল। আগেও একবার এখানে ঘুরে গেছে সে, খুব গোপনে। যে রাতে জেলখানার গরাদ ভেঙে পালিয়েছিল, তার তিন দিন পর। ঘটনার পরদিন প্যারিস পৌঁছে ব্যাংকের সমস্ত টাকা তুলে নিয়েছিল জাঁ ভালজাঁ। তারপর মন্তফারমেলের গভীর পাহাড়ী জঙ্গলে এসেছিল ওগুলো পুঁতে রাখার জন্যে। যদিও কাজটা সম্পূর্ণ গোপনে সারতে পারেনি ভালজাঁ।
স্থানীয় এক লোক দেখে ফেলে তাকে। ছোট একটা ট্রাঙ্ক নিয়ে গভীর রাতে অপরিচিত একজনকে জঙ্গলে ঢুকতে দেখেছিল সে। এর পরদিন ওই এলাকা থেকে ধরা পড়ে জাঁ ভালজাঁ। এবং পত্রিকায় যখন খবর বের হলো যে সে তার ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা তুলে সরিয়ে ফেলেছে, কোথাও টাকাগুলো লুকিয়ে রেখেছে, পুলিশ খুঁজে পায়নি সে টাকা, লোকটি বুঝে ফেলল সে রাতের সেই অপরিচিত ট্রাঙ্ক বহনকারী মানুষটি আর কেউ নয়, স্বয়ং জাঁ ভালজাঁ। সমস্ত টাকা-পয়সা এখানকার জঙ্গলেই লুকিয়ে রেখে গেছে সে।
খুশি আর ধরে না তখন লোকটির। এরপর অনেক রাত, ঠিক যেখানে দেখেছে সে ভালজাঁকে, তার আশপাশের অনেকটা জায়গাজুড়ে জঙ্গল তোলপাড় করে ফেলল সে ট্রাঙ্কটার খোঁজে। মাটি খোড়ার পর জাঁ ভালজাঁর ফেলে যাওয়া কাদামাখা শাবল আর কোদালটা শেষ পর্যন্ত পেয়েছিল সে পায়নি কেবল যার খোঁজে এত ঘুম কামাই, সেই ট্রাঙ্কের হদিস।
মাতাল অবস্থায় একদিন থেনারদিয়েরের সামনে গোপন খবরটা, দুঃখের কথা বলে ফেলেছিল সে। এরপর থেনারদিয়েরও বহু চেষ্টা করেছে ওটা খুঁজে বের করার। রাতের পর রাত জেগে জঙ্গলের সন্দেহজনক সমস্ত জায়গা খুঁড়ে খুঁড়ে একাকার করে ফেলে সে। ফলাফল সেই একই। প্রথমজনের একান্ত ধারণা, টাকাটা তাহলে এখানে রাখেনি জাঁ ভালজাঁ। হয়তো রাখবে বলেই এসেছিল, কিন্তু পরে মত বদলে আর কোথাও নিয়ে রেখেছে।
এদিকে থেনারদিয়ের মনে মনে ভাবল, শালা, মাতাল চোখে কি দেখতে কি দেখেছে, মাঝখান থেকে আমি অনর্থক হয়রান হলাম।

তোমার নাম কি? জিজ্ঞেস করল জাঁ ভালজাঁ। এক হাতে পানির বালতি, আরেক হাতে মেয়েটিকে ধরে দ্রুত হাঁটছে সে।
‘কোজেত।’
থমকে দাঁড়াল ভালজাঁ আচমকা। যেন বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়েছে। কি বললে?’
‘কোজেত, মঁসিয়ে।’
‘এত রাতে এই জঙ্গলে একা কেন এলে তুমি? কে পাঠিয়েছে?’
‘আমার গিন্নিমা। মাদাম থেনারদিয়ের।’
তোমাকে কেন পাঠাল? ওদের কাজের লোক নেই?
‘আমিই তো ওঁদের কাজের মেয়ে।’
সারাপথ অনেক প্রশ্ন করল ওকে ভালজাঁ। রাতটা কাটাল থেনারদিয়ের দম্পতির হোটেলে। ছোট্ট মেয়েটির প্রতি ওদের সবার আচরণ দেখে বেদনায় বুকের ভেতর মুচড়ে উঠল ভালজাঁর। পরদিন সকালেই কর্ত্রীর কাছে কাজের কথা পাড়ল সে। কোজেতকে যদি আমি নিয়ে যেতে চাই, আপনি

আপত্তি করবেন?

'আপত্তি!' অবাক হলো যেন থেনারদিয়ের পত্নী। 'বলেন কি, মঁসিয়ে নিয়ে যান, নিয়ে যান। এক্ষুণি নিয়ে যান। বেঁচে যাই আমি।' কথার ফাঁকে চট করে অন্য ভাবনা খেলে গেল তার মাথায়। 'তবে...।'

'তবে কি?'

'ও আমাদের মেয়ে নয়, সে তত কালই বলেছি আপনাকে। নিয়মিত খোরপোষ দেবে বলে ওর মা মেয়েটিকে রেখে গিয়েছিল আমাদের জিমায়।'

তারপর?

তারপর আর কি! এক পয়সাও দেয়নি। ওর পিছনে অনেক খরচ হয়েছে আমাদের। বুঝতেই পারছেন, আমরা গরীব মানুষ।

'কত খরচ হয়েছে, আমি দিচ্ছি।'

স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করে দেড় হাজার ফ্রাঁ দাবি করল। বিনা বাক্য ব্যয়ে টাকাটা দিয়ে দিল জাঁ ভালজাঁ, এবং সেদিনই কোজেতকে নিয়ে প্যারিস রওনা হলো। শহরের উপকণ্ঠে নিজের থাকার জায়গা আগেই ঠিক করে রেখে গেছে ভালজাঁ। বিরান এলাকা। মানুষজন তেমন একটা থাকে না। শহরবাসী ভুলেও আসে না এদিকে। বড় বড় গাছপালার আড়ালে প্রকাণ্ড এক বিল্ডিং, দেখতে পোড়োবাড়ির মত। এক বৃদ্ধা থাকে কেবল এ বাড়িতে। সে-ই বাড়ির মালিক। এক নম্বর বাচাল।

বাড়িটার দোতলার একটা অংশ ভাড়া নিয়েছে জাঁ ভালজাঁ। এখানে নিরাপদে থাকতে পারবে সে। কারও অনুসন্ধিৎসু নজর অনুসরণ করবে না তাকে, সারাক্ষণ সেঁটে থাকবে না। 'গোর্বিও হাউস' বাড়িটার নাম।

প্রথম যেদিন ওদের সকাল হলো এ বাড়িতে, এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হলো জাঁ ভালজাঁর। কোজেতের ঘুম ভাঙার অপেক্ষায় বসে ছিল সে। অপলক তাকিয়ে দেখছিল শিশুটিকে। ঠিক যেন ফাঁতিনের খুদে সংস্করণ। এই সময় কাছের বুলেভার্ড দিয়ে ছুটে গেল এক মালবাহী গাড়ি, কেঁপে উঠল প্রাচীন বাড়িটা। চমকে জেগে গেল কোজেত! চোখ তখনও পুরো মেলতে পারেনি, টলোমলো পায়ে বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল সে। আধবোজা চোখে পা বাড়াল, চেঁচিয়ে বলতে লাগল, জি, মাদাম! এই যে, আমি এখানে, মাদাম! এখুনি আসছি, মাদাম! ওহ্, ঝাড়ুটা কোথায় গেল! কোথায় রাখলাম। আমার ঘর কোথায়...!

বিস্মিত জাঁ ভালজাঁর ওপর চোখ পড়তে থমকে গেল কোজেত। চেহারার আতঙ্ক মুছে গেল একটু একটু করে। 'ও, বুঝেছি। গুড মর্নিং, মঁসিয়ে।'

'গুড মর্নিং!' হাসি ফুটল ভালজাঁর মুখে।

'মঁসিয়ে, ঘরটা ঝাট দিয়ে দিই?'

না। তুমি শুধুই খেলবে।

গাদা গাদা খেলনা-পুতুল, দামী দামী অজস্র পোশাক-জুতো কিনে দিয়েছে ভালজাঁ কোজেতকে। সারাদিন খেলে ফুলের মত মেয়েটি, একা একা কথা বলে, হাসে খিল খিল করে, গান গায়। অবাক বিস্ময়ে তাকে দেখে জাঁ ভালজাঁ। দেখে দেখে চোখের তৃষ্ণা মেটে না। ভালবেসে ফেলল সে কোজেতকে। তার সে ভালবাসার ভাষাহীন অনুভূতি বর্ণনা করা অসম্ভব।

যখন বোনের সংসারে ছিল, ভাগ্নে-ভাগ্নিদের ভালবাসার কোন সুযোগই পায়নি। তারপর দীর্ঘ সময় পৃথিবীতে একদম একা ছিল জা ভালজাঁ। না হতে পেরেছে সন্তানের পিতা, না প্রেমিক, স্বামী বা কারও বন্ধু, কিছুই হতে পারেনি। বোন আর তার ছেলে-মেয়েদের স্মৃতি একেবারেই মুছে গেছে ভালজাঁর মন থেকে। তাদের খোঁজ বের করার বহু চেষ্টা করেছে সে উনিশ বছর দণ্ড খেটে বের হওয়ার পর। পায়নি। কোথায় আছে তারা, আছে না মরে গেছে, তাও জানে না ভালজাঁ।

যেদিন কোজেতকে প্রথম দেখল সে কী যেন একটা ঘটে গেল বুকের ভেতর অজ্ঞাত কোথাও। দীর্ঘ পঞ্চান্ন বছর পর জীবনে প্রথম স্নেহের-ভালবাসার স্বর্গীয় স্বরূপ টের পেল জাঁ ভালজাঁ। কী অপরিসীম তার ক্ষমতা, ঠিক যেন ভরানদীর জোয়ার। দুকূল ছাপিয়ে-ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় কোন

অজানা করে। অবচেতন মনে এমনই যেন কিছু একটার সন্ধানে ছিল জাঁ ভালজাঁ। পেয়ে গেল, সেই সাথে কূল ছাপানো জোয়ারে ভেসে বেড়াতে লাগল সে।

তেমনি কোজেত। জ্ঞান হওয়ার আগে থেকেই প্রতিপালক কর্তা গিন্নি আর তাদের মেয়েদের প্রচণ্ড দুর্ব্যবহার, আর কথায় কথায় মার খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে যাওয়া ফুলের পাপড়ির মত কুঁকড়ে গিয়েছিল তার ভেতরটা। গাল-মার ইত্যাদিকে নিয়তি বলে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তারপরও, যখন দেখত নিজের মেয়েদের কোলে নিয়ে আদর করছে তারা, এটা-ওটা মুখে তুলে খাইয়ে দিচ্ছে, বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে বা খেলনা-পুতুল কিনে আনছে তাদের জন্যে, কোজেতের কচি বুক ফেটে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসত। সে-ও মনে মনে একটা বাবার কথা ভাবত। আজ সে অভাব পূরণ হয়েছে তার।

জাঁ ভালজাঁকে বাবা ডাকে কোজেত। দিনে কোথাও বের হয় না ভালজাঁ। সন্ধের আগে বের হয় ঘন্টা দুয়েকের জন্যে, হাঁটাহাঁটি করতে যায়। কোনদিন কোজেতকে নিয়ে, কোনদিন বা একা। তখন তার পরনে থাকে সেই বহু পুরানো মলিন কোট, আর ঢোলা, কালো এক প্যান্ট। দেখে ভিখিরি মনে হয়। শুধু তাই নয়, সে যখন হাঁটতে বের হয়, ভিক্ষুক মনে করে অনেকে পয়সা দেয়ও তাকে। নীরবে হাত পেতে নেয় ভালজাঁ। তারপর যেই চোখের আড়ালে চলে যায় দানকারী, চট করে অন্য কোন ভিখিরিকে তা দিয়ে দেয়। যে জন্যে অন্য ভিক্ষুকরা তার নাম দিয়েছে ভিক্ষে দানকারী ভিক্ষুক।

মায়ের মত কোজেতকে সারাক্ষণ আগলে রাখে জাঁ ভালজাঁ, যদিও মা কি বসুত সে নিজেও তা জানে না। ওকে খাওয়ানো-পরানো নিজে তদারক করে। তাকে লেখাপড়া শেখাতেও শুরু করল একদিন ভালজাঁ। কখনও তাকে তার মায়ের গল্প শোনায়। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যায় কোজেত। মনে মনে মায়ের ছবি আঁকে কল্পনায়। এমনি ভাবে দিন কাটতে লাগল দুজনের।

জাঁ ভালজাঁর সারাদিন ঘরে বসে থাকাটা কেমন সন্দেহজনক মনে হলো বৃদ্ধা বাড়িওয়ালীর। এ বাড়িতে ওরা দু'জন আর সে ছাড়া কেউ নেই। সে-ই ভালজাঁর টুকটাক ফাইফরমাশ খাটে। অনেকদিন পর তার মনে হলো, লোকটা সারাদিন ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে থাকে কেন? করেটা কি? যেই ভাবা, অমনি কাজে লেগে পড়ল বুড়ি। ভালজাঁর রূমের দরজায় যে চাবির ফুটো আছে, হাতে যখন কাজ থাকে না, তখন ওই ফুটোয় চোখ রেখে তাকিয়ে থাকে সে।

কয়েকদিন পর এক আজব ঘটনা দেখল বুড়ি। ধ্যাদ্ধেরে ধূসর রঙের এক কোট আছে লোকটার, তার ল্যাপেলের ভেতরদিকের লাইনিং কচি দিয়ে কাটতে দেখল সে একদিন তাকে। ভেতর থেকে হালকা হলুদ রঙের,একটা কাগজ বের করতে দেখা গেল লোকটাকে, তারপর কাটা জায়গাটা সুঁই-সুতো দিয়ে সেলাই করে দিল সে যত্নের সাথে। কাঁপুনি উঠে গেল বুড়ির। ওখান থেকে যা বের করল লোকটা, তা কাগজ নয়, টাকা! এক হাজার ফ্রাঁর ব্যাংক নোট! এত টাকা লোকটা কোথায় পেল, ভাবতে গিয়ে কলজে হীম হয়ে এল বুড়ির।

পাশের লোকালয় সেইন্ট মেদার্দ। সেখানে বড় রাস্তার পাশে একটা মজা কুয়ো আছে। রোজ এক বুড়ো ভিখিরি বসে ওটার পাশে। জাঁ ভালজাঁ সন্ধেয় যখন হাঁটতে বের হয়; কিছু কিছু রোজই ভিক্ষে দেয় তাকে। কখনও কখনও দুচারটা বাক্য বিনিময়ও হয় দু'জনের।

একদিন হাঁটতে বেরিয়েছে ভালজাঁ। দূর থেকে লোকটাকে জায়গামত বসা দেখে এগিয়ে গেল,যথারীতি। কাছে গিয়ে দেখা গেল উপড় হয়ে ঝুঁকে আছে লোকটা। প্রার্থনা করছে ভেবে কথা বলল না জাঁ ভালজাঁ, কিছু খুচরো পয়সা তার ভাণ্ডে ফেলে চলে যাচ্ছিল। এই সময় আচমকা মুখ তুলল ভিখিরি, এক পলক দেখল জা ভালজাঁকে, পরক্ষণেই চট করে নামিয়ে নিল দৃষ্টি।

আঁতকে উঠল ভালজাঁ। স্ট্রীট ল্যাম্পের আবছা আলোয় যা দেখেছে মুহূর্তের জন্যে, তাতে পায়ের তলার মাটি সরে গেছে তার। ও মুখ পরিচিত ভিখিরিটির নয়, আরেকজনের মুখ। সেটিও জাঁ ভালজাঁর পরিচিত। ভয়ঙ্কর পরিচিত! আচমকা যেন বাঘের মুখে পড়েছে, এমন মনে হলো তার। পাথরের মূর্তির মত থ মেরে থাকল ভালজাঁ মুহূর্তখানেক, আসলে হাত-পা অবশ হয়ে গেছে তার, তাই ইচ্ছে থাকলেও নড়তে পারেনি। যে মুখ দেখেছে ভালজাঁ, সেটা গোয়েন্দা অফিসার জ্যাভারের।

কথা বলে উঠতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু সহজাত বিচারবুদ্ধি বাধা দিল। মুখ বুজে তার সামনে থেকে সরে গেল জাঁ ভালজাঁ। হাঁটতে হাঁটতে ভাবল, রোজ যে পোশাকে থাকে ভিখিরিটি, আজও তো সেই

পোশাকেই আছে সে। সেই ফ্যাকাসে রঙের নোংরা ব্যাগ, একটু ঝুঁকে থাকলেও বসার ভঙ্গীটি ছিল একই রকম। আমি কি ভুল দেখলাম? আফসোস হলো ভালজাঁর মুখটা আরও ভাল করে কেন দেখে নিল না ভেবে। কেন কথা বললাম না? দূর! জ্যাভার আসবে কোত্থেকে? আমি নিশ্চই ভুল দেখেছি।

পরদিন সাহস করে আবারও সেখানে গেল ভালজাঁ। ভিক্ষে দিল। খুশি হয়ে ধন্যবাদ জানাল লোকটা। এ সেই ভিখিরিই। আশ্বস্ত হলো জাঁ ভালজাঁ। ভাবল, নিশ্চয়ই চোখ খারাপ হয়ে গেছে আমার। ব্যাপারটা ভুলে গেল সে।

এর কয়েকদিন পর রাত আটটার দিকে গোর্বিও হাউসের সদর দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার আওয়াজে অবাক হলো জাঁ ভালজাঁ। কে এল এত রাতে? তেল খরচের ভয়ে বাড়িওয়ালী বুড়ি তো সন্ধের সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ে। গেটের চাবি একটা থাকে তার কাছে, আরেকটা ভালজাঁর কাছে। তাহলে আর কে হতে পারে? নাকি বুড়িই কোথাও... সিঁড়িতে ভারী পায়ের আওয়াজ উঠতে ভাবনায় ছেদ পড়ল তার। কেউ উঠে আসছে! কে? ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে দিল ভালজাঁ।

কোজেতকে ফিস ফিস করে চুপ থাকতে বলল। পা টিপে বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ভালজাঁ, ছোট চাবির ফুটো দিয়ে বাইরে তাকাল। মৃদু আলোর আভাস দেখল সে বন্ধ দরজার ওপাশে। মনে হলো আলো হাতে কেউ যেন ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে। খানিক পর আলোটা নিভে গেল। নানা আজেবাজে চিন্তায় রাতটা বড়ই উদ্বেগে কাটল জাঁ ভালজাঁর, এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের পাতা এক করতে পারল না। খুব সকালে আবার সেই পায়ের আওয়াজ শোনা গেল, কোথাও দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার শব্দে ছুটে এসে ফুটোয় চোখ রেখে দাড়াল ভালজাঁ। তার দরজার সামনে দিয়েই হেঁটে গেল এক লোক, কিনুত তার চেহারা দেখা গেল না। তবে তার হাঁটার ভঙ্গি খুবই সন্দেহজনক লাগল তার। মানুষটা ঢ্যাঙামত।

একটু পর বৃদ্ধা এল ঘরদোর পরিষ্কার করতে। বেশ খুশি খুশি মনে হলো সেদিন তাকে। আড়ে আড়ে তাকাচ্ছে ভালজাঁর দিকে।

'কাল রাতে এ বাড়িতে কেউ এসেছিল মনে হয়?' বলল ভালজাঁ।

'ও, আপনি টের পেয়েছেন, মঁসিয়ে?'

'লোকটা কে?'

নতুন এক ভাড়াটে, মঁসিয়ে।

কি নাম তার?

'ডুমন্ট, না ডাউমন্ট কি যেন, ঠিক মনে নেই।'

'কি করে সে?'

আপনারই মত কোম্পানির ইন্টারেস্টে চলে।

বুঝল ভালজাঁ, নিশ্চয়ই কোথাও কোন গণ্ডগোল ঘটে গেছে। সেদিন রাতে পা টিপে টিপে সে বাড়ি ত্যাগ করল জাঁ ভালজাঁ। তবে বেশিদূর যেতে পারল না, সদলবলে তার পিছু নিল জ্যাভার। লোকটা যে পিছু লেগেছে, টের পেতে দেরি হলো না জাঁ ভালজাঁর। মেয়েটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে প্রায় ছুটতে শুরু করল সে। অন্ধকার এক সরু গলি দেখে ঢুকে পড়ল। কোজেত কোন কথা বলছে না। বের হওয়ার সময় ওকে কথা বলতে বারণ করেছে বাবা, তাই মুখ বুজেই আছে মেয়েটি।

পিছনে কয়েক জোড়া পায়ের শব্দে ব্যস্ত, তটস্থ হয়ে উঠল জাঁ ভালজাঁ। মনে হলো যেন জ্যাভার তাকে দেখে ফেলেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এ গলি ও গলি ছুটে বেড়াল ভালজাঁ, ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কিনুত থামলে চলবে না, ধরা পড়া চলবে না। বন্দী জীবনে ফিরে যাবে না সে আর কিছুতেই। মানুষ, সমাজ এবং আইনের সাথে ভালই পরিচয় আছে ভালজাঁর। তারা গরীবকে কাজ দিতে পারে না, ক্ষুধার্তকে অন্ন দেয় না, কিনুত নিতান্ত পেটের দায়ে পড়ে যদি কেউ চুরি করতে বাধ্য হয়, তাকে নির্মম শাস্তি দিতে মুহূর্ত মাত্র দেরি করে না।

আইনের চোখে যে একবার 'অপরাধী' হয়ে যায়, সে যত ভাল কাজই করুক, দেখে না উচু তলার মানুষের তৈরি সমাজ। চোখ ফিরিয়ে রাখে। দীর্ঘ আটটি বছর মন্ট্রিল-সুর-মেয়ারের এবং তার অধিবাসীদের উন্নতির জন্যে যা করেছে ভালজাঁ, তার পুরস্কার হিসেবে আইন তাকে দিয়েছে

মৃত্যুদণ্ড। রাজার বড় দয়ার শরীর, তাই সে দণ্ড মওকুফ করে যাবজ্জীবন দিয়েছেন তাকে। এরপর আবার যদি ধরা পড়ে জাঁ ভালজাঁ, এই সহায় সম্বলহীন শিশুটি একদিন হয়তো তার মায়ের মতই দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হবে। কিন্তু যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, ভালজাঁ তা হতে দেবে না। কোনদিন না।

আবার পায়ের শব্দ শোনা গেল পিছনে। চমকে উঠল সে, এসে পড়েছে নাকি জ্যাভার? দেখে ফেলেছে ওদের? দ্রুত পিছনে চোখ বুলিয়ে নিল জাঁ ভালজাঁ। অনেক পিছনে সাত-আট জনকে দেখা গেল, ইতস্তত ভঙ্গিতে এদিকেই আসছে। তবে হাঁটায় জোর নেই তাদের। ভালজাঁ কোনদিকে গেছে বুঝতে না পেরে সম্ভবত দ্বিধায় ভুগছে। প্রত্যেকের অস্ত্রের নলে বেয়নেট, পরিষ্কার চাদের আলোয় চকচক করছে। দলটাকে নেতৃত্ব দিয়ে আনছে যে লোক, তাকে এক ঝলক দেখেই চিনে ফেলল জাঁ ভালজাঁ। ইন্সপেক্টর জ্যাভার!

আচমকা সামনে বাধা পড়তে থেমে দাঁড়াতে হলো ভালজাঁকে। সামনে অনেক উঁচু এক দেয়াল দেখে আঁতকে উঠল সে। পথ আটকে রেখেছে প্রাচীন, এবড়ো-খেবড়ো দেয়ালটা। ভুল করে এক কানাগলিতে ঢুকে পড়েছিল ভালজাঁ। সামনে যাওয়ার উপায় নেই। পথ শেষ। বুকের মধ্যে ধড়াশ করে উঠল। সর্বনাশ! এখন কি হবে! আবার পিছনে তাকাল সে। বেশ দূরে আছে এখনও জ্যাভার, যে গতিতে এগোচ্ছে, তাতে এখানে পৌঁছতে কম করেও পনেরো মিনিট লাগবে। তবে লোকটার ঘন ঘন থেমে দাঁড়ানো, গলির বাড়িঘরের প্রতিটি অন্ধকার কোণে উঁকিঝুঁকি মারা দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়, তার শিকার যে এই গলিতেই ঢুকেছে, তাতে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

সামনের দেয়ালটার ওপর নজর দিল জাঁ ভালজাঁ। ভাবতে লাগল কি করা যায়। কম করেও আঠারো ফুট উঁচু ওটা। সোজাসুজি অতিক্রম করা অসম্ভব। সে একা হলে এ কোন বাধাই ছিল না, ঠিকই উতরে যেতে পারত ভালজাঁ। কিন্তু সঙ্গে কোজেত থাকায় তা সম্ভব নয়। হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায় গলির ল্যাম্পপোস্টটা চোখে পড়তে। প্যারিসের ল্যাম্প পোস্টগুলো বেশ দীর্ঘ, মাথায় বসানো চৌকো এক কাচের বাক্সের ভেতর থাকে লণ্ঠন। মিউনিসিপ্যালিটির ল্যাম্প লাইটাররা রোজ সন্ধেবেলা দড়ির সাহায্যে কাচের বাক্স নিচে নামিয়ে ভেতরের আলো জেলে দেয়। প্রতিটি পোস্টের সাথেই এ জন্য আলাদা আলাদা দড়ি ঝোলানো থাকে।

নিজের গলায় পরা বড় স্কার্ফটা খুলে নিল জাঁ ভালজাঁ। ওটার দু'মাথা কোজেতের দু'হাতের তলা দিয়ে গলিয়ে সামনে নিয়ে এসে গিট দিয়ে আটকে দিল। চুপ করে আছে মেয়েটি। ছোট হলেও সহজাত বিচারবোধ থেকে বুঝে নিয়েছে, এরকম জরুরী মুহূর্তে কথা বলতে নেই। চুপ করে বাবার কর্মকাণ্ড দেখছে সে। পকেট থেকে খুদে একটা ছুরি বের করে পোস্ট থেকে প্রয়োজনীয় দড়ি কেটে নিয়ে এল ভালজাঁ। তার এক প্রান্ত দিয়ে, যেখানে স্কার্ফ বেঁধেছে গিট দিয়ে, সেখানে বিশেষ এক গিট; নাবিকরা যাকে বলে সোয়ালো-নট (Swallow Knot), পরিয়ে দিল মজবুত করে। দ্রুত হাতে পায়ের জুতো-মোজা খুলে ফেলল ভালজাঁ। ছুঁড়ে দেয়ালের ওপাশে পাঠিয়ে দিল। দড়ির সোয়ালো-নটের সামান্য ওপরে কামড়ে ধরে মেয়েটিকে বুকের কাছে লটকে নিল সে, তারপর বাদরের মত সাবলীল ভঙ্গিতে তর তর করে দেয়ালের খাজে-ভাজে পা রেখে উঠে যেতে লাগল। আধ মিনিট পেরোবার আগেই দেয়ালের মাথায় চড়ে বসল জাঁ ভালজাঁ। অনেক চওড়া দেয়ালটা। ততক্ষণে বেশ কাছে পৌঁছে গেল জ্যাভার তার দলবল নিয়ে। তাদের উত্তেজিত কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

এতক্ষণে খেয়াল হলো ভালজাঁর কোজেতকে তার সাহস দেয়া উচিত। ঘাবড়িয়ো না, ফিস্ ফিস্ করে বলল সে। 'কথা বোলো না। চুপ করে থাকো।'

নীরবে মাথা দোলাল মেয়েটি। দেয়ালের ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে ঘাড় ফেরাল ভালজাঁ। প্রকাণ্ড এক মাঠের মত ভেতরটা, চারদিকেই দেয়ালঘেরা। লম্বা একটা বিল্ডিং আছে স্কুলঘরের মত। ওদের কাছাকাছি আছে আরেকটা ছোট ঘর। আর সারা মাঠজুড়ে শাক সবজির খেত ভাসছে চাদের আলোয়। যতটা সম্ভব দেয়ালের ভেতরদিকে সরে শুয়ে পড়ল জাঁ ভালজাঁ, কোজেতকেও শুইয়ে দিল। প্রয়োজন ছিল না, তবু আরেকবার সতর্ক করল মেয়েটিকে। এবারও নীরবে মাথা দোলাল সে। পড়ে থাকল ওরা চুপ করে।

একটু পরই শোনা গেল জ্যাভারের ক্রুদ্ধ গর্জন। 'খুঁজে দেখো ভাল করে। এখানেই লুকিয়ে

আছে হয়তো।'

নিচে থেকে অনেকক্ষণ, যেন এক যুগ ধরে ভেসে এল কয়েক জোড়া বুট জুতোর ধুপ ধাপ, মশ মশ আওয়াজ। উত্তেজিত কথাবার্তা। দীর্ঘ সময় পর হতাশ হয়ে ফিরে গেল জ্যাভার। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো একটা বড় লেবু গাছ বেয়ে ভেতরদিকে নেমে পড়ল ভালজাঁ কোজেতকে নিয়ে। জুতো-মোজা খুঁজে নিয়ে পরে ফেলল। এমন সময় দূরের লম্বা বিল্ডিঙের ভেতর থেকে অনেকগুলো নারীকণ্ঠের প্রার্থনা-সঙ্গীত ভেসে এল।

এটা কোন জায়গা? ভাবল জাঁ ভালজাঁ। অনেকক্ষণ ধরে চলল সঙ্গীত। যখন শেষ হলো, ভালজাঁ অনুমান করল, কম করেও একটা দুটো বাজে। 'ঘুম পেয়েছে?' কোজেতকে জিজ্ঞেস করল সে।

শীত করছে খুব, কাঁপতে কাঁপতে জবাব দিল মেয়েটি।

নিজের কোট খুলে ভাল করে ওকে মুড়ে দিল ভালজাঁ। ওকে কোলে নিয়ে সাবধানে ছোট ঘরটার দিকে এগোল। শুধু চালই আছে ঘরটার, চতুর্দিক ফাঁকা। এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে এখানে বেশিক্ষণ টেকা যাবে না। কি করা যায়, ভাবতে লাগল ভালজাঁ। এই সময় সবজির খেতে একটা মানুষের ছায়া দেখা গেল। কোজেতকে বসিয়ে রেখে পায়ে পায়ে সেদিকে এগোল সে। কাছে পৌছতে মুখ তুলল ছায়া, পরক্ষণে তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল বিস্ময়ধ্বনি। 'ফাদার ম্যাডেলিন!'

থমকে গেল জাঁ ভালজাঁ। রাত দুপরে এমন অজানা-অচেনা প্রান্তরে নিজের হারিয়ে যাওয়া নাম শুনে আঁতকে উঠল। ভাল করে লোকটাকে দেখল সে। লোকটা বেশ বয়স্ক। বাঁ হাঁটুতে চামড়ার নী-ক্যাপ দেখা যাচ্ছে তার, ক্যাপের সাথে বাঁধা একটা ঘন্টী। মানুষটা ছোটখাট। হ্যাঁটের কিনারার জন্যে মুখে ছায়া পড়েছে, চেনা যায় না চেহারা। ঘন্টীর টুং টাং আওয়াজ তুলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে এল লোকটা। 'ফাদার ম্যাডেলিন! আপনি এখানে কি ভাবে এলেন? কোনদিক থেকে ঢুকলেন! ও লর্ড! নাকি আকাশ থেকে পড়েছেন!' বিস্ময় ক্রমেই যেন বাড়ছে মানুষটার।

'আপনি কে?' সন্দেহের সুরে প্রশ্ন করল ভালজাঁ। 'এটা কোন জায়গা?'

'সে কি!' হাঁ হয়ে গেল সে। 'আমাকে চিনতে পারছেন না? আর এই জায়গা, এখানে তো আপনিই একদিন পাঠিয়েছিলেন আমাকে?' কি ভেবে টুপি খুলে আরও এগিয়ে এল সে। 'দেখুন তো ভাল করে।'

এবার লোকটাকে চিনল জাঁ ভালজাঁ। এ মন্ট্রিল সুর-মেয়ারের সেই বৃদ্ধ ঘোড়ার গাড়িওয়ালা, ফশেলভেঁ। 'হ্যাঁ, এইবার চিনেছি।'

'আমার সৌভাগ্য, ফাদার।' হাসল বৃদ্ধ।

'কিন্তু আপনি এখানে কেন?'

'বলছেন কি, ফাদার! এই তো সেই কনভেন্ট, যেখানে আমাকে চাকরি পাইয়ে দিয়েছিলেন আপনি। এটাই সেই পেটিট পিকপাস কনভেন্ট, যেখানে কুমারী নানরা দীক্ষা নেয়। কিন্তু ফাদার, আপনি এখানে কেন? এ জায়গা যে পুরুষদের জন্যে নিষিদ্ধ, তা জানেন না?'

তাহলে আপনি আছেন কি করে?

'আমি তো এখানে কাজ করি, ফাদার। কনভেন্টের মালি। আর যা যা প্রয়োজন সবই করি, তবে আড়ালে থেকে। মেয়েদের আমার সামনে আসা বারণ। এই জন্যেই হাঁটুতে ঘন্টী বাধা থাকে আমার সব সময়। যাতে হাঁটাহাঁটির আওয়াজ শুনে সময়মত আমার চোখের সামনে থেকে সরে যেতে পারে ওরা।'

'কিন্তু এত রাতে এই খাতে এসেছেন কেন?'

'আকাশ এত পরিষ্কার দেখে ভাবলাম ভোরের দিকে বরফ পড়তে পারে। ক্ষতি হতে পারে আমার তরমুজগুলোর, তাই ওগুলো ঢেকে দিতে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি এখানে কেন ফাদার?'

কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে বলল ভালজাঁ, 'সব কথা এখনই বলা যাবে না। কিন্তু একটা আশ্রয় এই মুহূর্তে চাই আমার। অন্তত আজকের রাতটার জন্যে। তবে দয়া করে কোন প্রশ্ন করবেন না, এবং আমি যে এখানে এসেছি, কাউকেই তা বলতে পারবেন না।'

‘আপনি যেমন চাইবেন তেমনি হবে, ফাদার ম্যাডেলিন।’

আট

যে মুহূর্তে ফাদার ম্যাডেলিন বা মঁসিয়ে মেয়রের আসল পরিচয় জানা গেল, ফাঁস হয়ে গেল তিনিই আসল জাঁ ভালজাঁ, অতীতে দণ্ড খাটা গ্যালি স্লেভ, প্রায় প্রত্যেকেই ঘৃণার সাথে ছেড়ে গেল তাকে। ভুলেই গেল বলতে গেলে যে মানুষটা এক সময় তাদের বন্ধু ছিল, সুহৃদ ছিল, সাহায্যকারী ছিল। ঝড়-ঝাপটা যত প্রবলই হোক, সে সময় একমাত্র সেই গ্যালি স্লেভটিই তাদের পাশে এসে দাঁড়াত। সুখ-দুঃখের সাথী হত।

মাত্র তিন কি চারজন ছিল যারা এসব জেনেও চিরজীবন বিশ্বস্ত ছিল জাঁ ভালজাঁর প্রতি। বৃদ্ধ ফশেলভেঁ তাদের একজন। ম্যাডেলিনকে কোন প্রশ্নই করল না সে। জানতে চাইল না কেন, কিভাবে এখানে এসেছেন তিনি। বরং ফাদারের উপকার করার সুযোগ পেয়ে খুশিই হলো সে।

জাঁ ভালজাঁও ভাবল নিজের বিপদের কথা। যে করেই হোক, ইন্সপেক্টর জ্যাভার জেনে গেছে সে মরেনি। সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই তার পিছু নিয়েছে লোকটা। কোন সন্দেহ নেই, সেদিন সন্ধ্যের ভিখিরিটা সে-ই ছিল। আবার যখন সে তার পিছু নিয়েছে, কোনমতেই মুক্তি নেই জাঁ ভালজাঁর। শহরের এই একটিমাত্র জায়গাই আছে যেখানে আত্মগোপন করে থাকতে পারে সে নিশ্চিন্তে। এর বাইরে এক পা রাখলে দ্বিতীয় পা রাখার সুযোগ হবে জেলখানায় পৌঁছে।

পরদিন কনভেন্টের পরিচালক, রেভারেণ্ড মাদারকে ধরে বসল ফশেলভেঁ। অনুনয় বিনয় করে তাকে সে যা বোঝাতে চাইল, তা হচ্ছে : অনেক বয়স হয়ে গেছে তার। এখানে কত কাজ, একা সে সামলে উঠতে পারে না। মাদার যদি অনুমতি দেন, গ্রাম থেকে সে তার ছোট ভাইকে আনিয়ে নিতে পারে। তার নাম আলটিমাস ফোশেলভেঁ। ভাই তার অল্প কয়েক বছরের ছোট, বিপত্নীক। এক নাতনী আছে তার। তাকে ফশেলভেঁর সহকারীর চাকরি দিলে সে নাতনীকে এখানে ভর্তি করে দিতে পারে। গরীব মানুষ, বিনে পয়সায় যদি শিক্ষালাভের সুযোগ পায় মেয়েটা, হয়তো একদিন সেও ঈশ্বরের বাণী শোনাতে পারবে অন্যকে। সবচেয়ে বড় কথা, ভাইটি তার সুঠাম, খুব ভাল জানে বাগান তদারকীর কাজ। আর খুব বিশ্বস্ত সে। এবং সৎ। ওর মত সৎ মানুষ তেমন একটা দেখা যায় না আজকাল।

অনেক ভেবেচিন্তে রাজি হলেন রেভারেণ্ড মাদার। আশ্রয় জুটে গেল জাঁ ভালজাঁর। কনভেন্টে ভর্তি করে নেয়া হলো কোজেতকে। দিনে পড়া, অবসরে খেলাধুলা করে কাটে তার, ভালজাঁর কাটে ফসলের খেতে। তারও হাঁটুতে ঘণ্টী বাঁধা।

নিরুপদ্রবে কেটে গেল কয়েক বছর। দেখতে দেখতে বেশ বড় হয়ে গেল কোজেত। মন দিয়ে লেখাপড়া করে মেয়েটি, দিনে এক ঘণ্টার জন্যে ছুটি পায় বাবার সাথে সময় কাটাবার। এদিকে জাঁ ভালজাঁ, নিজের নিরাপত্তা আর কোজেতের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পেরে মনপ্রাণ দিয়ে লেগে পড়ল কনভেন্টের ফুল আর শাক সবৃজির বাগানের পিছনে। অতীত অভিজ্ঞতা ছিল তার এ কাজের, বছর ঘুরতে না ঘুরতে পুরো কনভেন্টের চেহারাই পাল্টে দিল সে। রেভারেণ্ড মাদার থেকে শুরু করে প্রত্যেকের মুখে তখন আলটিমাস ফশেলভেঁর ভূয়সী প্রশংসা। ফশেলভেঁ শুনে মুখ টিপে হাসে। মনে মনে এই ভেবে তৃপ্তি পায়, ম্যাডেলিনের মত বিশাল মনের অধিকারী একজনকে সাহায্য করতে পেরে তার জীবন ধন্য। এর ফলে অতীত পাপ মুছে যাবে তার, একদিন ভালজাঁর সাহায্য নিতে হয়েছে তাকে, তার ঋণও শোধ হবে।

বৃদ্ধ ফশেলভেঁ ছিল সমাজের সেই শ্রেণীর মানুষদের একজন, অন্যের উন্নতি দেখে যাদের চোখ টাটায়। যারা নিজের নাক কেটে হলেও পরের যাত্রা ভঙ্গ করতে চায়। এক সময় মন্ট্রিল-সুর-মেয়ারের পয়সাওয়ালাদের একজন ছিল সে। যখন অবস্থা তার পড়তির দিকে, তখন চোখের সামনে কোথাকার কোন এক ফাদার ম্যাডেলিন এসে টাকার পাহাড় গড়তে শুরু করে দিল দেখে সহ্য হচ্ছিল না তার। কথায় কাজে, অনেকভাবেই তার পিছনে লেগে ছিল ফশেলভেঁ, সুবিধে করতে পারেনি, বরং তাতে ক্ষতি হয়েছে নিজেরই।

এক সময় পরিস্থিতি এমন হলো, ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে জীবিকা অর্জন করতে হত তাকে। তারপর যেদিন দুর্ঘটনায় ফশেলভেঁ মরতে বসেছিল, প্রাণের মায়া ছেড়ে এই মানুষটিই উদ্ধার করে তাকে। যদিও সে ভালই জানত ফশেলভেঁর মনোভাব। শুধু প্রাণই বাঁচায়নি, সে তার মরা ঘোড়া আর

ভাঙা গাড়ি কিনে নিয়েছিল এক হাজার ফ্রাঁর বিনিময়ে। এবং নিজের কারখানার হাসপাতালের ডাক্তারের সাহায্যে এই চাকরিটাও তাকে জুটিয়ে দিয়েছিল।

কিভাবে পাঁচটি বছর কেটে গেল, টেরও পেল না জাঁ ভালজাঁ। একদিন মারা গেল বৃদ্ধ ফশেলভেঁ। কনভেন্টের কাজ ছেড়ে দিল ভালজাঁ, কোজেতকে নিয়ে আবার প্যারিসে বাসা নিল। একটা নয়, তিনটে বাসা। কোজেতের জন্যে এক বুড়ি ঝি ঠিক করে নিয়ে এসেছিল সে কনভেন্ট থেকে। পালা করে তিন বাসায় থাকতে লাগল জাঁ ভালজাঁ। কনভেন্টের বন্দী জীবন হয়তো কোজেতের ভাল লাগবে না, কোনদিন মেয়েটি হয়তো ভেবে বসবে, সে তাকে নতুন জীবন দান করলেও তার সুখ-স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে, এইসব চিন্তা করেই বেরিয়ে আসা। প্রথম বাসা নিল ভালজাঁ রু পুলমেট-এ। পরের দুটোর একটা রু ডি ল হোমি আর্মি লেনে, অন্যটা রু ডি ল উয়েস্ট-এ।

প্রথমটাতে বেশি থাকা পড়ে। তাই বাসাটাকে মোটামুটি সাজিয়েছে জাঁ ভালজাঁ। কোজেতের কোন কিছুরই অভাব সে রাখেনি। এ বাড়ির কাছে লুক্সেমবার্গ পার্ক। প্রায় রোজই কোজেতকে নিয়ে পার্কে যায় ভালজাঁ। প্রতি রবিবার কাছের সেইন্ট জ্যাকস দু হাউত পাস গির্জায় যায় প্রার্থনা করতে। তার আশপাশে যারা থাকে, বেশিরভাগই অভাবী তারা। নগদ টাকা, কাপড়-চোপড় দিয়ে সাহায্য করে সে তাদের।

১৯৩১ সালে 'ন্যাশনাল গার্ড' বাহিনীতে নাগরিকদের ভর্তি হওয়ার আহ্বান জানাল সরকার, বাড়ি বাড়ি সদস্য সংগ্রহের অভিযান শুরু হলো। মঁসিয়ে আলটিমাস ফশেলভেঁকেও নাম লেখাতে হলো। বয়স তখন ষাট পুরো হয়েছে তার, অথচ দেখলে মনে হয় পঞ্চাশের মত। ন্যাশনাল গার্ডের সার্জেন্ট-মেজর পদ পেল জাঁ ভালজাঁ, ইউনিফর্ম পেল। বন্দুকও পেল। কাজ তেমন কিছু না, সারা বছরে তিন চারদিন উর্দি পরে সাধারণ গার্ডদের পাহারা তদারক করা। মন্দ লাগল না তার ব্যাপারটা।
ওদিকে কোজেত তখন চোদ্দয় পা দিয়েছে। দেখতে অপূর্ব সুন্দরী হয়েছে মেয়েটি। নজর ফেরানো দায়। চোখ দুটো তার হয়েছে ঠিক মায়ের মত; তেমনি টানা হরিণ চোখ। এখনও ছোট্ট শিশুটিই রয়ে গেছে কোজেত। রু প্লমেটের বাড়িতে বড় এক বাগান আছে, সারাদিন বলতে গেলে সেখানেই কাটায়। ছোটাছুটি করে; বাবার সাথে লুকোচুরি খেলে। বাবাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে সে। ভালজাঁও ভীষণ সুখী।

একেক সময় কোজেতের পিছনে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে জাঁ ভালজাঁ। তখন হাঁপাতে হাঁপাতে ঠাট্টা করে বলে, আর পারিনে, বাপু! এখন তো তুমি বড় হয়েছ, বাড়ি চলে যাও না কেন? আমি একটু শান্তিতে থাকি!

হাসে কোজেতে। ভালজাঁ তার সত্যিকার বাপ কি না, সে ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা নেই তার। মার কথা ভাবে সে কখনও, যার কথা বাবার মুখে মাঝেমধ্যে শোনে। তার ধারণা, মৃত্যুর পর মায়ের আত্মা আশ্রয় নিয়েছে তার বাবার ভেতর, যাতে সে তার মেয়ের কাছাকাছি থাকতে পারে। এসব ভাবতে গিয়ে কখনও কখনও চোখে পানি এসে যায় কোজেতের। বিড় বিড় করে বলে ওঠে সে, এই লোকটিই আসলে আমার মা।

যত দিন যায়, জাঁ ভালজাঁ মনে মনে ততই শঙ্কিত হয়। যে হারে বড় হচ্ছে মেয়েটি, আর বেশিদিন হয়তো এ সুখ সইবে না তার। বিয়ে দিতে হবে মেয়েকে, চলে যাবে সে নিজের সংসারে, আবার একা হয়ে যাবে সে। সেই ভয়ঙ্কর একাকীত্ব ভরা জীবনে ফিরে যেতে হবে তাকে। অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে জাঁ ভালজাঁ। ভাবে, এই তো যথেষ্ট। তার মত এক নিঃস্ব, আত্মীয়-বান্ধবহীন মানুষ যে এই ফুলের মত মেয়েটির ভালবাসা, শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছে, সেই তো অনেক বেশি। আর কি চাওয়া থাকতে পারে তার?

দিন যেতে থাকে, কোজেতকে নিয়ে লুক্সেমবার্গ পার্কে বেড়াতে যাওয়া অব্যাহত থাকে জাঁ ভালজাঁর। এক বছর পর, কোজেত তখন পনেরোয় পড়েছে, মারিয়াস নামের এক যুবকের চোখ পড়ল তার ওপর নতুন করে সবে ল পাস করেছে মারিয়াস। বয়স বিশ। উচ্চতা মাঝারি, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, খাড়া নাক। মাথায় ঘন কালো চুল। প্রশস্ত কপাল। সব মিলিয়ে সুন্দর, সুপুরুষ সে। তবে একটু গম্ভীর, কিছুটা বিষন্নও লাগে যেন।

সে-ও প্রায়ই আসে পার্কে। বছরখানেক আগেই কোজেতকে দেখেছে মারিয়াস, কিন্তু তখন

তার নজর কাড়তে পারেনি মেয়েটি। রোজই এক বয়স্ক লোকের সাথে পার্কে এসে বসে মেয়েটি। সম্ভবত বাপ-মেয়ে হবে ওরা, ভেবেছে মারিয়াস। বেশ শক্ত সমর্থ দেহ ভদ্রলোকের। বোধহয় সেনাবাহিনীতে ছিলেন। চুল সব সাদা তার। হাতে সব সময় ছড়ি থাকে। বসে বসে গল্প করে দু'জনে, হাঁটাহাঁটি করে। মারিয়াস একাই আসে পার্কে, বসে সময় কাটায়। দূর থেকে বাপ-মেয়ের জুড়িটিকে দেখত সে আগ্রহ নিয়ে। মেয়েটিকেও দেখত সে, তবে বিশেষ কোন দৃষ্টিতে নয়।

একদিন বন্‌ধুমহলে এদের প্রসঙ্গ তুলেছিল সে। পরদিনই কয়েক বন্‌ধু এসে দেখে গেছে বাপ-বেটিকে। দু'চারটা মামুলি কথাবার্তাও হয়েছে তাদের বৃদ্ধের সাথে। সেদিন মারিয়াস অবশ্য দূরে দূরে ছিল। সন্ধের পর বন্‌ধুরা মারিয়াসকে জানাল, বুড়ো খুব দেমাগী। কথাই বলতে চায় না। আর মেয়েটা এখনও স্রেফ শিশু। এরপর কিছুদিন তেমন আগ্রহ দেখায়নি মারিয়াস কোজেতের ব্যাপারে। কোজেত তো তাকাতই না কখনও তার দিকে।

ঠাট্টা করে বন্‌ধুরা বৃদ্ধের নাম রেখেছিল মঁসিয়ে লেব্লাঁ। সাদা চুলের জন্যে এ নাম রাখে তারা জাঁ ভালজাঁর। কোজেতের রেখেছে মাদামোয়াজেল লেনোয়ের। ওরা যেদিন এসেছিল, সেদিন কোজেতের পরনে ছিল কালো পোশাক, তাই। তাদের আসল নাম জানার চেষ্টা কখনও করেনি মারিয়াস। এরপর নানান ঝামেলায় মাস ছয়েক পার্কের দিকে আসা হয়ে ওঠেনি। অনেক দিন পর প্রথম যেদিন আবার এল, সেদিনই তার নজর পরল কোজেতের ওপর।

এত অল্প সময়ে কোন মেয়ে যে এভাবে বেড়ে উঠতে পারে, এত অপরূপ হয়ে ওঠে, ভাবাই যায় না। প্রথমে মারিয়াস ভেবেছিল এ নিশ্চয়ই মঁসিয়ে লেব্লাঁর আরেক মেয়ে। সম্ভবত আগে যাকে দেখেছে সে তাঁর সাথে, তার বড় বোন। আগ্রহ বোধ করল যুবক, একটু একটু করে এগিয়ে গেল তাদের দিকে। যদিও এমন ভাব করল যেন হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়েছে বেখেয়ালে। কাছে গিয়ে বিস্ময়ের সীমা ছাড়িয়ে গেল মারিয়াসের। কোন সন্দেহ নেই, এ সেই মেয়েটিই।

দুরে সরে এল সে। আড়াল থেকে হাঁ করে দেখতেই থাকল কোজেতকে। বাবার সাথে গল্প করছে সে, থেকে থেকে হেসে উঠছে দু'জনেই। কী অদ্‌ভত সুন্দর, অপূর্ব লাগে ওকে হাসলে, মনে মনে নিজেকে শোনল মারিয়াস। ঠিক যেন আচমকা মেঘ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা এক ঝলক সোনালী রোদ। কোজেও একবার তাকিয়েছিল যুবকের দিকে। কিন্‌ত নিস্পৃহ চোখে। ওরা তখন থাকে ল'উয়েস্টের বাসায়।

সে রাতে নিজের অস্থায়ী আবাস, 'গোর্বিও হাউসের' চিলেকোঠার বিছানায় ছটফট করে কাটাল মারিয়াস। ঘুম এল না। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পার্কে গিয়ে হাজির সে। আজ নতুন কাপড়-চোপড় পরে এসেছে। পায়ে নতুন জুতো, এমনকি হাতে এক জোড়া হাত মোজাও। এমনি করে কেটে গেল এক মাস। রোজ আসে মারিয়াস, ওদিকে বাপ বেটিও। এরমধ্যে কোজেতের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা গেছে। সে-ও এখন মাঝেমধ্যে ওর দিকে তাকায়। অতল সাগরের রহস্য সে চাউনিতে।

ওদের বেশি কাছে যায় না মারিয়াস। দূরে থাকে, বসে এমন জায়গা বেছে যেখান থেকে কেবল কোজেতকে দেখতে পায়, বৃদ্ধের চোখে তাকে পড়তে না হয়। তারপরও এক সময় ব্যাপারটা চোখে পড়ে যায় জাঁ ভালজাঁর। কথা বলতে বলতে কোজেতকে প্রায়ই খেই হারিয়ে ফেলতে দেখে বিস্মিত হত সে। তারপর একদিন বুঝল কেন বারবার এমনটা হয়। মারিয়াসকে চিনে রাখে ভালজাঁ। এবং অনিয়মিত হয়ে পড়ে তাদের বেড়াতে আসা। কোন কোনদিন একাই আসে জাঁ ভালজাঁ। চোখ পড়ে থাকে মারিয়াসের আসার পথের ওপর।

আসে ছেলেটা, মেয়েটিকে না দেখে শুকনো মুখে ফিরে যায়। একে প্রেমের রোগে ধরেছে, নিশ্চিত হলো ভালজাঁ। পরক্ষণে আঁতকে উঠল কোজেতের কথা ভেবে। তাকেও কি ধরেছে? পর পর কয়েকদিন কোজেতই এল না দেখে অস্থির হয়ে উঠল মারিয়াস, কি করবে স্থির করতে পারল না। তার উৎকণ্ঠিত ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় যায় অবস্থা, এই সময় হঠাৎ একদিন এল কোজেতে, তবে অল্প সময়ের জন্যে। সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছে মারিয়াস, ফেরার সময় তাদের পিছু নিল সে, বাসা চিনে রাখতে চায়। বাড়ি ফিরে মেয়েকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন মঁসিয়ে লেব্লাঁ, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বিরক্ত, চিন্তিত চোখে তাকে দেখলেন কিছুক্ষণ।

অস্বস্তি নিয়ে নিজের ডেরায় ফিরে গেল যুবক। পরদিন এল না তারা পার্কে। তার পরদিনও না। এক এক করে সাতদিন কেটে গেল, মেয়ে তো নয়ই, মঁসিয়ে লেব্লাঁরও দেখা পাওয়া গেল না। আট দিনের দিন তাদের বাড়িতে খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারল মারিয়াস, এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে কোজেতরা। কোথায় গেছে জানে না কেউ।

মঁসিয়ে জিলেনরমঁদ নব্বই বছর বয়সেও যথেষ্ট কর্মঠ। ঋজু দেহ। সব সময় দুই পকেটে হাত ভরে গদাই লস্করি চালে হাঁটেন। চোখে দেখেন পরিষ্কার, পান করেন প্রচুর। খেতেও পারেন তিনজনের সমান। দাঁত বত্রিশটিই আছে। ভীষণ মেজাজী মানুষ।

সবার সাথে ধমকের সুরে কণ্ঠ চড়িয়ে কথা বলেন জিলেনরমঁদ। অবিবাহিত এক মেয়ে আছে তাঁর, বয়স পঞ্চাশ। রেগে গেলে এই বয়সেও তাকে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে পেটাতে কসুর করেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর খাটি, বুর্জোয়ার এক বর্তমান সংস্করণ বলা যেতে পারে জিলেনরমঁদকে। এবং এটাই তার একমাত্র যোগ্য উপমা।

ভীষণরকম প্রাচীন তার দৃষ্টিভঙ্গি, দাদার আমলে ঘি খেয়ে সারাজীবন হাতে তার গন্ধ শুকে বেড়ানো ধরনের মানুষ। ফরাসী বিপ্লব জিলেনরর্মদের কাছে স্রেফ 'ছোটলোকদের কাণ্ড'। কেউ তার সামনে নেপোলিয়ানের নাম করলে আগুন হয়ে যান রেগে। মারিয়াস পঁতমারসি তাঁর নাতি। মৃত বড় মেয়ের একমাত্র সন্তান।

মেয়ে ভালবেসে বিয়ে করেছিল এক আর্মি অফিসারকে, সহ্য করতে পারেননি জিলেনরমঁদ। এখনও নাম শুনতে পারেন না জামাই জর্জ পঁতমারসির। ১৮১৫ সালে ওয়াটারলুর যুদ্ধে বীরত্বের জন্যে ব্যারন উপাধী পেয়েছিলেন জর্জ পঁতমারসি। কিন্তু যেহেতু জামাই ছিল নেপোলিয়নের অনুগত, তাই তাকে সহ্য করতে পারেন না জিলেনরমঁদ। তার কাছে জামাই পরিবারের কলঙ্ক ছিল। মেয়ের মৃত্যুর পর নাতিকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন তিনি। জর্জের মত ছিল না মোটেই, জিলেনরমঁদ হুমকি দিলেন, তার সম্পত্তির কানাকড়িও হয়ে দেবেন না তিনি মারিয়াসকে।

তাই-সন্তানকে তাঁর হাতে তুলে দিতে হলো জর্জকে। কেবল তাই নয়, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন জামাইকে দিয়ে যে কোনদিন, কোন অজুহাতেই মারিয়াসের সাথে তার দেখা করা চলবে না। যদি তেমন কিছু জিলেনরমঁদের কানে আসে, তাহলে তিনি তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবেনই। শ্বশুরের সম্পত্তি তো ছিলই, সাথে অবিবাহিতা শালীর সম্পত্তিও। সব মিলিয়ে প্রচুর। মারিয়াসের সুখী ভবিষ্যতের কথা ভেবে শ্বশুরের চরম অন্যায়টিকে মেনে নিয়েছিলেন জর্জ মারসি। উপায় ছিল না তার এমনিতেও।

নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর যখন রাজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো, তখন চাকরি হারান তিনি। সম্রাটের দয়ায় অর্ধেক পেনশন ছিল তার একমাত্র সম্বল। ওই সামান্য টাকায় নিজেরই চলা দায়। শ্বশুরের হাতে তাই তুলে দিতেই হলো ছেলেকে। জামাইকে এখনও প্রসঙ্গ উঠলে 'ডাকাত' সম্বোধন করেন জিলেনরমঁদ। আর জর্জ তাকে আড়ালে আবডালে চিরকাল মূর্খ ইত্যাদি বলে ডাকতেন।

মারিয়াসকে এখনও মাঝে মাঝে বেত উঁচিয়ে শাসান জিলেনরমঁদ, 'এই যে, মঁসিয়ে রাসকেল!', 'পাজি!', 'নচ্ছার!', বদমাশ! ইত্যাদি মধুর সম্ভাষণে।

খালার ভীষণ আদরের ছেলে মারিয়াস। ওর যত আবদার, সব তার কাছে। নানার সাথে রাজনীতি নিয়ে প্রায়ই খটমটি বাধে তার, তর্কে হেরে গেলে শুনতে হয় বুড়োর ওইসব সম্ভাষণ। বাবাকে তেমন মনে পরে না মারিয়াসের, কাজেই তার অভাব খুব একটা পীড়া দেয় না। তবু, খারাপ লাগে কখনও কখনও। হাজার হোক, রক্তের টান। তখন নানার ওপর খুব অভিমান হয়। এই লোকটাই সব নষ্টের গোড়া।

অভিমান বাবার ওপরও হয়, কেন সে তাকে নিজের কাছে রাখল না ভেবে। বাবাকে নিয়ে কেউ তার সামনে আলোচনা করে না আজকাল। আগে নানা খুব তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত বাবাকে, সহ্য করতে না পেরে অনেকবার বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে মারিয়াস। রাগ পড়লে আবার ফিরেও এসেছে। সে শুধু খালার টানে।

কিন্তু শেষবার, বছর তিনেক আগে, বাবাকে কেন্দ্র করে নানা আর নাতিতে বেশ বড়রকম এক

চোট হয়ে গেল। সেই যে বাড়ি ছাড়ল মারিয়াস, ফিরল দীর্ঘ পাঁচ বছর পর। শহরের উপকণ্ঠে গোর্বিও বাড়িতে চিলেকোঠার রুম ভাড়া করে ছিল সে এতদিন। এখন প্রচুর ভাড়াটে ও বাড়িতে। সেই বৃদ্ধা বাড়িওয়ালী অবশ্য বেঁচে নেই। তার স্থান দখল করেছে আরেক বুড়ি। ও বাড়ির কোন ব্যাপারেই মাথা ঘামায় না মারিয়াস। চেনে না পর্যন্ত প্রতিবেশীদের।

ঝগড়া করেছে সে বাবার মৃত্যুর পরের একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে। একদিন মঁসিয়ে জিলেনরমঁদ বললেন, তার বাবার অবস্থা নাকি খারাপ, ছেলেকে দেখতে চাইছে। সম্ভব হলে তক্ষুণি ওর রওনা হওয়া উচিত। অবাক হয়েছিল মারিয়াস নানা নিজ মুখে তাকে বাবার কাছে যেতে বলায়। বাবা থাকত ভার্নায়, ছুটে গেল সে, কিন্তু জর্জ পঁতমারসিকে দেখতে পায়নি গিয়ে। ও পৌঁছার কয়েক ঘন্টা আগে মৃত্যু হয় তার।

ছেলের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়েছিলেন মুমূর্ষ কর্নেল পঁতমারসি। ‘ছেলে যখন এল না, তখন আমিই যাচ্ছি ওকে দেখতে,’ বলে ছুটে ঘর থেকে বের হতে গিয়ে আছড়ে পড়ে জায়গায়ই মৃত্যু হয় তার। এ ঘটনা শুনে প্রচণ্ড দুঃখ পেয়েছিল মারিয়াস। নানার ওপর রাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্যারিসে ফিরে আসার সময় বাসার কাজের মহিলা এক টুকরো কাগজ তুলে দিল ওর হাতে। ওটা নাকি বাবা তাকে দিতে বলেছে।

একটা চিঠি ছিল ওটা। লেখা ছিলঃ আমার ছেলের উদ্দেশে- ওয়াটারলুর যুদ্ধে বীরত্বের জন্যে সম্রাট আমাকে ব্যারন উপাধী দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার নিজের রক্তে রঞ্জিত সে উপাধী কেড়ে নেয়। অষ্টাদশ লুই। তবু আমার ইচ্ছে, যেন আমার ছেলে এ উপাধী গ্রহণ করে। আমি জানি সে এ মর্যাদার যোগ্য।

পুনঃ ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্রে এক সার্জেন্ট আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। তার নাম থেনারদিয়ের। শুনেছি মন্তফারমেলে এক হোটেল চালায় লোকটা। আমার ছেলে যেন তার সাথে যোগাযোগ করে। তাকে সাহায্য করে।

প্যারিস ফিরেই নিজের নামে একশো ভিজিটিং কার্ড ছাপাল মারিয়াস নামের আগে ব্যারন বসিয়ে। তারপর ল কলেজের লাইব্রেরি ঘেঁটে বের করল পুরনো ‘মনিটিউর’ পত্রিকার কয়েকটা ফাইল। ওতে জর্জ পঁতমারসির নানান বীরত্বের কাহিনী পড়ে তাজ্জব হয়ে গেল সে। এতদিন এসবের কিছু জানত না সে। পত্রিকা পড়েই জানল মারিয়াস, তার বাবা এমনই এক বীর ছিলেন, যাকে রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়েই ব্যারন পদক দিয়েছিলেন স্বয়ং নেপোলিয়ন। আশ্চর্য! এই ছিল তার বাবা? অথচ...দুঃখ পেল মারিয়াস এমন একজন মানুষকে নানা কী প্রচণ্ড অপমান করেছে ভেবে। প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছে এমন বাবার স্নেহ-ভালবাসা থেকে তাকে চিরকাল বঞ্চিত করা হয়েছে ভেবে।

সে যুদ্ধে প্রচণ্ড আহত অবস্থায় লুনেনবার্গ ব্যাটালিয়নের পতাকা ছিনিয়ে এনে সম্রাটের হাতে তুলে দিয়েছিলেন কর্নেল জর্জ পঁতমারসি, সারা দেহের অসংখ্য ক্ষত থেকে স্রোতের মত রক্ত ঝরছে তখন তার। তলোয়ারের কোপে সারামুখ ছিন্নভিন্ন।

সেদিন রণক্ষেত্রে আরও একটা বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল, যা সম্ভবত যে ঘটিয়েছে সে ছাড়া আর কেউ জানে না। অবশ্য তার মত আর কেউ যদি সে কাজে লিপ্ত হয়ে থেকে থাকে, সে নিশ্চয়ই জানে। রাতের আঁধারে পড়ে থাকা মৃত অর্ধমৃত অফিসার-সৈনিকদের হাতঘড়ি, মানিব্যাগ, আংটি-চেইন ইত্যাদি সংগ্রহ করে দ্রুত নিজের ঢোলা জোব্বার পকেট বোঝাই করছিল এক লোক। কাজের ফাঁকে চারদিকে সতর্ক নজর রেখেছে সে, ইংরেজ সৈন্যরা দেখে ফেল কি না সে ভয় ষোলো আনাই রয়েছে তার। ওয়েলিংটনের কড়া নির্দেশ, লুটপাটে লিপ্ত কাউকে দেখা পেলে তৎক্ষণাৎ গুলি করা হবে তাকে। কাজেহ খুবই সতর্ক সে।

কাজ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে লোকটা, এক জায়গায় লাশের একটা বড়সড় স্তূপ দেখে থেমে পড়ল। ওপরের মৃতদেহগুলোর হাত-পা ধরে হিড় হিড় করে টেনে নামাল সে, তাদের হাত-পকেট, গলা ফর্সা করতে লাগল। কাজ সেরে যখন সরে পড়তে যাবে, এই সময় একটা হাত তার জোব্বা টেনে ধরল। অবাক হয়ে ঘুরে তাকাল সে। চিনতে অসুবিধে হলো না, এই হাতের আঙুল থেকেই একটা আংটি খসিয়ে নিয়েছে সে এইমাত্র। পকেটও খালি করেছে হাতের মালিকের।

হাত ধরে দেহটা সামনের দিকে টেনে আনল সে। তার বুকে একটা রূপোর ক্রস দেখে চমকে উঠল। ইশশ! আরেকটু হলে যাচ্ছিল এটা হাত ফসকে। ছোঁ মেরে খুলে নিল সে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সামরিক পদকটা।

'ধন্যবাদ!' ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বলল ক্রুসধারী বীর। 'দম নিতে পারছিলাম এতক্ষণ। তুমি না এলে বুকের ওপরের লাশগুলোর চাপে...।' ক্ষীণ কণ্ঠ থেমে গেল তার। যুদ্ধ শেষ?

'হ্যাঁ,' বলল নিশাচর।

কারা জিতল?

ইংরেজরা।

'ওহ! হতাশা প্রকাশ পেল আহত লোকটির বলার সুরে। আমার পকেটে মানিব্যাগ আছে। হাত...ঘড়ি আছে, আ...আংটি আছে। ওসব তুমি নিয়ে যাও, ভাই।'

নিশাচর বুঝল ব্যাপার এখনও টের পায়নি মানুষটা; অজ্ঞান ছিল নিশ্চয়ই। তাকে দেখাবার জন্যে তার পকেটগুলো হাতড়াল সে, তারপর কব্জি, হাতের আঙুল দেখল। কই, নেই তো!'

'দুঃখিত। কেউ নিশ্চই নিয়ে গেছে তাহলে, টের পাইনি।'

দূরে বুটজুতোর আওয়াজ শুনে তটস্থ হয়ে উঠল নিশাচর।

'তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে, ভাই। কে তুমি?' তার হাত ধরে বসল মৃতপ্রায় লোকটি।

'আপনার মতই এক ফরাসী সৈনিক। এবার আমি যাই, কারা যেন আসছে। দেখে ফেললে গুলি করে মারবে আমাকে, পরের বাক্য দুটো ফিসফিস করে যেন নিজেকেই শোনাল লোকটা।

'কি পদ তোমার?

'আমি সার্জেন্ট।' দ্রুত এদিক-ওদিক দেখে নিল সে।

'কি নাম?'

থেনারদিয়ের। ছাড়ুন, যেতে হবে আমাকে।

'যাও, তোমার কথা মনে থাকবে আমার। আর আমার নামটাও মনে রেখো। আমি কর্নেল জর্জ পঁতমারসি।'

বাসার সাথে যোগাযোগ ক্রমে কমে এল মারিয়াসের। গম্ভীর হয়ে উঠল সে। ঘন ঘন ভার্না যেতে শুরু করল, ওখানে বাবার কবরের পাশে নীরবে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বাসায় খাওয়ার সময় ছাড়া দেখাই পাওয়া যায় না ওর, তাও অনিয়মিত। প্রায়ই এ নিয়ে অনুযোগ করেন খালা, শুনে জিলেনরমঁদ হাসেন। 'দেখোগে, ছোঁড়া ঠিক কারও প্রেমে পড়েছে।'

প্রেমই বটে! ইতিহাসের প্রেমে পড়েছে মারিয়াস। যত ইতিহাস পড়ে, ততই অবাক হয়, ততই রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা প্রভাবিত হতে থাকে তার। প্রজাতন্ত্র আর নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বলতে নানার মুখে যা শুনেছে এতদিন মারিয়াস, তার সবই মিথ্যে বলে প্রমাণ হলো। তার ধারণা ছিল প্রজাতন্ত্র মানেই গিলোটিন, সাম্রাজ্য মানেই তলোয়ার। কিনুত তা তো নয়!

নানা, খালা, বাড়ি, সবকিছুর সাথে ক্রমে ব্যবধান বাড়তেই থাকে মারিয়াসের। স্বাভাবিক স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন থেকে পিতা-পুত্র দু'জনকেই বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন নিষ্ঠুর জিলেনরমঁদ, যতই ভাবে মারিয়াস, ততই নানার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে সে। যদিও তখনও তা বুঝতে দেয়নি তাকে। খালাকেও না। এরমধ্যে একদিন মন্তফারমেল গিয়েছিল মারিয়াস, থেনারদিয়েরের খোঁজে। পাওয়া যায়নি তাকে। ব্যবসায় ফেল মেরে হোটেল বেচে দিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে সে পরিবারসহ।

মারিয়াসের অনুপস্থিতিতে একদিন তার ঘরে ঢুকলেন মঁসিয়ে জিলেনরমঁদ। বহু খোঁজাখুজির পর পেয়ে গেলেন ছোট্ট একটা চিঠি। মেয়েকে সেটা দেখিয়ে হা হা করে হাসলেন বৃদ্ধ। 'এই দেখো, প্রেমপত্র! বলেছিলাম না, শালা ডুবে ডুবে পানি খাচ্ছে?' খুলে ওটা পড়লেন জিলেনরমঁদ। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেলেন। এরপর আবিষ্কার করলেন 'ব্যারন' মারিয়াস পঁতমারসি নামের কার্ডগুলো। আর যায় কোথায়। রাতে মারিয়াস ফিরতে স্বভাবসুলভ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললেন, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও! তুমি তো এখন ব্যারন হয়েছ, আমার অভিনন্দন নেবে না?'

চুপ করে থাকল মারিয়াস। আরক্ত হয়ে উঠেছে চেহারা।

'এসবের মানে কি?' গর্জন করে উঠলেন জিলেনরমঁদ। হাতে মারিয়াসের নাম লেখা কার্ড।

এক কথা দুই কথায় নানা-নাতিতে বেধে গেল তুমুল। ছেড়ে কথা বলল না এবার মারিয়াস। রেগে আগুন হয়ে গেলেন বৃদ্ধ। 'তোমার বাপ বীর ছিল না, ছিল খুনে-ডাকাতদের দলের। গুণ্ডা ছিল! বোনাপার্টের মত ডাকাতের শিষ্য, যে বেঈমানি করেছিল দেশের আইনসম্মত রাজার সাথে। ওয়াটারলুতে বীরত্ব দেখিয়েছে সে ঠিকই, সে ছিল পিঠটান দেয়ার বীরত্ব। ইংরেজ আর রাশিয়ান সৈন্যদের ভয়ে পালিয়েছিল সে। তার ব্যারন উপাধী আর আমার ছেড়া চটি, দুটোতে কোন তফাত দেখি না আমি।'

পকেটের সম্বল ত্রিশ ফ্রাঁ আর কিছু কাপড় চোপড় নিয়ে সেই মুহূর্তে নানার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল মারিয়াস। খালা অনেক চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারলেন না। গোর্বিও হাউসে এসে উঠল মারিয়াস বছরে ত্রিশ ফ্রাঁ ভাড়ায়। চাকরি নিল এক প্রকাশনা সংস্থায়। বেতন বছরে সাকুল্যে সাতশো ফ্রাঁ। খুব হিসেব করে চলতে লাগল মারিয়াস। পয়সার ওপর দরদ বেড়েছে তার। কারণ চাকরিটা পাওয়ার আগ পর্যন্ত চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে, সে কথা ভোলেনি মারিয়াস।

ওদিকে সে বাড়ি ছেড়ে আসার পরদিন মেয়ের কান্নাকাটি সহ্য করতে না পেরে মঁসিয়ে জিলেনরমঁদ বললেন, 'খুঁজে বের করো কোথায় আছে নচ্ছারটা। গেছে যাক না, থাকতে দাও ক'দিন বাইরে। দেখে আসুক দুনিয়াটা কত মজার জায়গা। মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়ো। কিন্তু আমার সামনে নামও নেবে না কখনও রক্তচোষাটার।'

ঠিকানা বের করেছিলেন খালা, টাকাও পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু নেয়নি মারিয়াস। ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। আবার পাঠিয়েছেন খালা, একই কাজ করেছে ও। সাথে চিঠিও দিয়েছে। তাতে লিখেছেঃ 'আমার ব্যবস্থা আমিই করে নিতে পারব।' এ চিঠি যখন-লেখে সে, তখন মারিয়াসের সম্বল মাত্র তিনটে ফ্রাঁ। দিন যত যায়, নানার তেজ একটু একটু করে কমে আসে। মেয়ের ওপর রেগে কাঁই হয়ে ওঠেন তিনি। আমি রাগের মুখে কি না কি বলেছি, আর ওরাও কেউ ছেলেটার নাম পর্যন্ত মুখে আনে না আমার সামনে, এ কোন কথা হলো! ভাবেন জিলেনরমঁদ। তিনি অবশ্য জানতেন না তাঁর ব্যারন নাতি তার টাকা ফেরত পাঠিয়েছে।

'এসো, তুমি!' নাতির উদ্দেশে দাঁত কাটেন বৃদ্ধ। 'হাতের কাছে পেলে হয়, কান ছিড়ে নেব তোমার!'

সময় গড়ায় আপন চক্রে ভর করে। ল পরীক্ষা দেয় মারিয়াস, পাস করে ভালমতই। এরমধ্যেও থেনারদিয়েরের সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে সে নিয়মিত। কারণ তার বাবার নির্দেশ, তাকে যথাসম্ভব সাহায্য করা। কিন্তু কোথাও লোকটার খোঁজ পাওয়া যায় না।

প্রতিজ্ঞা করে মারিয়াস, যদি মরে গিয়ে না থাকে, খুঁজে সে বের করবেই তাকে। বিকেলের দিকে বাইরে হাঁটাহাঁটি করে সময় কাটায় সে। কোনদিন চওড়া বুলেভার্ড ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় অনেকদূর। গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় হাঁটতে খুব ভাল লাগে। কোনদিন যায় লুক্সেমবুর্গ পার্কে। এ জায়গাও তার পছন্দ।

একদিন ডেরায় ফিরে জানতে পারল মারিয়াস, তার প্রতিবেশী কোন এক জনদ্রেত পরিবারকে বের করে দেয়া হচ্ছে। কারণ ওরা পর পর দুই কিস্তির ভাড়া দেয়নি। সারাদিন বাইরে বাইরে কাটে মারিয়াসের, জানেও না কে জনদ্রেত। তবু একটা পরিবার কষ্টে আছে ভেবে দয়া হলো ওর। বিশ ফ্রাঁ বাকি ফেলেছিল ওরা, বাড়িওয়ালীকে টাকাটা সেই দিয়ে দিল। আরও পাঁচ ফ্রাঁ তাকে দিয়ে জনদ্রেতকে পাঠাল মারিয়াস। এই টাকায় কিছু কিনে খেতে বলবেন ওদের। আর আমি টাকা দিয়েছি, তা বলবেন না যেন।

মারিয়াস না চিনলেও, অন্তত জনদ্রেতের বড় মেয়েটি ওকে ভালই চিনত। যতক্ষণ বাসায় থাকত সে, মেয়েটির চোখ পড়ে থাকত তার ওপর। ভালবেসে ফেলেছিল সে মারিয়াসকে।

নয়

এক রবিবার সকালে নাস্তা খেতে বসতে যাচ্ছিল মারিয়াস, এই সময় কে নক করল ভেড়ানো দরজায়। ভেতরে আসার আহ্বান জাল সে। ছোটখাট গড়নের এক মেয়ে ঢুকল ঘরে। বয়স পনেরো মোনলা হবে। বয়সের তুলনায় অনেক পাকা মনে হয় মেয়েটিকে। পরনে ঢিলা সেমিজ তার, কাঁধ থেকে খসে পড়েছে। নগ্ন শরীর বেরিয়ে আছে, খেয়াল নেই সেদিকে। শীতে কাঁপছে মেয়েটি। একে আগে কোথাও দেখেছে সে, মনে হলো মারিয়াসের, চেনা চেনা লাগছে চেহারা। কি চাই?

'আপনার চিঠি,' ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠে বলল মেয়েটি। এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিল। তার সামনের একটা কি দুটো দাঁত নেই, লক্ষ করল ও।

অবাক হলেও বিনা প্রশ্নে চিঠিটা নিল মারিয়াস। পড়ল। ওটা লিখেছে তার প্রতিবেশী, জনদ্রেত। ভাড়া পরিশোধ করে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছে সে তাকে। বড় মেয়েকে পাঠিয়েছে, যদি সম্ভব হয়, দয়া করে আর কিছু সাহায্য তার হাতে পাঠিয়ে দিতে। গত দুদিন সবাই না খেয়ে আছে তার পরিবারের ইত্যাদি ইত্যাদি।

ওদিকে মারিয়াস যখন চিঠি পড়ছে, অনুমতির অপেক্ষা না করেই মেয়েটি ওর টেবিলের বই-খাতা নাড়াচাড়া শুরু করে দিয়েছে। 'ওহ, অনেক বই আপনার, মঁসিয়ে। আমি লেখাপড়া জানি কিছু কিছু, ছোটবেলায় শিখেছি। দেখবেন আমার লেখা?' বলতে বলতে একটা খাতা খুলে বড় বড় অক্ষরে লিখল মেয়েটি: কুঠাবধারীরা আসছে। হঠাৎ মুখ তুলল সে। মঁসিয়ে, আপনি জানেন আপনি কত সুন্দর? আপনি তো কখনও ফিরেও দেখেন না আমাকে, আমি কিন্তু...। অস্টারলিজে ফাদার মাবুফের কাছে যান আপনি, আমি জানি।

মেয়েটির হাতে আরেকটা ভাজ করা কাগজ দেখে প্রশ্নবোধক চোখে তাকাল মারিয়াস। হাসল সে। 'এটা? এটাও আরেকটা চিঠি। সেইন্ট জ্যাকস ডু হট পাস গির্জায় প্রতি রোববার একদানবীর ভদ্রলোক আসেন, গরীবদের নানাভাবে সাহায্য করেন, তাঁর জন্যে। দেখি, যদি কোন সাহায্য করেন উনি আমাদের।'

পাঁচ ফ্রাঁ আর খুচরো কিছু ছিল মারিয়াসের কাছে। ওখান থেকে পাঁচ ফ্লাই দিয়ে দিল ও। 'আর নেই আজ।'

'ধন্যবাদ, মঁসিয়ে।'

তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে দুঃখ হলো মারিয়াসের। নিশ্চয়ই জনদ্রেত লোকটা খুব গরীব, নইলে এই প্রচণ্ড শীতে খালি গায়ে কেন ঘুরে বেড়াবে মেয়েটি? প্রায় চার বছর এ বাড়িতে আছে ও, অথচ কোনদিন প্রতিবেশীদের খোঁজ নেয়নি। ভুল হয়ে গেছে, ভাবল মারিয়াস, অন্যায় হয়ে গেছে। এখন থেকে নিতে হবে। কিন্তু কি করে? সরাসরি কারও ঘরে ঢুকে তার দারিদ্র সম্পর্কে খোঁজ নেয়া কি ঠিক হবে? তার চাইতে গোপনে খোঁজ নেবে সে, ঠিক করল মারিয়াস। কিন্তু নিজেকে আড়ালে রেখে কি ভাবে...ভাবতে ভাবতেই উপায় বের করে ফেলল সে। ওর আর জনদ্রেতর রুমের মাঝখানের দেয়ালে, ওপরে, তেকোনা একটা মোটামুটি বড় ফুটো আছে ভেন্টিলেটরের মত। ওর পড়ার টেবিলে দাড়ালে সেটা দিয়ে ওপাশের রুমটা দেখা যাবে নিশ্চই।

যেই ভাবা সেই কাজ। ধীরেসুস্থে নাস্তা খেল সে। ঘন্টাখানেক পর সামনের দরজা লাগিয়ে টেবিলের ওপর দাঁড়াল। উঁকি দিয়ে জনদ্রেতের ঘরের দিকে তাকিয়েই চোখ কপালে উঠল তার। সত্যিকার অভাব কাকে বলে চাক্ষুষ করে স্তম্ভিত হয়ে গেল মারিয়াস। একটা বেতের চেয়ার, দুটো নড়বড়ে খাটিয়া আর একটা টেবিল, এই হচ্ছে ওই পরিবারের সম্বল। এক খাটিয়ায় এগারো-বারো বছরের একটি মেয়ে শুয়ে আছে। কঙ্কালের মত দেহ তার। দম নিচ্ছে কিনা বোঝা গেল না।

ওপাশের দেয়ালঘেঁষা খুদে ফায়ারপ্লেসে টিমটিম করে আগুন জ্বলছে। তার পাশে চুপ করে বসে আছে এক মহিলা, নিশ্চয়ই মাদাম জনদ্রেত হবে। বিশালদেহী সে। পিছন ফিরে বসা বলে চেহারা দেখতে পেল না মারিয়াস। টেবিলের সামনে ঘরের একমাত্র চেয়ারটা দখল করে বসে আছে এক ছোটখাট বৃদ্ধ-নিশ্চয়ই জনদ্রেত হবে। বছর ষাটেক বয়স, মুখে লম্বা দাড়ি। ঘরটা অন্ধকার। পিছনের দিকে একটা জানালা আছে বটে, তবে মাকড়সার ঘন জালের পর্দা ঠেলে ভেতরে আলো

ঢুকতে পারছে না। ওর মধ্যেও বৃদ্ধের চোখ দুটোকে শুকুনের চোখের মত লাগল মারিয়াসের। নিষ্ঠুর এবং চঞ্চল।

ঘরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছেড়া মোজা, ফাটা চটি, কম্বল ইত্যাদি। বোটকা দুর্গন্ধ ঘরে। দম বন্ধ হয়ে আসে। নানার বাড়ি ছেড়ে আসার পরের কয়েক মাস তারও প্রচণ্ড অভাবে দিন কেটেছে। অভাব কাকে বলে মারিয়াস জানে। কিন্তু জনদ্রেত পরিবারের অবস্থা দেখে মনে হলো এদের তুলনায় রীতিমত স্বর্গবাস হয়েছে তার সেই কয়মাস। নেমে আসতে যাচ্ছিল মারিয়াস, এই সময় কোথেকে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির বড় মেয়েটি। চেহারায় খুশি খুশি ভাব। উনি আসছেন? বলল সে।

শকুন চোখ কুঁচকে উঠল বৃদ্ধের। কে?

'সেইন্ট জ্যাকস গির্জার সেই দাতা ভদ্রলোক।'

সত্যি!

'হ্যাঁ। এখনই এসে পড়বেন।'

কার ব্যাপারে কথা বলছে ওরা? ভাবল মারিয়াস। পরক্ষণে নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল, যার ব্যাপারে বলছে বলুক, তাতে ওর কি? নেমে আসতে গেল, কিন্তু এবারও শেষ মুহূর্তে থেমে পড়তে হলো ও ঘরে জনদ্রেতকে, 'আসুন, মঁসিয়ে, আসুন! দয়া করে গরীবের ঘরে পায়ের ধুলো দিন,' বলে উঠতে শুনে। কে এল...?

কৌতুহলী হয়ে আবার উঁকি দিল মারিয়াস, এবং মানুষটার ওপর চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে চমকে উঠল যেন ভয়ঙ্কর এক বৈদ্যুতিক শক খেয়েছে। ইনি সেই মঁসিয়ে লেব্লাঁ, মারিয়াসের স্বপ্নমানসীর বাবা। পরমুহূর্তে আরেক ধাক্কা খেল ও, মেয়েও আছে বাবার সাথে। তার সেই অপরূপা! দম নিতেও ভুলে গেল মারিয়াস, জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে কিনা ভেবে পেল না। আগের মতই আছে মেয়েটি, তবে চেহারা একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। মারিয়াসের মোহাবিষ্ট চোখের সামনে জনদ্রেতের ঘরে ঢুকল বাপ-মেয়ে। মেয়ের হাতে বড় একটা প্যাকেট। সেটা টেবিলের ওপর রেখে ঘরের চারদিকে চোখ বোলাতে লাগল মেয়েটি। হাঁ করে দেখতেই থাকল তাকে মারিয়াস।

'এর মধ্যে আপনাদের জন্যে কিছু গরম কাপড়, মোজা আর বিছানার চাদর আছে,' জনদ্রেতকে বললেন মঁসিয়ে লেব্লাঁ।

'আপনার অশেষ দয়া, মঁসিয়ে,' বলল জনদ্রেত। লক্ষ করল মারিয়াস, এইমাত্র তার মধ্যে যে বিনয়ী ভাবটা ছিল, তা এখন নেই। হঠাৎ করেই ভদ্রলোক সম্পর্কে লোকটার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে গেল যেন। কেমন এক দৃষ্টিতে তাকে পর্যবেক্ষণ করছে জনদ্রেত, মনে হলো তাকে চেনার চেষ্টা করছে। অতীতের পরিচিত কাউকে স্মরণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। লেব্লাঁ যখন ঘরের ওপর নজর বোলাচ্ছেন, তার অগোচরে স্ত্রীর কানে কানে কী যেন বলল জনদ্রেত। তারপর কাঁচুমাচু চেহারা করে তার সামনে এসে দাঁড়াল, হাত কচলাচ্ছে। 'খুব কঠিন অবস্থায় আছি, মঁসিয়ে, তাই চিঠি লিখেছি আপনাকে। পরিবারের কারও জামা-কাপড় নেই, কোট নেই বলে বাইরে যেতে পারি না। তার মধ্যে বাড়ি ভাড়া বাকি পড়ে গেছে অনেক। ষাট ফ্রাঁ। কালকের মধ্যে টাকাটা দিলে বের করে দেবে আমাদের বাড়িওয়ালী।'

জনদ্রেতের মুখে ডাহা মিথ্যেটা শুনে হাঁ হয়ে গেল মারিয়াস। কতবড় মিথ্যুক, ব্যাটা! সে তখনও ইনিয়ে বিনিয়ে বলে চলেছে, 'খুবই অভাবে আছি; মঁসিয়ে। গত দু'দিন না খেয়ে আছি আমরা। তার ওপর ছোট মেয়েটা অসুস্থ,' ইঙ্গিতে খাটিয়ায় শোয়া কঙ্কাল দেখাল জনদ্রেত। 'চিকিৎসা করাতে পারছি না।'

ব্যথিত চোখে বৃদ্ধকে দেখলেন লেব্লাঁ। পকেট থেকে পাঁচ ফ্রাঁ বের করে তাকে দিলেন। নিল সে ওটা, তবে খুবই অসন্তুষ্টির সাথে। 'এখন এটা রাখুন। বিকেলে এসে বাড়ি ভাড়ার টাকাটা দিয়ে যাব আমি। গায়ের দামী ওভারকোটটা খুলে, টেবিলে রেখে বললেন তিনি, এটা আপনি পরবেন।'

মুহূর্তে অসন্তুষ্টি উবে গেল জনদ্রেতের চেহারা থেকে। 'মঁসিয়ে, আপনার দয়া দেখে চোখে পানি এসে যাচ্ছে আমার।' তাড়াতাড়ি কোট গায়ে চড়াল সে। 'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, মঁসিয়ে! উফ! বেঁচে গেলাম।'

‘সন্ধে ছ’টার সময় আসব আমি টাকা নিয়ে,’ বললেন লেব্লাঁ।

‘গরীব আপনার পথ চেয়ে থাকবে, বিনয়ে গলে গেল জনদ্রেত। ‘চলুন, আপনাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।’

‘হ্যাঁ, চলুন।’ বেরিয়ে গেলেন লেব্লাঁ আর তার মেয়ে মাদামোয়াজেল লেনোয়ের। পিছন পিছন জনদ্রেতও গেল। ব্যস্ত হয়ে টেবিল থেকে নেমে পড়ল মারিয়াস। ও ঘরের সবদিকেই নজর ছিল ওর, কিনু্ত মন প্রতিমুহূর্তের জন্যে পড়ে ছিল কোজেতের ওপর। আজ আবার অনুসরণ করবে সে বাপ-মেয়েকে, মনে মনে আগেই ভেবে রেখেছে মারিয়াস। ওদের নতুন বাসা চিনে আসবে। কোজেতকে আর’হারিয়ে যেতে দেবে না সে। তাড়াতাড়ি টুপি নিয়ে দরজা খুলল মারিয়াস, পরক্ষণে থেমে গেল দ্বিধায় পড়ে। যদি ফের টের পেয়ে যান লেব্লাঁ? অনুসরণ করার সময় যদি দেখে ফেলেন ওকে? আবার যদি ডুব দেন মেয়েকে নিয়ে? যা হয় হোক, তবু যাবে সে। সাহসে ভর করে বেরিয়ে পড়ল মারিয়াস, তাড়াতাড়ি নেমে এল নিচে। কিনু্ত দেরি হয়ে গেছে। যখন রাস্তায় পৌঁছল ও, সেই মুহূর্তেই দূরের বাকটা ঘুরে চোখের আড়ালে চলে গেল ওদের ঘোড়ার গাড়ি। কয়েক সেকেণ্ড বোকার মত সেদিকে তাকিয়ে থাকল মারিয়াস, তারপর বিষন্ন মনে ফিরে এল ঘরে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করতে যাবে, এই সময় জনদ্রেতের বড় মেয়েটিকে সামনেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিরক্ত হলো সে। তুমি? আবার কি চাই?

মারিয়াসের মনোভাব টের পেয়ে লজ্জা পেল সে। মুহূর্তের জন্যে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। আমি নতুন করে সাহায্য চাইতে আসিনি, মঁসিয়ে এসেছি আমি আপনার কোন কাজে লাগতে পারি কি

না, তাই জানতে। ধরুন, কোথাও কাউকে চিঠিপত্র পৌঁছে দেয়া, কোন ঠিকানা খুঁজে বের করা, এইসব আর কি! আরও অনেক কাজ পারি আমি।

চট করে বুদ্ধিটা এল মারিয়াসের মাথায়। বিরক্তি ভুলে এসেছিল বলে ধন্যবাদ জানাল তাকে মনে মনে। শোনো, তাহলে, একটু আগে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন তোমাদের বাসায়, তার ঠিকানা খুঁজে বের করে জানাও আমাকে।

চেহারা কালো হয়ে গেল মেয়েটির। মলিন মুখ তুলে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে মারিয়াসকে দেখল সে। ‘ওই মাদামোয়াজেলের ঠিকানা জানতে চান আসলে আপনি, এই তো?’

চুপ করে থাকল মারিয়াস। ভদ্রলোকের জায়গায় মাদামোয়জেলকে কেন টানল ও?

‘ঠিক আছে। আমি রাজি। কিনু্ত বিনিময়ে কি দেবেন আপনি, মঁসিয়ে?’

তুমি যা চাইবে!

‘ঠিক? তাহলে চিন্তা নেই। খুব শিগগিরি পেয়ে যাবেন ঠিকানা।’

ওকে বিদেয় করে দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল মারিয়াস। পরক্ষণে চমকে গেল পাশের রূমে জনদ্রেতকে চেঁচিয়ে উঠতে শুনে। ‘ঠিকই চিনেছি আমি ওকে!’ বলে উঠল সে। এক বিন্দু সন্দেহ নেই আমার। ও সেই লোক!

বুঝে ফেলল সে কার কথা বলছে জনদ্রেত। মঁসিয়ে লেব্লাঁর কথা বলছে সে। তার মানে, জনদ্রেত যখন জানে, কান পাতলে সে-ও জানতে পারবে তার পরিচয়। খুশি মনে ঝটপট টেবিলে উঠে পড়ল মারিয়াস। চোখ রাখল ফুটোয়। এবার জনদ্রেতপত্মীর চেহারা দেখতে পেল ও। বিকট চেহারা মহিলার, পুরুষালী ভাবসাব। খাটিয়ায় শোয়া অসুস্থ মেয়ের পাশে বসে অবাক হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে মহিলা। ‘কি বলছ তুমি?’ মোটা, ব্যাটাছেলের গলায় বলে উঠল সে, তা কি করে হয়?

‘তাই হয়েছে!’ জোর দিয়ে বলল বৃদ্ধ। তোমাকে তখন বলিনি ওর মুখের দিকে ভাল করে তাকাতে? সেই স্বাস্থ্য, সেই চেহারা, তবে পরনে তখনকার মত ভিখিরির নয়, দামী পোশাক, এই যা পার্থক্য, নইলে আর সব ঠিকই আছে। হুঁহুঁ, বাবা! আমার চোখকে ফাঁকি দেয়া? অস্থির পায়ে সারা ঘরে পায়চারি করতে লাগল জনদ্রেত। ‘বুড়ো শয়তানটাকে তো চিনেইছি, সঙ্গের ছুঁড়িটাকেও চিনেছি!’

‘তোমার কি মাথা খারাপ হলো নাকি?’ তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল স্ত্রী। ‘কোথায় সেই মেয়ে, আর কোথায়...’

চোখ গরম করে থেমে দাঁড়াল জনদ্রেত। আমি বলছি এ-ও সেই! তুমি ভেবেছ আমি আন্দাজে বলছি? না, জেনেশুনেই বলছি। ওদের দু'জনকেই চিনেছি আমি, বিশ্বাস করো। পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে তবেই বলছি।

ওদিক থেকে বেকুবের মত জনদ্রেতের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে মারিয়াস। অতীতের পরিচিত কাউকে যদি নতুন করে চিনেই থাকে সে, তাতে এত রাগের কি আছে, ভেবে পেল না সে। একজন দয়ালু দাতাকে এমন অশ্রদ্ধা করছে কেন লোকটা?

'বুঝলে?' বলে উঠল বুড়ো। 'এবার ভাগ্য খুলে যাবে আমাদের। ব্যাটা দেশ সুদ্ধ সবাইকে দান-খয়রাত করে বেড়ায়। সাধু সেজেছে। এইবার পেয়েছি তোমাকে! সন্ধেবেলা আমাকে টাকা দিতে আসবে ও, তখনই ধরব বুঝলে? ওই সময় বাড়ি থাকবে ফাঁকা, পাশের রূমের ছেলেটাও থাকবে না, সুবিধেই হবে। এই ঘরে আটকাব দানবীর বাবাজীকে। হয় আমার দাবিমত টাকা দেবে, নয়তো নিজহাতে ওকে খুন করব আজ আমি।'

আঁতকে উঠল মারিয়াস, সর্বনাশ! এ কি বলছে জনদ্রেত! ও ঠিক শুনেছে তো? মঁসিয়ে লেব্লাঁকে খুন করতে চাইছে এই বুড়ো! জনদ্রেত আসলে কে? ছদ্মবেশী ডাকাত-টাকাত নয়তো? লোকটা আবার কথা বলে উঠতে কান খাড়া করল মারিয়াস। হাত পা অল্প অল্প কাঁপছে তার।

'আমি এখনই বেরুচ্ছি,' বলল জনদ্রেত। খুন খারাপীতে ওস্তাদ লোক জোগাড় করতে হবে বেছে বেছে। তাদের সাথে কথাবার্তা সেরে তবে ফিরব। দেরি করলে এমন সুযোগ আর হয়তো পাব না জীবনে। বুঝলে? আমি চললাম।'

বেরিয়ে গেল জনদ্রেত। দূরের সেইন্ট মেদার্দ গির্জার ঘড়িতে তখনই একটার ঘণ্টা পড়ল।

নেমে পড়ল মারিয়াস। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। এখনও বিশ্বাস হতে চাইছে না জনদ্রেতের কথা। সত্যিই তেমন কোন অঘটন ঘটিয়ে বসবে। ও লোক? কি করবে এখন সে? মঁসিয়ে লেব্লাঁর ঠিকানা জানা থাকলে এক্ষুণি গিয়ে তাকে সতর্ক করে দিয়ে আসতে পারত। কিন্তু... পুলিশকে জানালে কেমন হয়? চট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মারিয়াস, হ্যাঁ, সেটাই ঠিক হবে। সেই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ল ও।

সবচেয়ে কাছের থানায় এসে হাজির হলো। ঢ্যাঙামত এক ইন্সপেক্টর মন দিয়ে শুনল ওর বক্তব্য। লম্বা, কাঁচাপাকা চওড়া জুলফি লোকটার। চৌকো মুখ। দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। সব মিলিয়ে ভয় জাগানো চেহারা তার। সব শুনে নিচু কণ্ঠে মারিয়াসকে কী সব বোঝাল অফিসার, একটা খুদে পিস্তল গুঁজে দিল ওর হাতে। প্রায় এক ঘণ্টা অফিসারের সাথে কাটাল মারিয়াস, তারপর বেরিয়ে এল থানা থেকে। নিশ্চিন্ত। পা টিপে ঘরে ঢুকল সে। কারও চোখে পড়ল না ওর ফিরে আসা।

শুয়ে-বসে অস্থির সময় কাটাল মারিয়াস। তারপর সাড়ে পাঁচটায় উঠে পড়ল টেবিলে, সময় হয়েছে। বুক কাঁপলেও পিস্তলটা সাহস জোগাল ওকে। উঁকি দিল মারিয়াস। একটা মোমবাতি জ্বলছে ও ঘরে। তাতে অন্ধকার তেমন দূর হয়নি, মোটামুটি দেখা যায় ঘরটা। দরজার পাশে খানিকটা দড়ি পড়ে থাকতে দেখল মারিয়াস, সকালে ছিল না জিনিসটা। ওদিকে মেয়েদের ঘর থেকে বের করে দিল জনদ্রেত। বলল, বাইরে গিয়ে পাহারা দাও তোমরা। আমার পুরনো বন্ধুরা ছাড়া আর কাউকে এ বাড়ির দিকে আসতে দেখলে সাথে সাথে জানাবে আমাকে।

'এই ঠাণ্ডায় বাইরে যাব?' মৃদু কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল বড় মেয়েটি। 'বাইরে খুব বরফ পড়ছে, খালি পায়ে...'।

কাল থেকে আর খালি পায়ে ঘরের বাইরে যেতে হবে না তোমাদের, বলল জনদ্রেত। সবাইকে জুতো কিনে দেব কাল। এখন যাও। কড়া নজর রাখবে।

বেরিয়ে গেল মেয়েরা। কয়েক মিনিট নীরবে পাইপ টানল বৃদ্ধ। তারপর নিচু গলায় স্ত্রীর সাথে কথা বলতে লাগল, কিছু শুনতে পেল না মারিয়াস। স্বামীর প্রতি কথায় মাথা দোলাতে দেখল কেবল মহিলাকে। দেখতে দেখতে বিকট চেহারাটা কুৎসিত হয়ে উঠল তার। দু'চোখ জ্বলতে লাগল হায়েনার মত। এক সময় ছয়টার ঘন্টা পড়ল গির্জার ঘড়িতে, আওয়াজটা কেমন যেন বিষন্ন শোনাল

মারিয়াসের কানে। শেষ ঘন্টাধ্বনির রেশ তখনও পুরো মিলিয়ে যেতে পারেনি, মৃদু নকের আওয়াজ উঠল জনদ্রেতের দরজায়। তড়াক করে আসন ছাড়ল জনদ্রেত, ছুটে গিয়ে দরজা খুলল। মঁসিয়ে লেব্লাঁকে দেখল মারিয়াস। গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সে তাকে একা দেখে। মেয়েটি আসেনি।

ওদিকে মহাব্যস্ত হয়ে উঠেছে তখন জনদ্রেত। আসুন, মঁসিয়ে! আসুন, গরীবের ঘরে দয়া করে আরেকবার পায়ের ধুলো দিন। একমাত্র চেয়ারটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিল সে। বসুন, বসুন।

মানুষটা কত বড় শঠ, কত বড় ধড়িবাজ, ভেবে বিস্মিত হলো মারিয়াস। মঁসিয়ের উদ্দেশে ওদিকে বিনয়ের হাসি দিল জনদ্রেত পত্নী, আবছা আলোছায়ায় সেটাকে পেত্নীর দাঁত ভেঙচানোর মত লাগল মারিয়াসের চোখে। লেব্লাঁর দিকে তাকাল সে। জনদ্রেতের অনুরোধ এড়াতে না পেরে বসলেন তিনি। পনেরো ফ্রাঁ মুদ্রামানের চারটা লুই রাখলেন টেবিলে। 'এই আপনার বাড়ী ভাড়ার টাকা, ষাট ফ্রাঁ। পরে দেখব আপনার জন্যে আর কি করা যায়।'

ওগুলো দ্রুত পকেটে পুরল জনদ্রেত। কৃতার্থ হাসি দিয়ে বলল, সত্যিই আপনি মহানুভব। স্পষ্ট টের পেল মারিয়াস, বিনয় প্রকাশ নয়, লোকটা ব্যঙ্গ করল মঁসিয়ে লেব্লাঁকে। এ-ও বুঝল, কথাটা যাকে উদ্দেশ করে বলা, তিনিও ঠিকই বুঝেছেন তা। হঠাৎ দরজার কাছে একটা নাড়াচাড়া টের পেয়ে তাকাল মারিয়াস। নিঃশব্দে কে যেন ঢুকল জনদ্রেতের ঘরে। সারামুখে ভূতের মত কালি মেখে এসেছে লোকটা। ওপরে শুধু উলের ওয়েস্ট কোট পরেছে সে, থোক থোক পেশীবহুল বাহ বেরিয়ে আছে। তাগড়া জোয়ান লোকটা, বডি বিল্ডার। যেমন ঢুকেছে, তেমনি নিঃশব্দেই দরজার কাছের খাটিয়ায় বসে পড়ল সে, জনদ্রেত পত্নীর বিশালবপুর আড়ালে। আবছা আলোয় তাকে প্রায় দেখাই যায় না।

কিন্তু তাজ্জব হয়ে দেখল মারিয়াস, আগন্তুক নিজের আগমণ গোপন রাখতে পারেনি। সহজাত প্রবৃত্তি বা আর যে কারণেই হোক, সে যে মুহূর্তে তাকিয়েছে, একই মুহূর্তে মঁসিয়ে লেব্লাঁও ঘুরে তাকালেন দরজার দিকে, দেখে ফেললেন তাকে। 'কে লোকটা?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন তিনি।

'কে, ওহ! ওই লোক?' বলল জনদ্রেত। ও আমার প্রতিবেশী, মঁসিয়ে, ওর দিকে নজর দেয়ার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, তারপর, মঁসিয়ে...।

এবারও মারিয়াসের সাথে একই মুহূর্তে দরজার দিকে তাকালেন লেব্লাঁ। এক এক করে আরও তিন বডি বিল্ডার ঢুকল ঘরে। একই রকম পোশাক সবার পরনে, সারামুখে কালি মাখা। দরজার কাছে বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকল তারা। কোনদিকে নজর নেই, সামনের দেয়াল দেখছে। ভাব দেখে মনে হয়, এ ঘরে আরও যে মানুষ আছে, জানেই না। 'এরাও প্রতিবেশী,' দ্রুত অতিথিকে আশ্বস্ত করতে চাইল জনদ্রেত। 'চিমনি মিস্ত্রি এরা সবাই, সে জন্যে এমন ভূতের মত চেহারা হয়েছে। সে যাক, মঁসিয়ে, ওদিকে নজর দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আমি বলছিলাম, মঁসিয়ে...।'

'কি বলছিলেন?' ঘুরে তাকালেন লেব্লাঁ। বুঝল মারিয়াস, দেহের প্রতিটি পেশী টান টান হয়ে আছে তার, বিপদের গন্ধ ঠিকই পেয়েছেন মঁসিয়ে...।

'বলছিলাম, আপনার মানিব্যাগটা সঙ্গে আছে? এক হাজার ক্রাউন পেলে গরীব খুব উপকৃত হত।'

চট করে আসন ছাড়লেন লেব্লাঁ, দ্রুত কয়েক পা পিছিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন। ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকলেন জনদ্রেতের মুখের দিকে। ভেতরে উত্তেজনার আভাসমাত্র নেই। থাকলেও তার চেহারা দেখে টের পেল না কিছুই মারিয়াস। ওদিকে কৌতুকের চোখে তাকে দেখছে জনদ্রেত, মুখে বাঁকা হাসি। মঁসিয়ে বোধহয় এখনও চিনতে পারেননি আমাকে?

সেই মুহূর্তে দড়াম করে খুলে গেল ভেড়ানো দরজা। ঘরে ঢুকল আরও তিন বিশালদেহী। কালো কাগজের মুখোস পরে আছে এরা। একজনের হাতে প্রকাণ্ড এক মুগুর, আরেকজনের হাতে কসাইদের মাংস কাটার কুড়াল, শেষের জনের হাতে আছে লাঠির মত লম্বা এক চাবি। জেলখানার তালার চাবি, খুব বড় আর ভারী হয় এগুলো। নীরবে লোকগুলোকে দেখলে লেব্লাঁ। এদের অপেক্ষাতেই ছিল যেন জনদ্রেত, হাসি আরও বাড়ল তার। 'কি বলেন, চিনতে পারেননি?'

'না।'

ক্ষুধার্ত বাঘ শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে যেমন মুখভঙ্গি করে, তেমনি করল জনদ্রেত। 'আমি মন্তফারমেলের সেই হোটেল মালিক, থেনারদিয়ের। চিনেছেন?'

মুহূর্তের জন্যে কপাল কুঁচকে উঠেই সমান হয়ে গেল মঁসিয়ে লেব্লাঁর। 'না।'

জনদ্রেতের পরিচয় শুনে ওদিকে চোখ কপালে উঠে গেছে মারিয়াসের, কাঁপনি আরম্ভ হয়ে গেছে সারাদেহে। এ কি শুনল সে, এই লোক থেনারদিয়ের। সেই সার্জেন্ট! যে তার বাবার প্রাণ বাঁচিয়েছিল একদিন যুদ্ধক্ষেত্রে? যাকে শ্রদ্ধা জানাতে, সাহায্য করতে মারিয়াস ছুটে গেছে মন্তফারমেল পর্যন্ত? হঠাৎ মনে হলো তীক্ষ্ণধার এক অদৃশ্য তরবারি যেন কলজে এফোঁড় ওফোড় করে দিয়েছে তার।

এই চারটি বছর যে নাম পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে এসেছে মারিয়াস, যে অজ্ঞাত উপকারী মানুষটিকে অন্তরের সবচেয়ে উঁচু আসনটিতে বসিয়ে রেখেছিল, এই নোংরা, নীচ মানুষটা সেই থেনারদিয়ের? এই জঘন্য মিথ্যুক, লোভীটা? এই ডাকাতটা ওয়াটারলুর সেই 'বীর' থেনারদিয়ের?

'হাহ! চেননি, না? আমি কিন্তু সকালে প্রথম দেখামাত্রই চিনেছি তোমাকে, মঁসিয়ে দাতাকর্ণ! মঁসিয়ে ছেড়া কাপড় পরা মিলিয়নেয়ার। আঠারোশো তেইশের বড়দিনের সন্ধের সময় তুমি আমার হোটেলে গিয়েছিলে, রাতটা থেকে পরদিন আসার সময় ফাঁতিনের মেয়েটিকে ধোকা দিয়ে নিয়ে এলে, মনে নেই?'

'আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না আমি, মঁসিয়ে,' শান্ত কণ্ঠে, বললেন লেব্লাঁ। মনে হচ্ছে মানুষ চিনতে ভুল করেছেন আপনি।

'চালাকির চেষ্টা কোরো না, লাভ হবে না। যা বললাম, তাই করো। দিয়ে দাও এক হাজার ক্রাউন। খুশিমনে ছেড়ে দেব তোমাকে। না দিলে এ ঘর থেকে জ্যান্ত বের হতে পারবে না তুমি।'

রুখে দাঁড়ালেন লেব্লাঁ। 'ভয় দেখিয়ো না। তোমাকে আর তোমার ভাড়া করা ডাকাতদের মোটেই ভয় করি না আমি। খুন করবে? করো, ঘাবড়াই না। নিজের প্রাণের খুব একটা মূল্য আছে বলে মনে করি না আমি। দেখবে? দেখতে চাও?' কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগে এক লাফে ফায়ারপ্লেসের সামনে পৌঁছে গেলেন তিনি। আগুন খোচাখুঁচি করার জন্যে কাঠের হাতল লাগানো যে লোহার ছোট শাবল থাকে, আগুনের মধ্যেই পড়েছিল সেটা। পুড়ে টকটকে কমলা রঙের হয়ে গিয়েছিল ততক্ষণে। এক ঝটকায় সেটা তুলে নিলেন লেব্লাঁ, তারপর বাঁ হাতের আস্তিন তুলে ঠেসে ধরলেন হাতের ওপর।

চড় চড় কাঁচা চামড়া-মাংস পোড়ার শব্দ, আর দুর্গন্ধে মুহূর্তে ভরে উঠল ঘর। ওঘরে পেট মুচড়ে ঠেলে আসা বমি অনেক কষ্টে ঠেকাল মারিয়াস। এদিকে শিউরে উঠল বডি বিল্ডারের দল, থতমত খেয়ে বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে থাকল সবাই হাঁ করে। যন্ত্রণার তেমন আভাস দেখল না তারা লোকটার মুখে। থেনারদিয়েরের মুখের ভাব হয়েছে অবর্ণনীয়।

শাবলটা পিছনের খোলা জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিলেন লেব্লাঁ, তুষারের ওপর পড়ে ছ্যাৎ আওয়াজ তুলল ওটা। থেনারদিয়েরের দিকে ফিরে আগের মতই শান্ত কণ্ঠে বললেন তিনি, দেখলে তো? এখনও সন্দেহ আছে?

'বাঁধো ব্যাটাকে খাটের সাথে!' রেগেমেগে হুকুম দিল সে।

একযোগে কয়েক ষণ্ডা ঝাপিয়ে পড়ল লেব্লাঁর ঘাড়ে, মুহূর্তে শুইয়ে ফেলল তাকে খাটিয়ার ওপর। বাধা দেয়ার চেষ্টা কম করেননি বৃদ্ধ, কিন্তু একদল বডি বিল্ডারের সাথে পেরে উঠলেন না শেষ পর্যন্ত, বেঁধে ফেলল তাঁকে ওরা।

'এবার বলো, টাকা দেবে?'

'দেবে না!' চোখ রাঙাল থেনারদিয়ের।

'বলেছি তো, না।'

জানো, এই মুহূর্তে তোমাকে খুন করতে পারি আমি?

বসে আছ কেন তাহলে? করে ফেলো না!

'এত তেজ?' টেবিলের ড্রয়ার থেকে বড় একটা ধারাল ছুরি বের করে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল থেনারদিয়ের। দেখি তোমার কত সহ্যক্ষমতা।

সময় শেষ, বুঝল মারিয়াস, এক্ষুণি কিছু একটা করতে হবে। পিস্তল আকাশের দিকে তুলতে গিয়েও থেমে গেল সে কি ভেবে। ঝুঁকে পায়ের কাছে তাকাল। একটা খাতা খোলা পড়ে আছে ওর, থেনারদিয়েরের বড় মেয়ে যেটায় লিখেছিল আজ সকালে। জানালা গলে আসা চাঁদের আলোয় লেখাটা দেখল মারিয়াস। ঝট করে কাগজটা ছিড়ে দলা পাকাল, তারপর ফুটো দিয়ে ছুঁড়ে মারল ও ঘরে।

'কি যেন পড়ল ঘরের মধ্যে!' বিস্ময়ে চাপা কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল থেনারদিয়েরের পত্নী। ছুটে গিয়ে কাগজটা তুলে নিল।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল থেনারদিয়ের। 'কি ওটা? কোত্থেকে এল?'

'কোত্থেকে আবার, জানালা দিয়ে!' কাগজটা খুলে পড়ল মহিলা, পরক্ষণে সভয়ে আঁতকে উঠল। 'সর্বনাশ! দেখ, কি লিখেছে এপোনাইন।'

চোখ বড় করে স্ত্রীকে দেখছিল সে, খেঁকিয়ে উঠল, 'কি লিখেছে!'

লিখেছে "কুঠারধারীরা আসছে"।

মুহূর্তে হুলস্থুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল ঘরের মধ্যে। পিছনের জানালার দিকে ছুটল সবাই একযোগে, কে কার আগে পালাবে তাই নিয়ে ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ হয়ে গেল। পরক্ষণে পুরো গোর্বিও হাউস কেঁপে উঠল অসংখ্য বুট জুতোর ছুটে আসার শব্দে। বাইরে থেকে প্রচণ্ড এক লাথি খেয়ে খুলে গেল জনদ্রেতের দরজা, দলবল নিয়ে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ইন্সপেক্টর জ্যাভার। তাকে দেখে ও ঘরে স্বস্তির দম ছাড়ল মারিয়াস।

থেনারদিয়ের পত্নী নিজের বিশাল বপু ছোট জানালাটা দিয়ে ঠেসেটুসে ওপারে নেয়ার সংগ্রামে ব্যস্ত ছিল সে সময়ে, উদ্যত অস্ত্র হাতে অসংখ্য ইউনিফর্ম দেখে থেমে গেল সে।

হাসল জ্যাভার। 'ওখানে এত কষ্ট না করে এই দরজা বেরুলেই তো হত!' পর মুহূর্তে স্বমূর্তি ধরে গর্জে উঠল সে, 'হাতকড়ি পরাও সবকটাকে!'

ঘরের চারদিকে নজর বোলাল জ্যাভার। বিছানায় হাত-পা বাঁধা এক ভদ্রলোকের ওপর চোখ পড়ল, যদিও অন্ধকার বলে চেহারা দেখা গেল তার। সে চেষ্টাও অবশ্য করল না জ্যাভার। অ্যাই! তোমরা কেউ একজন মঁসিয়ের বাধন খুলে দাও, তাড়াতাড়ি।

এক সেপাই খুলে দিল তাঁর বাঁধন। নিজের জায়গা ছেড়ে নড়েনি তখনও মারিয়াস, মঁসিয়ে লেব্লাঁকে উঠে বসতে দেখল সে। মাথা নিচু করে বসে থাকতে দেখল। ওদিকে অন্যদের বাঁধাছাদার কাজ শেষ হতে পকেট থেকে কাগজ বের করে টেবিলে এসে বসল জ্যাভার, এজাহার লিখতে শুরু করল। গৎ বাধা প্রথম কয়েকটা লাইন লিখল সে, তারপর মুখ না তুলেই বলল, কই, সেই মঁসিয়ে কোথায়? নিয়ে এসো তাঁকে।

ঘরের সবাই তাজ্জব হয়ে গেল কোথাও লোকটিকে না দেখে। অথচ সবার চোখের সামনে এতক্ষণ বসে ছিল মানুষটা খাটিয়ার ওপর। কোথাও নেই সে, যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। পরে বোঝা গেল, দরজায় পাহারা ছিল, কাজেই ওই দিক দিয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না তার। জানালা দিয়ে সটকে পড়েছেন তিনি। নিজেদের সুবিধের জন্যে জানালার বাইরে আগেই একটা দড়ির মই বেঁধে রেখেছিল জনদ্রেত, ওটা বেয়ে নেমে গেছেন।

ঘরে এতগুলো মানুষ, কেউ কিচ্ছুটি টের পায়নি। ওদিকে পাশের রূমের সেই উকিল ছেলেটিরও হদিস পেল না ইন্সপেক্টর জ্যাভার। সে-ও নেই।

দশ

ওই ঘটনার পর দুই মাস কেটে গেছে। গোর্বিও হাউস ছেড়ে পরদিনই চলে এসেছে মারিয়াস, থাকে অন্য এক জায়গায়। সেদিনের পর না মঁসিয়ে লেব্লাঁ, না লেনোয়ের, কারও কোন সন্ধানই নেই। মেয়েটির খোঁজ পাওয়ার যে একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, সেদিনের বিশৃঙ্খল ঘটনার পর হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে তা। ডাকাতদল আর থেনারদিয়ের দম্পতির সাথে তাদের দুই মেয়েকেও জেলে পুরেছিল ইন্সপেক্টর জ্যাভার।

ওদিকে এই অবস্থা, আরেকদিকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও খুব খারাপ। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্রমেই প্রবল হচ্ছে জনমত, যে কোন মুহূর্তে বড় ধরনের গোলযোগ বেধে যেতে পারে। বিপ্লবের চিন্তা ছাড়া আর সবই যেন গৌণ এখন মানুষের কাছে। ফলে কাজ কমে গেছে মারিয়াসের, প্রচণ্ড টানাটানির মধ্যে চলছে দিন। চারদিকে অন্ধকার দেখছে সে, মন ভীষণ খারাপ। তারওপর সারাক্ষণ সেই মেয়েটির চেহারা চোখের সামনে ভাসে, অথচ কোন খোঁজ নেই তার। পেতে পেতেও পেল না সে লেনোয়েরকে, সেই দুঃখে মন ভারাক্রান্ত। কিছুই আর ভাল লাগে না মারিয়াসের।

এই সময় একদিন সকালে পিছন থেকে পরিচিত এক কণ্ঠ ডেকে উঠল তার নাম ধরে। থমকে ঘুরে তাকাল মারিয়াস। থেনারদিয়েরের বড় মেয়েটি। মুখে তার হারানো মানিক ফিরে পাওয়ার হাসি। 'শেষ পর্যন্ত পেলাম তাহলে আপনাকে! ওহ্, কত যে খুঁজেছি! দুই সপ্তা জেলে ছিলাম, তারপর ছেড়ে দিল ওরা আমাকে অল্পবয়সী দেখে। দেড় মাস ধরে কি খোঁজাই না খুঁজেছি আপনাকে। এখন কোথায় আছেন আপনি, মঁসিয়ে? বাসা কোথায়?'

উত্তর দিল না মারিয়াস।

'আপনার শার্ট ফুটো হয়ে গেছে। আমি সেলাই করে দেব, মঁসিয়ে?' এবারও ও কিছু বলল না দেখে মখ কালো হয়ে গেল এপোনাইনের। আমাকে দেখে খুশি হননি? আপনার মুখটা শুকনো লাগছে। কিনুত আমি আপনাকে সুখী দেখতে চাই। মঁসিয়ে, মনে আছে, আপনি কথা দিয়েছিলেন সেই মাদামোয়াজেলের ঠিকানা বের করতে পারলে যা চাইব তাই দেবেন?

নিকষ আঁধারে খানিকটা আলোর আভাস দেখল মারিয়াস। 'পেয়েছ ঠিকানাটা?'

ওর চেহারায় খুশির আলো দেখে মৃদু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেয়েটি। হ্যাঁ।

খপ করে তার হাত চেপে ধরল মারিয়াস। কোথায়! চলো, দেখিয়ে দাও বাসাটা।

'চলুন। আমি আগে থাকি, আপনি পিছন পিছন আসুন। আমার মত এক মেয়ের বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়া ঠিক হবে না আপনার।'

রু ডি লা উয়েস্টের বাড়িতে থাকে তখন জাঁ ভালজাঁ। দূর থেকে মারিয়াসকে বাড়িটা দেখিয়ে দিল এপোনাইন।

ওদিকে কোজেত দেখতে আরও সুন্দরী হয়েছে এর মধ্যে। পরিপূর্ণ যুবতী সে এখন। যত দিন যায়, ততই ওকে হারাবার ভয় আচ্ছন্ন করে ফেলে জাঁ ভালজাঁকে। অবশ্য অনেকদিন ধরে সেই ছেলেটির কোন খোঁজ নেই দেখে মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছে সে, তাকে খসিয়ে দেয়া গেছে ভেবে ভালজাঁ খুশি। মারিয়াসকে অসহ্য লাগে তার। সে জানে ছেলেটা তার মেয়েকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল। ভালজাঁ যদি টের পেয়ে বাসা বদল না করত, এতদিনে নিশ্চয়ই অঘটন একটা ঘটে যেত।

লক্ষ করেছে ভালজাঁ, প্রথমদিকে ছেলেটা পার্কে আসত পুরনো কাপড়-কোট পরে। তাও একটাই সেট ছিল তখন সম্ভবত। তারপর হঠাৎ করেই নতুন নতুন কাপড় পরে আসতে শুরু করল। একেবারে সেজেগুজে ফুল বাবু হয়ে। কিছুদিন যেতে না যেতে কোজেতের মধ্যেও দেখা গেছে একই পরিবর্তন। আগে নিজের ড্রেস সম্পর্কে খুব একটা বাছ-বিচার ছিল না ওর। হঠাৎ বদলে গেল হাওয়া, পার্কে যাওয়ার আগে সাজগোজ করা, নিত্য নতুন ড্রেস, কোট, জুতো ইত্যাদির দিকে ঝুঁকে পড়ল কোজেতে। অর্থাৎ ফুল বাবুটি তার নজর কেড়েছিল ভাল করেই। একটা কিছু না করে উপায় ছিল না ভালজাঁর। কারণ কোজেত ছাড়া পৃথিবীতে তার আছেই বা কি?

তার আকস্মিক বাসা বদল নিয়ে একটা কথাও বলেনি কোজেত, প্রশ্ন তোলা তো পরের কথা। চুপ করেই ছিল। ছেলেটার থাবা থেকে মেয়েকে রক্ষা করা গেছে ভেবে সন্তুষ্ট হলো জাঁ ভালজাঁ। বুঝতে পারেনি কোজেত ততদিনে মনেপ্রাণে ভালবেসে ফেলেছে মারিয়াসকে। বোঝার কথাও নয়, প্রেম কাকে বলে সে কি তা জানত? জানা-বোঝার সেই সুযোগ তো আসেইনি জাঁ ভালজাঁর জীবনে। তবে এটা ঠিকই সে লক্ষ করেছে, দিন দিন গভীর হয়ে যাচ্ছে তার হাসি-খুশি, ছেলেমানুষ কোজেত। একদিন সস্নেহে তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করুল ভাল, লুক্সেমবার্গ যাবে?

কোজেতের বিষন্ন মুখে আলো ফুটল! 'যাব।'

তাকে নিয়ে পার্কে এল ভালজাঁ। এরমধ্যে তিন মাস কেটে গেছে। আরও আগেই সেখানে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে মারিয়াস। খুশিমনেই এসেছিল কোজেত, কিন্তু স্বপ্নের রাজকুমারটিকে না দেখে মন ফের খারাপ হয়ে গেল।

পরদিন আবার জানতে চাইল ভালজাঁ, 'পার্কে যাবে?'

নীরবে মাথা দুলিয়েছে কোজেতে। না, বাবা।

তার কষ্ট বুঝল জাঁ ভালজাঁ, দুঃখ পেল মনে। বাবার মনের কথা টের পেয়ে ধীরে ধীরে সহজ-স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল কোজেত। মনে যা-ই থাক, অন্তত ভালজাঁর সামনে সে আগের মতই হাসিখুশি থাকার কঠিন যুদ্ধে লিপ্ত হলো। প্রায়ই ভালজাঁর সাথে বিকেলে হাঁটতে বের হয় কোজেত, যতক্ষণ বাইরে থাকে, প্রতিমুহূর্ত মারিয়াসকে খোঁজে মনে মনে। সময় যত গড়ায়, বিচ্ছেদ ব্যথা সয়ে আসে একটু একটু করে। প্রথম দিকে ছেলেটিকে দেখার যে ছটফটানি ছিল, তার বেগ কমে আসে। তবে তার প্রতি কোজেতের ভালবাসা গভীর হতে থাকে ক্রমেই। এক সময় এমন হলো, মারিয়াসকে সে দেখে না, কোথায় আছে সে তাও জানে না, তবু নিজের প্রতি নিঃশ্বাসে তাকে অনুভব করতে অভ্যস্ত হয়ে গেল কোজেত। নিজের প্রতি হৃদস্পন্দনের সাথে কল্পনায় মারিয়াসের হাদস্পন্দন এক করে নিজেকে বিলীন করে দিল সে তার ধ্যানে। কোজেতের দৃঢ় বিশ্বাস, একদিন না একদিন তার দেখা সে পাবেই।

এই সময় এক রবিবার শহরতলির সেই বাড়িতে গেল বাপ-মেয়ে। সেদিনই রাতে বাঁ হাতে দগদগে পোড় ঘা নিয়ে বাসায় ফিরল জাঁ ভালজাঁ। যদিও মেজাজ স্বাভাবিক। কি ঘটেছে জানাল না সে কোজেতকে। কোজেত ডাক্তার ডাকতে চাইল, তাও দিল না। বাধ্য হয়ে ওকেই করতে হলে যা করার। নিয়মিত ওষুধ লাগানো, ড্রেসিং করা ইত্যাদি চালিয়ে গেল কোজেত। সারাক্ষণ বাবার কাছে থাকে সে, দিনে দুবার করে ড্রেসিং বদল করে, মাথার কাছে বসে তাকে বই পড়ে শোনায়। প্রায় এক মাস ভুগল জাঁ ভালজাঁ। সে যখন আরোগ্যের পথে, তখন বিকেলে প্রায়ই কোজেতকে বাড়ির পিছনের বাগানে বেড়িয়ে আসতে পাঠাত সে। রু পুলমেটের বাড়ির বাগানের মত বড় নয় এ বাড়ির বাগান, তবে একেবারে ছোটও নয়। তখন বসন্ত, প্রচুর ফুল ফুটেছে বাগানে। হেঁটে বেড়াতে ভালই লাগে কোজেতের।

ব্যাপারটা এক সময় অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেল। এখন আর ভালজাঁর সাথে রাস্তায় হাঁটতে ভাল লাগে না কোজেতের, একা একা হাঁটে সে বাগানে, নিভৃতে বসে মারিয়াসের কথা ভাবে। জাঁ ভালজাঁ একা হাঁটতে বের হয়। এই সময় এপোনাইনের সাহায্যে ওদের নতুন আবাসের খোঁজ পেল মারিয়াস। একদিন বাগানে পায়চারি করার সময় একটা পাথর চাপা দেয়া কাগজের ওপর চোখ পড়ল কোজেতের। অবাক হলো সে, এটা কোত্থেকে এল! ওটা তুলে বুঝল কোজেত, একটা চিঠি। পড়ল ও।

চিঠির ভাষা, বক্তব্য পড়ে বুঝে ফেলল এ নিশ্চয়ই তার সেই স্বপ্নপুরুষের লেখা চিঠি। তাকেই লিখেছে সে। এবং সে কোথায় আছে জানা হয়ে গেছে তার। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল কোজেত। ওই চিঠির স্পর্শে এক অনির্বচনীয় সুখ অনুভব করল। দৌড়ে নিজের রূমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল কোজেত, বার বার পড়তে লাগল চিঠিটা, তবু আশ মেটে না। অন্তরের প্রায় বুজে আসা প্রেমের স্বর্গ দুয়ার মেলে দিল কোজেতের।

সন্ধের আগে হাঁটতে চলে গেল জাঁ ভালজাঁ পরদিন। কোজেত এদিকে ঘরে বসে মনের মত করে সাজল, তারপর নেমে এল বাগানে। আজ সে আসবে, লিখেছে চিঠিতে। এল মারিয়াস। তাকে

ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে দেখে অজানা এক শিহরণ বয়ে গেল কোজেতের সর্বাঙ্গে, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাওয়ার অবস্থা হলো। তাড়াতাড়ি একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ও। তবে নজর এড়াল না তার, আগের সেই চেহারা নেই ছেলেটির। মুখ শুকনো, পরনের কাপড়-চোপড় মলিন। চোখের দৃষ্টি কেমন নিষ্প্রভ।

'এখানে এসে যদি অপরাধ করে থাকি,' গাছের পাতার মর্মরধ্বনির মত মৃদু, অনুচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল ছেলেটি। ক্ষমা করে দিয়ো। এক বছরের মত হতে চলল তোমাকে দেখি না। অনেক লম্বা সময়। তোমাকে না দেখে কলজে ফেটে মরতে বসেছি আমি। তুমি আমার স্বর্গের দেবী। আমি এসেছি বলে তুমি অসন্তুষ্ট হওনি তো? আমি জানি আর বেশিদিন বাঁচব না আমি। তোমাকে বিরক্ত করছি না তো? যদি তেমন...

'মা গো!' বলে প্রায় কঁকিয়ে উঠল কোজেতে।

মারিয়াসের হাত চট করে ধরে ফেলল তাকে, নইলে পড়েই যেত সে। নিজেকে ফিরে পেতে অনেক সময় লাগল কোজেতের। বড় এক পাথরের ওপর হাতে হাত ধরে বসে থাকল ওরা অনেকক্ষণ। মুখে তেমন কথা হলো না, তারপরও অন্তরের সব কথা বলা এবং শোনা কোনটাই বাকি রইল না কারও। এক সময় কোজেতের খেয়াল হলো, ছেলেটির নামই জানা হয়নি তার।

'তোমার নাম কি?'

মারিয়াস। তোমার নাম?

'কোজেত।'

দেখতে দেখতে দেড় মাস কেটে গেল। রোজই আসে মারিয়াস, অধীর হয়ে ওর অপেক্ষায় থাকে কোজেত। যখন সে আসে, জাঁ ভালজাঁ থাকে বাইরে, বৃদ্ধা পরিচারিকা তুসোঁ ব্যস্ত থাকে রান্নাঘরে। বাগানের এমন এক জায়গায় বসে ওরা, যেখানটা রাস্তা থেকে দেখা যায় না। কেউ শুনতেও পায় না ওদের নিচু কণ্ঠের আলাপ। একদিন সন্ধেয় কোজেতের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে মারিয়াস, এই সময় পথে এপোনাইনের মুখোমুখি পড়ে গেল। বেশ একটু বিরক্তই হলো সে মেয়েটিকে দেখে। কথা বলল না তেমন। মন জুড়ে তখন ওর কেবলই কোজেত আর কোজেত, তার কাছে যাওয়ার তাড়া। দুঃখ পেল এপোনাইন, মনে মনে একটা ফন্দী আঁটল।

পরদিন কোজেতের চেহারা দেখেই মারিয়াস বুঝল, কিছু একটা গণ্ডগোল ঘটে গেছে। ওর অনিন্দ্য সুন্দর মুখে কালো মেঘ দেখে বুকের মধ্যে শঙ্কার কাপন উঠল তার। 'কি হয়েছে?'

'আজ সকালে বাবা আমাকে জিনিসপত্র গোছগাছ করে রাখতে বলেছেন। কি এক জরুরী কাজ পড়েছে বাবার ইংল্যাণ্ডে, খুব শিগগিরি যেতে হবে আমাদের।'

আকাশ ভেঙে পড়ল মারিয়াসের মাথায়। সর্বনাশ! বিড় বিড় করে বলল সে, তারপর নীরব হয়ে গেল।

'ভেঙে পড়ছ কেন? হাসি মুখে বলল কোজেতে। যেখানেই যাই, চিঠি লিখে জানাৰ আমি তোমাকে। তুমি চলে আসবে।

'পাগল হয়েছ তুমি!' আঁতকে উঠল কঠিন বাস্তবের পোড় খাওয়া মারিয়াস। 'তুমি জানালেই ইংল্যাণ্ড চলে আসব? তুমি জানো না ওদেশে যেতে, পাসপোর্ট করতে কত টাকা লাগে? আমার পোশাকের চেহারা তুমি দেখতে পাও না, কারণ আমি রাতে আসি। কোজেত, তুমি জানো না কত কষ্টে দিন কাটে আমার। কত অভাবী আমি। যদি দিনের বেলা কখনও চোখে পড়ে যাই, তোমার, কাপড়-চোপড়ের হাল দেখে হয়তো দুএক সাউ ভিক্ষেই দিয়ে বসবে আমাকে চিনতে না পেরে।' গড় গড় করে আরও অনেক কিছু বলে থামল মারিয়াস ক্লান্ত হয়ে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল ওরা। এক সময় কোজেত কাঁদছে টের পেয়ে ওর এক হাত ধরল মারিয়াস। 'কোজেত তুমি চলে গেলে আমি মরে যাব। সত্যি বলছি, তোমাকে ছাড়া বাচব না আমি।'

সেদিন বিদায় নেয়ার আগে মারিয়াস বলল, কাল আমি আসব না।

কেন? অবাক হলো কোজেতে।

জরুরী কাজ আছে। পরও আসব, ঠিক নটায়।

যাওয়ার আগে কোজেতকে বলল মারিয়াস, তুমি তো আমার ঠিকানা জানো না। লিখে রেখে

যাচ্ছি আমি, যদি কখনও কোন জরুরী দরকার পড়ে, যোগাযোগ করতে পারবে। সাথে কাগজ-কলম নেই, তাই পেরেক দিয়ে বাগানের একটা গাছের গা আঁচড়ে ঠিকানাটা লিখল মারিয়াসঃ ১৬ রু দে লা ভেরেরি।

পরদিন সকালে পাঁচ বছর পর আবার নানার বাসায় এল মারিয়াস। ওকে দেখে প্রথমে চমকে উঠলেন জিলেননরমঁদ, পরক্ষণে পুরনো ক্ষোভ অভিমান উথলে উঠল তার। 'বিয়ে!' হাঁ হয়ে গেলেন বৃদ্ধ ওর আসার কারণ শুনে। 'হতভাগা নচ্ছার! এত বছর পর যা-ও বা বাড়ি এল, এসেই ধরেছে বিয়ের বায়না? মাত্র একুশ বছর বয়সে? হবে না, মত দেব না আমি।'

তারপর কতক্ষণ দেখলেন ওকে। হতভাগা পরে আছে কি দেখেছ। দেখ মাথার টুপির ছিরি! ডাকাতের মত লাগছে। তো ঠিক আছে, বিয়ে কর দরকার কি? মেয়েটিকে যদি এতই পছন্দ হয়ে থাকে, রক্ষিতা করে নিলেই তো হয়।

রাগে অন্ধ হয়ে গেল মারিয়াস। হতাশা আর ব্যর্থতা মিলে মাথা বিগড়ে দিয়েছে তার। থমথমে গলায় বলল, 'পাঁচ বছর আগে আপনি আমার মৃত বাবাকে অপমান করেছেন। আজ অপমান করলেন আমি যাকে মনেপ্রাণে ভালবাসি, যাকে বিয়ে করতে চাই, তাকে। ঠিক আছে, থাকুন আপনি আপনার দম্ভ নিয়ে। আমি যাচ্ছি।'

হাঁ করে ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকলেন হতভম্ব জিলেনরমঁদ। সংবিৎ যখন ফিরল, হাঁকডাক করে বাড়ি মাথায় করলেন তিনি। লোকজন ব্যস্ত হয়ে ছুটল মারিয়াসের খোঁজে, ওর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে গলা ভেঙে ফেললেন বৃদ্ধ বুর্জোয়া, কিন্তু শুনল না মারিয়াস। চলে গেল।

সারাদিন উদভ্রান্তের মত সারা প্যারিস চষে বেড়াল ও। পুরো শহর থম থম করছে। পথঘাট ফাঁকা। পথে পথে ব্যারিকেড বসিয়েছে বিপ্লবীরা, গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মোড়ে তাদের মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে পুলিশ, মিউনিসিপ্যাল গার্ড, ন্যাশনাল গার্ড প্রভৃতি, যে কোন মুহূর্তে বেধে যাবে দক্ষযজ্ঞ। দিনটা কেবলই টো টো করে বেড়াল মারিয়াস। তারপরের দিনটাও। রাতে কোজেতের সাথে দেখা করতে যাওয়ার কথা আছে। কখন ন'টা বাজবে, সেই আশায় থাকল সে। কিন্তু সময়মত গিয়ে পেল না সে ওদের। বাড়ি অন্ধকার। চলে গেছে ওরা আবার।

ওদিকে, পরদিনই মারিয়াসের লেখা ঠিকানাটা চোখে পড়ে গেল জাঁ ভালজাঁর। দেখেই বুঝল সে, যে-ই লিখে থাকুক, অল্প কয়েক ঘন্টা আগে লিখেছে। কষ ঝরছে তখনও, আঁচড়ের নিচে গাছের গা তখনও একদম সাদা। দুর্ভাবনায় পড়ে গেল ভালজাঁ। কে করল এ কাজ? কে ঢুকেছে তার বাগানে? এটা কি কোন ঠিকানা? কোন বিপদের সূচনা সঙ্কেত? মনে পড়ল, কয়েকদিন আগে সান্ধ্যভ্রমণের সময়ে দূর থেকে থেনারদিয়েরকে দেখেছে জাঁ ভালজাঁ। সে যদিও দেখতে পায়নি তাকে। বন্দী হওয়ার কিছুদিন পর সে যে লা ফোর্স জেল থেকে পালিয়েছে, সে খবর জানত ভালজাঁ।

এর পিছনে ওই লোকের হাত আছে ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠল জাঁ ভালজাঁ। এমনিতেই গত কিছুদিন ধরে আর কোথাও চলে যাওয়ার কথা ভাবছে সে, কোজেতকে বলেই রেখেছে তৈরি হয়ে থাকতে। কারণ প্যারিসের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন খুবই জটিল, উত্তপ্ত। পুলিশ আগের চাইতে বহুগুণ তৎপর। কে জানে কখন কাকে ধরতে গিয়ে ওরা তাকেই ধরে বসে, এবং ফাস হয়ে পড়ে ভালজাঁর গোপন অতীত! এক আশঙ্কার সাথে আরেক আশঙ্কা যোগ হওয়ায় ওইদিনই সিদ্ধান্ত নিল ভালজাঁ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশ ত্যাগ করবে সে।

সন্ধের খানিক আগে নির্জন এক জায়গায় বসে বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল জাঁ ভালজাঁ, এমন সময় এক খণ্ড কাগজ উড়ে এসে পড়ল তার সামনে। প্রথমে চমকে উঠল সে, পরক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। দূরে এক কিশোরকে দেখল সে কেবল, চ্যাম্প ডি মার্স-এর দিকে ছুটে পালাচ্ছে। গায়ে তার ধূসর জামা, পরনে কটন ভেলভেট ট্রাউজার। ধারেকাছে আর কেউই নেই, অতএব জাঁ ভালজাঁ বুঝল কাজটা তারই। পড়ে থাকা কাগজটা তুলে তাতে চোখ বোলাল সে। বড় করে লেখা আছে ওটায়ঃ সরে পড়ুন।

দ্রুত বাসায় ফিরে এল জাঁ ভালজাঁ। গোছগাছ মোটামুটি করাই ছিল। কোজেতকে সামনে দেখে

বলল সে, তৈরি হয়ে নাও। রাত একটু বাড়লেই এ বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে আমাদের।
‘কেন?’ আঁতকে উঠল মেয়েটি।
শহরে লড়াই বেধে গেছে। এ বাড়িতে থাকা এখন মোটেই নিরাপদ নয়।
কোথায় যাব আমরা, রু প্লুমেটের বাসায়?
‘না, হোমি আর্মি লেনের বাসায়। তাড়াতাড়ি করো।’
নিজের রুমে এসে অনেকক্ষণ বসে থাকল কোজেত। খবরটা কি করে মারিয়াসের কাছে পৌঁছানো যায় ভাবতে লাগল। আজ সে আসবে না কথাই আছে। তাহলে? বুদ্ধি পেয়ে গেল কোজেত। দ্রুত একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখল মারিয়াসের উদ্দেশে, ওটা খামে পুরে মুখ আটকাল, সেই ঠিকানাটা লিখল ওপরে। তারপর পাঁচ ফ্রাঁর একটা নোট নিয়ে সামনের রাস্তায় এসে দাঁড়াল। ভালজাঁ তার একটু আগে আবার বেরিয়েছে, কি নাকি জরুরী কাজ।
বাসার কাছেই অল্পবয়সী এক কিশোরকে ঘুর ঘুর করতে দেখে হাত ইশারায় তাকে ডাকল কোজেত। ধূসর রঙের জামা, আর কটন ভেলভেট প্যান্ট পরে আছে ছেলেটা। পা খালি। খাম আর টাকাটা তাকে দিয়ে বলল ও, এখনই গিয়ে এই চিঠিটা পোস্ট করে দাও। পয়সা যা বাচবে, সব তোমার।
খুশি হয়ে চলে গেল ছেলেটা। সেদিন ছিল ৪ জুন, ১৮৩২।
কোজেতদের বাসার বন্ধ গেটের সামনে স্থানুর মত বসে থাকল মারিয়াস। কি করবে, কোথায় যাবে বুঝে উঠতে পারছে না। মাথাও কাজ করছে না ঠিকমত। এক সময় ঠিক করল সে, কোজেতকে যখন আবারও হারাতে হলো, তখন আর বেঁচে থেকে লাভ কি? জীবনের সবক্ষেত্রেই ব্যর্থ সে, কাজেই তার মরে যাওয়াই উচিত।
ওদিকে শহরে তখন বেধে গেছে বহু প্রত্যাশিত লড়াই। তৈরিই ছিল বারুদের স্তূপ, প্রয়োজন ছিল শুধু স্ফুলিঙ্গের। ওইদিনই, ৫ তারিখ বিকেলে জেনারেল লামার্কের শবযাত্রা সেই স্ফুলিঙ্গের কাজ করল। সমগ্র প্যারিসে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল বিদ্রোহের আগুন। সময় যত গড়াচ্ছে, দু'পক্ষে হতাহতের সংখ্যা ততই বাড়ছে।
তখন ক'টা বাজে জানে না মারিয়াস, হঠাৎ কে যেন ডেকে উঠল ওর নাম ধারে। উঠে দাড়াল মারিয়াস। ‘কে?’।
‘মঁসিয়ে, রু দে লা সাঁভ্রেরির ব্যারিকেড়ে আপনার বন্ধুরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাড়াতাড়ি যান।’
কণ্ঠটা একেবারে অপরিচিত মনে হলো না মারিয়াসের। মনে হলো এপোনাইনের গলা ওটা। খানিক ইতস্তত করল ও, তারপর ছুটল সাঁভ্রেরির দিকে। তবে তাই হোক, ভাবল মারিয়াস, অন্তত দেশের সামান্য হলেও কাজে লাগুক তার মূল্যহীন প্রাণটা। আত্মোৎসর্গকারী বিপ্লবীদের দল কিছুটা তো ভারী হবে।
রাত বাড়ছে। লড়াইয়ের তেজে কিছুটা ভাটা পড়েছে। দূর থেকে থেমে থেমে ভেসে আসছে গাদাবন্দুকের আওয়াজ। মারদি গ্রাস-এ বিপ্লবীদের প্রকাণ্ড লাল পতাকা উড়ছে, তার গোড়ায় ব্যারিকেড। এখানকার নেতৃত্বে আছে এনজোলারস নামে মারিয়াসের এক বন্ধু। গাভারোচ নামের এক কিশোরকে খুঁজছে সে।
ছেলেটি ভীষণ চটপটে, চালাক-চতুর। ভবঘুরে। থেনারদিয়েরের ছেলে গাভরোচ। সংসারে প্রচণ্ড অভাব, সারাক্ষণ বাপ-মায়ের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, গালাগালি ইত্যাদি সহ্য না হওয়ায় বাসা ছেড়ে পথে নেমেছে সে কয়েক মাস আগে। টো টো করে ঘুরে বেড়ায় সারাদিন, ইচ্ছে হলে কখনও বাসায় যায়, না হলে যায় না। গাভরোচ জানে বাবা-মা ওকে মোটেই ভালবাসে না, তারা ভালবাসে এপোনাইন আর আজেলমাকে। কারণ বড় বোন রোজগার করে, রোজই কিছু না কিছু দিয়ে সাহায্য করে বাপকে। আজেলমাও খুব শিগগিরি যাবে ওই পথে। তাই ওরা আদর পায়, সে পায় না। সারাদিন গালমন্দ শুনতে হয়। সেই জন্যে ঘর ছেড়েছে গাভরোচ।
এখন ভারী ব্যস্ত সে। ব্যারিকেডে ব্যারিকেড়ে ঘুরে বেড়ায়, খবর আদান-প্রদান করে বিপ্লবীদের, ছেলেমানুষ বলে সরকারী বাহিনীর সদস্যরা কিছু বলে না ওকে। এনজোলারস যখন খুঁজছে ওকে,

সেই সময় বড় এক আবিষ্কার করে বসল গাভরোচ। কয়েকদিন আগে এক পুলিশ অফিসার পন্ট রয়্যালে খামকা কান টেনে দিয়েছিল তার, বিপ্লবীদের মাঝেই সাদা পোশাকে তাকে দেখে ফেলেছে সে। চিনেও ফেলেছে। এনজোলারসকে জানিয়ে দিল সে ব্যাপারটা।
'তুমি ঠিক জানো ও স্পাই? চোখ কুঁচকে লোকটাকে দেখল সে।

মাথা দোললি গাভরোচ। জানি। ঠিক জানি।

চার সঙ্গীসহ সোজা তার সামনে গিয়ে দাড়াল এনজোলারস। কঠিন চোখে দেখল তাকে। 'অ্যাই, তুমি কে?'

উত্তর দিল না লোকটা। তাকিয়ে থাকল প্রশ্নকারীর মুখের দিকে।

'টিকটিকি!' ঘৃণার সাথে বলল এনজোলারস।

'আমি একজন সরকারী অফিসার,' দৃঢ় স্বরে বলল এবার লোকটা।

কি নাম?

'জ্যাভার।'

মুহূর্তে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বিপ্লবীরা, বেঁধে ফেলল ঝটপট। বাধা দেয়ার কোন চেষ্টাই করল না জ্যাভার, একটা শব্দও বেরুল না তার মুখ থেকে। টেনেহিচড়ে কাছের এক বেজমেন্ট রূমে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। রুমটা এ মুহূর্তে বিপ্লবীদের কাজে লাগছে।

মারিয়াসকে মৃত্যুর উন্মাদনায় পেয়ে বসেছে। ছুটতে ছুটতে সাঁভ্রেরি এল সে প্রথমে, তারপর রু ডি বথিসি। প্রতিটি রাস্তায়, গলিতে প্রচুর মানুষ-বিপ্লবী, সরকারী বাহিনী। সবাই নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। পরিচিত কাউকে না দেখে এগোতেই থাকল মারিয়াস। বাজার ঘুরে আবার সাঁভ্রেরি ফিরে এল সে। এই সময় দূর থেকে এক সৈনিককে মাসকেট তুলতে দেখল মারিয়াস তাকেই লক্ষ্য করে। ওটা কাঁধে ঠেকিয়েই গুলি করল সৈনিক।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ছোটখাট দেখতে কে যেন লাফ দিয়ে সোজা হয়ে দাড়াল সৈনিকটির সামনে, হাত তুলে চেপে ধরল তার বন্দুকের নল। ব্যারিকেডের ওয়াক্স লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়েছে বাধা দানকারী। দৃশ্যটা দেখল মারিয়াস, কিন্তু মনজুড়ে তার অন্য চিন্তা, তাই খেয়াল করল না। দৌড়ে সেই বেজমেন্ট রূমে ঢুকে পড়ল ভেতরে এনজোলারসকে দেখে।

ওদিকে গুলির শব্দে উত্তেজিত হয়ে উঠল জনতা। ব্যারিকেডের ওপাশে সৈনিকদের অবস্থান লক্ষ্য করে অস্ত্র তুলল তারা। ওরাও প্রসুতত। এক এক করে কয়েক মিনিট কেটে গেল, কোন পক্ষই শেষ পর্যন্ত হামলা চালাল না, কমে এল এক সময় উত্তেজনা। ব্যারিকেডের দুদিকে বসে আছে দুই দল, এতই কাছাকাছি যে স্বাভাবিক গলায় এক দল কথা বলতে পারে অন্য দলের সাথে।

এক সময় দুই দল থেকেই নেতৃস্থানীয় কয়েকজন অবস্থান ছেড়ে উঠে পড়ল। নিজেদের এলাকায় ঘুর ঘুর করতে থাকল, সবার হাতে অস্ত্র। তখনই কাছেই কোথাও থেকে কে যেন অনেক কষ্টে ডেকে উঠল মারিয়াসের নাম ধরে। চমকে উঠল সে, গলাটা চিনতে পেরেছে। এপোনাইনের গলা ওটা। দ্রুত এদিক-ওদিক তাকাল মারিয়াস, কিন্তু দেখা গেল না কোথাও তাকে।

'এই যে, মঁসিয়ে,' নিস্তেজ গলায় বলল মেয়েটি। আমি আপনার পায়ের কাছে।

এবার দেখল ওকে মারিয়াস। ওর থেকে সামান্য দূরে রাস্তার ঢালে পড়ে আছে এপোনাইন, মাটিতে নিজেকে হেঁচড়ে একটু একটু তার দিকেই এগোচ্ছে। পরনে ধূসর রঙের শার্ট, ভেলভেট ট্রাউজার, খালি পা। ছুটে গেল মারিয়াস। আঁতকে উঠল মেয়েটির অবস্থা দেখে। এক হাতের তালুতে প্রকাণ্ড এক ফুটো এপোনাইনের, ওদিকে বুকের সাথে লেপটে আছে শার্ট, রক্তে ভিজে একাকার। মারিয়াস কাছে এসে দাঁড়াতে ফ্যাকাসে মুখ তুলে হাসির ভঙ্গি করল এপোনাইন। 'মঁসিয়ে, মরে যাচ্ছি আমি।'

'কি হয়েছে! তুমি এখানে এলে কি করে?'

'আমি গুলি খেয়েছি, মঁসিয়ে।'

'আঁতকে উঠল মারিয়াস। কখন! কি করে?' বসে পড়ল সে মেয়েটির পাশে।

‘এক সৈনিক আপনাকে গুলি করতে যাচ্ছিল, লোকটাকে ঠেকাতে গিয়ে...।’

‘এ কী পাগলামি করেছ! শিউরে উঠল মারিয়াস। এসো, এখনই চিকিৎসা দরকার তোমার। চলো, আমি...’

‘কোন লাভ নেই, মঁসিয়ে, মারিয়াসের হাঁটুর ওপর মাথা তুলে দিল এপোনাইন। আমার সময় শেষ। ওহ, আপনার কোলে মাথা রেখে কী যে ভাল লাগছে!’ কিছু সময় চুপ করে থাকল সে। সব তো শেষ হয়ে গেল। যাওয়ার আগে আপনাকে একটা কথা বলে যেতে চাই, মঁসিয়ে। আমি...আপনাকে ভালবেসেছিলাম।

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল মারিয়াস।

‘জানতাম কোনদিন পাব না আপনাকে, আপনি সেই মাদামোয়াজেলকে ভালবাসেন, তাই...সহ্য করতে পারিনি আমি।’ করুণ হাসি ফুটল মেয়েটির মুখে। ‘আমাকে আপনার ভাল লাগত না, জানি। যেজন্যে কষ্ট হত আমার খুব হিংসে হত। তাই...আমি যখন আপনাকে পাব না, তখন সে-ও যাতে না পায়, সেই জন্যে এখানে ডেকে এনেছি আজ আপনাকে বনুধদের কথা বলে। জানতাম এখানে এলে আর জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারবেন না। আপনিও মরবেন আজ। কিনুত আমি আপনার আগে মরতে চেয়েছি, তাই...।’ গলা বুজে এল এপোনাইনের।

বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেছে মারিয়াস। অপলক চোখে তাকিয়ে আছে হতভাগ্য মেয়েটির দিকে। প্রতি নিঃশ্বাসে বুকের ক্ষত থেকে দলা দলা তাজা রক্ত বেরিয়ে আসছে তার। দেহ ক্রমেই ঠাণ্ডা, নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। কথা বলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে মেয়েটির, বারবার ভেঙে যাচ্ছে গলা, হেঁচকি তুলছে।

একটু একটু করে মারিয়াসের মুখের খুব কাছে নিয়ে এল সে নিজের মুখ। ‘মঁসিয়ে, আমার পকেটে একটা চিঠি আছে মাদামোয়াজেলের। কাল আমাকে পোস্ট করতে দিয়েছিলেন উনি, আমি...করিনি। আমি চাইনি ওটা আপনার হাতে পড়ুক। যাতে আপনাদের আর কোনদিন দেখা না হয়, সে জন্যে মাদামোয়াজেলের বাবাকে কাল সতর্ক করে দেই আমি, বাসা ছেড়ে চলে যেতে বলি। তাই তো কালই ওঁরা..। বের করে নিন চিঠিটা।’

সাবধানে এপোনাইনের বুক পকেট থেকে রক্তে ভেজা খামটা বের করে নিল মারিয়াস। ওটা মুঠোয় পুরে বসে থাকল স্থানুর মত।

‘মঁসিয়ে, আপনার সেই প্রতিজ্ঞার কথা মনে আছে? বলেছিলেন, মাদামোয়াজেলের ঠিকানা খুঁজে দিলে আমি যা চাইব, তাই দেবেন, আছে না মনে?’

পুতুলের মত মাথা দোলাল মারিয়াস। হ্যাঁ, মনে আছে।

‘এখন সে প্রতিজ্ঞা রক্ষার সময় এসেছে আপনার।’

‘বলো, কি চাও তুমি,’ মৃদু কণ্ঠে বলল ও।

‘আমি মরে গেলে, আমার কপালে একটা চুমু খাবেন। ওপার থেকেও আমি ঠিক অনুভব করতে পারব।’

চুপ করে থাকল মারিয়াস। ওদিকে এপোনাইনও চোখ বুজে স্থির হয়ে পড়ে থাকল। এক সময় যখন ওর ধারণা হলো মরে গেছে মেয়েটি, ঠিক তখনই তাকাল সে। নিষ্প্রভ চোখ মেলে দেখল মারিয়াসকে। ওর চোখে মৃত্যুর ছায়া দেখল মারিয়াস। তারপর এত দূর থেকে, মারিয়াসের মনে হলো যেন মরণের ওপার থেকে কথা বলে উঠল এপোনাইন। ‘মঁসিয়ে, আপনাকে ভালবাসতাম আমি।’

মৃদু হাসি ফুটল তার মুখে। ‘চুমু খেতে ভুলে যাবেন না যেন।’ পরক্ষণে মাথা হেলে পড়ল এপোনাইনের। হাসিটা তখনও বহাল আছে, জমাট বেঁধে গেছে কেবল। বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠল মারিয়াসের। মুখ নামিয়ে বিদেহী এপোনাইনের ঘামে ভেজা, ঠাণ্ডা কপালে চুমু খেল সে। মাথাটা আলতো করে মাটিতে নামিয়ে রেখে উঠে পড়ল।

সেইদিনই শেষ বিকেলের ঘটনা। আগের রাতে হোমি আর্মি লেনের বাসায় চলে এসেছে জাঁ ভালজাঁ। একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়া প্রায় কিছুই আনা হয়নি। যার মধ্যে তার নিজের কেবল ন্যাশনাল গার্ডের ইউনিফর্ম আর গাদা বন্দুকটা রয়েছে। কোজেত এনেছে অল্প কয়েক সেট পোশাক,

কিছু প্রসাধনী, আর তার চিঠি লেখার সামগ্রী। কাগজ, কলম, ব্লটিং পেপার ইত্যাদি।

সন্ধের আগেই প্রচণ্ড মাথাব্যথার অজুহাত দেখিয়ে নিজের রুমে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিয়েছে কোজেত। নানান চিন্তা মন জুড়ে আছে জাঁ ভালজাঁর, তাই খুব একটা নজর দিল না সেদিকে। ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। এর মধ্যে পরিচারিকা তুসে কয়েকবার এসে জানিয়ে গেছে, শহরে খুব গণ্ডগোল চলছে। তাও খেয়াল করে শোনেনি ভালজাঁ, এতই অন্যমনস্ক। হাঁটতে হাঁটতে সামনের সাইডবোর্ডের ওপর রাখা বড় একটা আয়নার দিকে তাকাল জাঁ ভালজাঁ। ওর মধ্যে দিয়ে এক অদ্ভুত জিনিসের ওপর চোখ পড়তে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। তাকিয়ে থাকল সেদিকে চোখ কপালে তুলে।

কিছু লেখা দেখতে পাচ্ছে ভাল আয়নায়। একটা চিঠি! লেখা আছেঃ প্রিয়তম, আজই বাবার ইচ্ছে অনুযায়ী আমাদের ৭ নম্বর হোমি আর্মি লেনের বাসায় চলে যাচ্ছি আমরা। ইংল্যাণ্ড রওনা হওয়ার আগে পর্যন্ত ওখানেই থাকব। কোজেত, ৪ জুন।

বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে লেখাটার দিকে তাকিয়েই থাকল জাঁ ভালজাঁ। বুঝে উঠতে পারছে না চিঠিটার রহস্য, কি করে কোত্থেকে ছায়া পড়েছে ওটার আয়নায়? একটু পরে অবশ্য বোঝা গেল। কাল ভালজাঁ বাসা বদলের সিদ্ধান্ত জানাবার পর যখনই হোক, কোজেত চিঠিটা লিখেছে। তারপর কালি শুকানোর জন্যে ব্লটিং পেপার ব্যবহারের সময় কাচা কালির উল্টো ছাপ পড়েছে তার গায়ে। সেই ব্লটিং পেপারটা আয়নার দিকে মুখ করে সাইডবোর্ডের ওপর রাখা আছে এ মুহূর্তে, হতে পারে হয়তো কোজেতেই বেখেয়ালে রেখেছে, এবং আয়নায় পড়ে উল্টো লেখাটা সোজা হয়ে গেছে, ভালজাঁর বিস্ময়াবিষ্ট চোখের সামনে সিমেট্রিক্যাল ইমেজ হয়ে ভাসছে। চিঠিটা লেখা হয়েছে কাকে? কোন ঠিকানায়? সেই ছেলেটিকে? সেই ঠিকানায়, যেটা সে কাল ওবাড়ির বাগানের এক গাছের গায়ে লেখা দেখেছে?

কাছে গিয়ে আবার ওটা পড়ল জাঁ ভালজাঁ। দাঁড়িয়ে থাকল বজ্রাহতের মত। বিশ্বাস করতে পারছে না, মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন দেখছে যেন সে। এ সত্যি নয়, হতে পারে না। এ মিথ্যে। নিশ্চয়ই মিথ্যে। তার কোজেত এমন কাজ কিছুতেই করতে পারে না। যে মেয়েকে এতবছর বুক দিয়ে আগলে রেখেছে, যাকে নিজের মেয়ে ছাড়া আর কিছু কখনও ভাবেনি জাঁ ভালজাঁ, যার সুখের কথা ভেবে এত কিছু করেছে সে, শেষ পর্যন্ত সে-ই কি না... সে-ই কি না।

মাতালের মত টলতে টলতে নিচে নেমে এল জাঁ ভালজাঁ। মাথার মধ্যে একদম ফাঁকা লাগছে তার, কিছুই ভাবতে পারছে না। দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল। বাসার সামনে রাস্তার সাথে একটা পাথরের বেঞ্চ আছে, বসে পড়ল তার ওপর।

ওদিকে, কোজেতের চিঠিটা বার বার করে পড়ল মারিয়াস বিপ্লবীদের বেজমেন্ট রুমে বসে। তারপর পকেট থেকে ছোট একটা নোটবই বের করে একটা সাদা পৃষ্ঠা ছিড়ে উত্তর লিখতে বসে গেল তক্ষুণি। এই নোটবইটা তার সর্বক্ষণের সঙ্গী, কোজেতকে নিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ স্বপ্নের বহু পরিকল্পনা এটায় লিখেছে সে। লিখল মারিয়াসঃ তোমার-আমার মিলন সম্ভব নয়। আমার নানা মত দেননি বিয়েতে। তুমি জাননা আমার কিছুই নেই, তোমারও একই অবস্থা। কাজেই, বিদায় স্বপ্নমানসী। মরব বলে পথে নেমেছি। সেদিন বলেছিলাম, তোমাকে না পেলে আমি মরে যাব, তাই ঘটতে চলেছে। জীবনের সমাপ্তি ঘটলেও আমার আত্মা তোমার সান্নিধ্যেই থাকবে, তোমাকেই ভালবেসে যাবে।

চিঠি খামে পুরে গাভরোচকে কাছে ডাকল মারিয়াস। ‘কাল সকালে চিঠিটা এই ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে আসবে তুমি, মাদামোয়াজেল কোজেতকে। পারবে তো?’

‘একশোবার। কিন্তু কাল কেন, এখনই দিয়ে আসি? লেনটা তো কাছেই।’

তাহলে তো ভালই। যাও।

খাম হাতে নিয়ে ভোঁ দৌড় দিল গাভরোচ। ঠিকানামত যখন পৌঁছল, তার খানিক আগেই বাইরে এসে বসেছে জাঁ ভালজাঁ। ‘মঁসিয়ে,’ বলল ছেলেটা। সাত নম্বর বাসা কোনটা বলতে পারেন?

ওকে দেখে সন্দেহ হলো ভালজাঁর। বুদ্ধি করে বলল, ‘এটাই সাত নম্বর। তুমি বুঝি চিঠি নিয়ে এসেছ আমার?’

মাথা চুলকাল গাভরোচ। ‘আপনার! আপনি কি মেয়ে নাকি?’

মানে, চিঠিটা আসার কথা কোজেতের নামে। আমি বসে আছি ওটার অপেক্ষায়। পাঁচ ফ্রাঁর একটা মুদ্রা এগিয়ে দিল সে ছেলেটির দিকে। নাও। চিঠিটা দাও।

'ঠিক আছে, আঁসিয়ে... কি যেন নাম? তাড়াতাড়ি চিঠিটা পৌঁছে দেবেন কিন্তু মাদামোয়াজেল... কি যেন নাম? ওঁর হাতে। আমি যাই, ওদিকে অনেক কাজ।'

গাভরোচ অদৃশ্য হয়ে যেতে খাম খুলে চিঠিটা বের করল জাঁ ভালজাঁ, ওটার বক্তব্য পড়ে আপাদমস্তক কেঁপে উঠল তার। হঠাৎ করে যেন উপলব্ধি করল কত বড় ভুল করে ফেলেছে সে, কতবড় অন্যায় করে ফেলেছে স্বার্থপরের মত শুধু নিজের দিকটা দেখতে গিয়ে। ভালজাঁর চোখের সামনে কেবলই ভেসে বেড়াচ্ছে...বিদায় স্বপ্নমানসী..মরব বলে পথে নেমেছি।...আমি মরে যাব, তাই ঘটতে চলেছে।

কয়েক মুহূর্ত নিথর বসে থাকল জাঁ ভালজাঁ। এ আমি কি করছি? ভাবল সে, কেন করছি? কেন নিস্পাপ দুটো জীবনকে ঠেলে দিচ্ছি নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে? ছেলেটির যদি কিছু হয়ে যায়, আমার কোজেত কি কোনদিন আমাকে মন থেকে ক্ষমা করতে পারবে? যে কোজেতের জন্যে এতকিছু, কেন তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছি আমি এই পাগল প্রেমিকের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে?

এত কিছু করে শেষ সময়ে চরম স্বার্থপরের মত নিজেই কেড়ে নিতে চাইছি ওর জীবনের সত্যিকারের সুখ? মারিয়াসকে ভালবাসলে কি আমার প্রতি কোজেতের ভালবাসা কমে যাবে?

আচমকা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল জাঁ ভালজাঁ, প্রায় ছুটে দোতলায় নিজের ঘরে এসে ঢুকল। পোশাক বদলে ন্যাশনাল গার্ডের ইউনিফর্ম পরল সে। তারপর বন্দুক আর এক বাক্স কার্ট্রিজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাসা ছেড়ে। হন হন করে বাজারের দিকে চলল জা ভালজাঁ। যে করে হোক, মারিয়াসকে খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু কোথায় পাবে সে তাকে? তাছাড়া ছেলেটার চেহারাই যা একটু একটু মনে আছে তার, নাম-ধাম কিছুই তো...আচমকা ভয়াবহ এক বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল গোটা প্যারিস। থমকে দাড়াল জা ভালজাঁ, পরমুহূর্তে ছুটল উর্ধ্বশ্বাসে।

ঘুরতে ঘুরতে এক সময় সাঁভ্রেরি ব্যারিকেডের কাছে পৌঁছল জাঁ ভালজাঁ। বেশ উত্তেজনা তখন সেখানে। এনজোলারস সে সময় নিজেদের কয়েকজনকে ন্যাশনাল গার্ডের ইউনিফর্ম পরিয়ে ব্যারিকেডের ওপাশে পাঠানোর পরিকল্পনায় ব্যস্ত, ধ্বংসাত্মক কিছু একটা করবে তারা। কিন্তু সমস্যা হয়েছে, যাবে পাঁচজনের একটা গ্রুপ, অথচ ওদের হাতে আছে চার সেট ইউনিফর্ম, কম হয়ে যাচ্ছে এক সেট। কি করা যায় ভাবছে তারা। এই সময় এনজোলারসের কাছে এসে দাঁড়াল জাঁ ভালজাঁ।

কিছুক্ষণ আগে বেজমেন্টের রুমটায় এসে ঢুকেছে ভালজাঁ, তফাতে দাঁড়িয়ে ওদের সমস্যার কথা শুনেছে। মারিয়াসও ছিল তখন সেখানে। নীরবে নিজের ইউনিফর্ম খুলে আগের চার সেটের ওপর রাখল ভালজাঁ। খুশি হলো বিপ্লবীরা। 'কে ভদ্রলোক?' প্রশ্ন করল একজন।

আরেকজন আবেগমাখা কণ্ঠে জবাব দিল, আমাদের নতুন এক বন্ধু।

প্রথম থেকেই বিস্মিত দৃষ্টিতে জাঁ ভালজাঁকে দেখছিল মারিয়াস। 'আমি এঁকে চিনি,' নীরস গলায় বলল ও।

আশ্বস্ত হয়ে ভালজাঁর দিকে ফিরল এনজোলারস। অনেক ধন্যবাদ, মঁসিয়ে। আপনাকে স্বাগতম।

ভিড় কিছুটা পাতলা হতে রূমের এক কোণে হাত-পা বাঁধা ইন্সপেক্টর জ্যাভারের ওপর চোখ পড়ল ভালজাঁর। বিস্মিত হলো সে। হঠাৎ করেই বাইরে হৈ-চৈ বেধে গেল, শুরু হয়ে গেছে দু'পক্ষের গোলাগুলি। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল এনজোলারস। চলো সবাই। বলে এগোতে গিয়েও থেমে গেল সে। ঘুরে জ্যাভারকে দেখল।

টেবিলের ওপর একটা পিস্তল রেখে বলল সে, সবার শেষে যে বেরোবে এ রুম থেকে, তার ওপর স্পাইটার খুলি ওড়ানোর দায়িত্ব থাকল।

তাড়াতাড়ি তার সামনে এসে দাঁড়াল জাঁ ভালজাঁ। দায়িত্বটা আমাকে দিন দয়া করে।

'ঠিক আছে। নিয়ে যান একে, বাইরে কোথাও নিয়ে শেষ করে দিন।' ছুটে বেরিয়ে গেল

এনজোলারস, মারিয়াসও গেল পিছন পিছন। ব্যারিকেডের কাছে তখন তুমুল লড়াই চলছে।
হাত বাঁধা জ্যাভারকে ঠেলতে ঠেলতে রুম থেকে বের করে নিয়ে এল ভালজাঁ। বেশ অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে অন্ধকার, নির্জন এক রাস্তায় দাঁড় করাল তাকে। 'আমাকে চিনতে পেরেছ, জ্যাভার?'
জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করল না জ্যাভার, কারণ প্রথম নজরেই চিনেছে সে জাঁ ভালজাঁকে। 'চমৎকার এক সুযোগ এসেছে তোমার প্রতিশোধ নেয়ার।'
নীরবে তার হাতের বাঁধন খুলে দিল ভালজাঁ। চলে যাও, তুমি মুক্ত।
বিস্মিত হওয়ার মানুষ নয় জ্যাভার, কোন ঘটনাই চমক সৃষ্টি করতে পারেনি তার জীবনে। কিন্তু এই ঘটনায় কেবল বিস্মিতই নয়, একেবারে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল তার। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকল সে জাঁ ভালজাঁর দিকে।
'এখান থেকে জ্যান্ত ফিরতে পারব বলে মনে হয় না,' বলল ভালজাঁ। 'যদি পার, সাত নম্বর হোমি আর্মি লেনের বাসায় এসো, গ্রেফতার করতে পারবে আমাকে সেখান থেকে। আলটিমাস ফশেলভেঁ নামে আছি আমি ওই বাড়িতে।'
দীর্ঘ সময় ধরে তাকে দেখল জ্যাভার। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'সতর্ক থেকো।'
'চলে যাও।'
'কি নাম বললে, ফশেলভেঁ? রু ডি ল' হোমি আর্মি লেন?'
'হ্যাঁ, সাত নম্বর।'
ইতস্তত ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল ইন্সপেক্টর। দু'হাত বুকে বেঁধে অন্যমনস্কর মত ব্যারিকেডের দিকে পা বাড়াল। এক সময় আর দেখা গেল না তাকে।
শূন্যে ফাঁকা একটা গুলি করে ফিরে চলল জাঁ ভালজাঁ।

বারুদের ধোঁয়ায় ভরে আছে সাঁভ্রেরি। ভোর হয়ে এসেছে। আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে পেভমেন্টে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে গোটাবিশেক মৃতদেহ। সবার পরনে ন্যাশনাল গার্ডের ইউনিফর্ম। কাছেপিঠেই পড়ে আছে তাদের যার যার কার্ট্রিজ বক্স। ওগুলোর ওপর চোখ পড়তেই আড়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল গাভরোচ। বাক্সগুলো সংগ্রহ করতে পারলে উপকার হবে বিপ্লবীদের। সামান্য দূরেই সরকারী বাহিনী প্রসুতত, আমলেই আনল না দুরন্ত কিশোর। যারই চোখে পড়ল দৃশ্যটা, সেই হায় হায় করে উঠল। নিজেদের সুরক্ষিত অবস্থান থেকে বিপ্লবীদের কেউ কেউ চেঁচিয়ে ডাকল গাভরোচকে, ফিরে আসতে বলল, শুনল না সে। সাথে করে বড় একটা ঝুড়ি নিয়ে গেছে, ওটার। মধ্যে এক এক করে বাক্স খালি করার কাজে ব্যস্ত।
ভয়াবহ একটা দৃশ্য। গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেছে প্রত্যেকের। যে কোন মুহূর্তে গুলি শুরু হয়ে যাবে সরকারী বাহিনীর তরফ থেকে। কিন্তু হলো না। ধোয়ার জন্যেই হোক, বা আকার ছোট বলেই হোক, তখনও চোখ পড়েনি কারও ছেলেটির ওপর।
সাত-আটটা বাক্স খালি করে ফেলেছে গাভরেছি নির্বিঘ্নে, আর কয়েকটা বাকি, এই সময় গুলির শব্দে কেঁপে উঠল সাঁভ্রেরি। কেঁপে উঠল বিপ্লবীরাও। লাফ দিল গাভরোচ বাদরের মত, যেখানে বসা ছিল সে এইমাত্র, ঠিক সেখানটাতেই আঘাত করল গুলি, তবে নিজেকে সরিয়ে নিতে পেরেছে সে সময়মত। আবার গুলি হলো, হতেই থাকল খানিক বিরতি দিয়ে। এবং প্রতিবারই একই কায়দায়, কখনও শুয়ে পড়ে, কখনও লাফিয়ে সরে গিয়ে, কখনও বা কোন দরজার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে নিজেকে রক্ষা করে চলল গাভরোচ। ওর কাণ্ড দেখে যারা গুলি ছুঁড়ছে, তারা পর্যন্ত হেসে খুন। ওদিকে বিপ্লবীরা রুদ্ধশ্বাসে, বিস্ফারিত চোখে অপেক্ষা করছে চরম মুহূর্তটির। অবশেষে এল সেই মুহূর্ত, গুলি খেয়ে শূন্যে উঠে গেল খুদে দুরন্ত। লুটিয়ে পড়ল পথের ওপর। গাভরোচকে উদ্ধার করতে গিয়ে মারিয়াসও গুলি খেল কপালে।
আরেকটা গুলি কলার বোন চুরমার করে দিল তার। জ্ঞান হারাবার আগে কোজেতের মুখ ভেসে উঠল মারিয়াসের চোখের সামনে। এ-ও টের পেল সে, একই সময়ে কে যেন সবল দুই হাতে

আঁকড়ে ধরল তাকে।

এগারো

রক্তাক্ত, মৃতপ্রায় মারিয়াসের অজ্ঞান দেহটা কাঁধে নিয়ে প্রায় ছুটে চলেছে জাঁ ভালজাঁ। আর এক মুহূর্তও নিরাপদ নয় এখানে। মারিয়াস লুটিয়ে পড়ার সাথে সাথে সর্বশক্তি নিয়ে বিপ্লবীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে সরকারী বাহিনী, তাদের চতুর্মুখী সে ভয়াবহ হামলার তুলনা চলে কেবল প্রচণ্ড হ্যারিকেনের সাথে, বিধ্বংসী সাইক্লোনের সাথে।

প্রথমে কুঠারধারী স্যাপার বাহিনী, তারপর পদাতিক বাহিনী, ন্যাশনাল গার্ড, মিউনিসিপ্যাল গার্ড, সবশেষে আবারও পদাতিক বাহিনী, সব বাহিনী এক হয়ে একযোগে প্রচণ্ড সাইক্লোনের গতিতে ঝাপিয়ে পড়েছে লা সাঁভ্রেরির ব্যারিকেডের ওপর। তাদের আক্রমণের মুখে তুলোর মত উড়ে গেছে সমস্ত প্রতিরোধ, জনতার গগনবিদারী ফরাসী বিপ্লব, 'জিন্দাবাদ' ধ্বনি থেমে গেছে মুহূর্তের মধ্যে। সরকারী বাহিনীর নৃশংস সংহারলীলা দেখে বুক কেঁপে গেছে সবার। তাই পালাচ্ছে যে যেদিকে পারে।

এই ফাঁকে মারিয়াসকে নিয়ে সয়রে পড়েছে জাঁ ভালজাঁ। কিন্তু কোনদিকে যাবে, বুঝে উঠতে পারছে না সে। চারদিকে সরকারী ফৌজ। যে কোন মুহূর্তে, যে কোন দিক থেকে ছুটে আসতে পারে গুলি, লুটিয়ে পড়তে পারে জাঁ ভালজাঁ। তার মৃত্যু অর্থ মারিয়াসেরও সমাপ্তি। কিন্তু সে তা হতে দিতে পারে না। হঠাৎ পথের ওপরেই দু'ফুট চওড়া, দু'ফুট লম্বা এক মরচে পড়া লোহার ঝাঁঝরি দেখে থমকে দাড়াল জাঁ ভালজাঁ। উঁকি দিল, ঝাঁঝরির ভেতর দিয়ে ফুট দশেক নিচে মাটি দেখা যাচ্ছে। এক হাতের হ্যাঁচকা টানে ঝাঁঝরি তুলে ফেলল ভালজাঁ, তারপর কি করে যে ভূগর্ভের সুড়ঙ্গে নেমে পড়ল সে ছেলেটিকে নিয়ে, খেয়াল নেই।

জায়গাটা কবরের মত অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। চোখ সয়ে আসার জন্যে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল ভালজাঁ। দশ বছর আগের এক রাতের ঘটনা মনে পড়ল, যে রাতে জ্যাভারের তাড়া খেয়ে পালিয়েছিল সে। সে রাতে কোজেতছিল ভালজাঁর কাধে, আজ কোজেতের প্রেমিক, তাকে নিয়েও পালাচ্ছে সে। একই রকম সন্ত্রস্ত ভালজাঁ আজও। সেদিন ছিল ধরা পড়ার শঙ্কা, আর আজ মারিয়াসের জীবনের শঙ্কা। খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার মারিয়াসের, জানে জাঁ ভালজাঁ।

দৃষ্টি সয়ে এল কিছুক্ষণের মধ্যে, পা বাড়াল সে প্যাচপেচে কাদা আর পানি ঠেলে। ভালজাঁর চারদিকেই দেয়াল। ভেজা। বাতাসে বোঁটকা গন্ধ। কোনদিকে লক্ষ নেই ভালজাঁর, হাঁটছে তো হাঁটছেই। একটানা হেঁটে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে, শুকনো জায়গা দেখে কাঁধের বোঝা আস্তে করে নামিয়ে রাখল মাটিতে, বসে পড়ল ধপ করে। খানিকটা সামনে আরেকটা ম্যানহোল আছে দেখেই বসেছে জাঁ ভালজাঁ, আলো আসছে সেখান থেকে। অজ্ঞান মারিয়াসের দিকে নজর দিল সে। এতক্ষণেও তার জ্ঞান ফেরেনি দেখে চিন্তিত হলো।

চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ছেলেটির। রক্তে জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে আছে মাথার চুল। ঠোটের কোণে, বুকে, মুখে, সবখানে রক্ত, কালচে হয়ে গেছে শুকিয়ে। কাধের ক্ষতে সেঁটে আছে শার্ট। সব মিলিয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা। আস্তে আস্তে মারিয়াসের শার্ট খুলে ফেলে দিল জাঁ ভালজাঁ, নিজের শার্ট ছিড়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিল ওর ক্ষতগুলো।

মারিয়াসের শার্টের পকেটে একটা নোট-বই আর একটা পাউরুটি পেল ভালজাঁ। প্রচণ্ড খিদেয় নাড়িভুড়ি জ্বলছে তখন, বিনাদ্বিধায় রুটিটা খেয়ে ফেলল সে। তারপর নোট-বইটা খুলল। প্রথম পাতায় কি যেন লেখা আছে দেখা গেল। পড়ল জা ভালজাঁ। লেখা আছেঃ আমার নাম মারিয়াস পঁতমারসি। আমার মৃতদেহ ঘঁসিয়ে জিলেনরমঁদ, রু দেস ফিলেস দু ক্যালভারি, নম্বর ৬, মারেই, ঠিকানায় পৌঁছে দেবেন।

ঠিকানা মুখস্থ করে ফেল জাঁ ভালজাঁ। পেটে কিছু পড়ায় গায়ে শক্তিও ফিরেছে। আবার উঠল সে, পা চালাল অজ্ঞান দেহটা কাঁধে নিয়ে। ওপরে কত বেলা হলো জানা নেই জাঁ ভালজাঁর, যন্ত্রচালিতের মত কেবলই সামনে এগিয়ে চলেছে কখনও হাঁটু সমান, কখনও কোমর, এমনকি কাঁধ সমান উঁচু, নোংরা পানি ঠেলে। এক কাঁধ অসাড় হলে অন্য কাঁধে নেয় মারিয়াসকে, তারপর আবার এক সময় কাঁধ বদল। একটানা সারাদিন হাঁটার পর সামনে আধখানা চাঁদের মত আবছা আলোর

আভাস দেখে প্রথমে পড়ল জাঁ ভালজাঁ, খুশি হয়ে উঠল। নর্দমার গেট ওটা। পরক্ষণে প্রায় দৌড়ের মত করে এগোল কাদা-পানি মাড়িয়ে, ছপাৎ ছলাৎ আওয়াজ তুলে।

জায়গামত পৌঁছে হতাশ হলো সে। বের হওয়ার পথই বটে, তবে বন্ধ। মোটা গরাদের দরজা পথ আটকে আছে জাঁ ভালজাঁর, তাতে ডবল তালা। তীব্র হতাশায় অন্তর ছেয়ে গেল তার। কি করবে এখন সে? প্রচণ্ড রাগে গা জ্বলে গেল ভালজাঁর, গেট ধরে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁকাল সে, এক চুল নড়ল না গেট। কি করবে ভেবে না পেয়ে বাইরের দিকে নজর দিল জাঁ ভালজাঁ। সামনেই সিন নদী, নির্জন তট, অস্তগামী সূর্যের নিস্তেজ আলো, এইসব দেখতে থাকল আনমনে।

চমকে উঠল ভালজাঁ কাঁধে কারও হাত পড়তে। 'অর্ধেক পেলে গেট খুলে দেব,' চাপা গলায় বলল কে যেন।

ঘুরে তাকাল ভালজাঁ। আলো ভালজাঁর পিছনে বলে তার চেহারা দেখতে পাচ্ছে না লোকটা, বুঝল সে। কিন্তু ঠিক বিপরীত কারণে তাকে ঠিকই দেখল ভালজাঁ। থেনারদিয়ের! অবাক হলো সে লোকটাকে দেখে। এ ব্যাটা এখানে কেন? এখান থেকে বেরুতে হলে আমাকে অর্ধেক দিতে হবে, আবার বলল থেনারদিয়ের।

'তার মানে?'

'তার মানে হচ্ছে, লোকটাকে খুন করে নদীতে ফেলে দিতে এসেছ তুমি, কিন্তু আটকে গিয়েছ। এখন ওর পকেটে কি আছে বের করো, অর্ধেক দাও আমাকে। গেটের চাবি আছে আমার পকেটে, খুলে দেব।'

কথা খরচ না করে নিজের পকেটে হাত নেকাল জাঁ ভালজাঁ, এখন তাড়াতাড়ি বের হওয়া দরকার এখান থেকে, সে যে উপায়ে হোক। পকেটে মানিব্যাগটা না পেয়ে মনে পড়ল ভালজাঁর, গত রাতে তাড়াহুড়োর মধ্যে পোশাক বদল করার সময় ওটা নিতে মনে ছিল না। ওয়েস্ট কোটের পকেটে একটা লুইস ডি'ওর, দুটো পাঁচ ফ্রাঁ মুদ্রা, আর পাঁচ-ছয়টা সাউ পাওয়া গেল কেবল। তাজ্জব হয়ে তাকে দেখল থেনারদিয়ের। 'মাত্র এই ক'টা টাকার জন্যে খুন করছ তুমি!'

এগিয়ে এসে মারিয়াসের পকেট হাতড়াতে শুরু করল সে নিজেই, বিশ্বাস হয়নি জাঁ ভালজাঁর কথা। কাজের ফাঁকে মারিয়াসের কোটের এক টুকরো লাইনিঙের কাপড় ছিঁড়ে নিল থেনারদিয়ের ভালজাঁর চোখ বাঁচিয়ে। ভেবেছে, ভবিষ্যতে মৃত এবং হত্যাকারী, দুজনকে কখনও যদি সনাক্ত করতে হয়, প্রয়োজন হতে পারে এটা। শেষ পর্যন্ত সব মিলিয়ে ত্রিশ ফ্রাঁর মত হলো। অর্ধেক ভাগাভাগির কথা ভুলে পুরোটাই নিজের পকেটে ঢোকাল থেনারদিয়ের। খুলে দিল গেট। 'যাও, ভায়া। চলে যাও।'

নীরবে বেরিয়ে এল জাঁ ভালজাঁ। পিছনে গেট লেগে গেল আবার। নদীর তীরে মারিয়াসকে শুইয়ে দিল সে। আঁজলা ভরে পানি এনে ছিটিয়ে দিল তার মুখে। চোখ খুলল না সে, তবে চোখের পাতা বারকয়েক কেঁপে উঠল। মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিল সে। হঠাৎ পিছনে কারও উপস্থিতি টের পেয়ে ঘুরে তাকাল জাঁ ভালজাঁ। ইন্সপেক্টর জ্যাভার। কিন্তু অবাক হলো ভালজাঁ জ্যাভার তাকে চিনতে পারেনি দেখে। অথচ বুকে হাত বেঁধে তার দিকেই তাকিয়ে আছে সে। 'তুমি কে?' শান্ত গলায় জানতে চাইল জ্যাভার।

'আমি।'

'আমি কে?'

'জাঁ ভালজাঁ।'

হাতের ছড়িটা দাঁতে কামড়ে ধরে সামনে ঝুঁকল জ্যাভার, অথচ মনে হলো দেখছে না সে ভালজাঁকে। দু'হাতে তার কাঁধ চেপে ধরল সে। 'তুমি এখানে কি করছ? এই লোকটা কে?'

জোর করে উঠে দাঁড়াল ভালজাঁ। 'ইন্সপেক্টর জ্যাভার, পালিয়ে যাব বলে নিজের ঠিকানা দেইনি আমি তোমাকে। চাইলে অ্যারেস্ট করতে পারো তুমি আমাকে। কিন্তু তার আগে এই ছেলেটাকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার সুযোগ দাও।'

মারিয়াসকে দেখল জ্যাভার, চিন্তিত কণ্ঠে বলল, ব্যারিকেডে ছিল এই লোকটা গতরাতে, দেখেছি। একে অন্যরা মারিয়াস নামে ডাকছিল।

মারাত্মক জখম হয়েছে ছেলেটা, বলল ভালজাঁ।

'ও তো মরে গেছে।'

'না, মরেনি। বেঁচে আছে এখনও। একে এর বাসায় পৌঁছে দেয়ার সুযোগ অন্তত দাও আমাকে।'

নীরবে ওকে দেখল জ্যাভার। 'ব্যারিকেড থেকে এত পথ বয়ে এনেছ তুমি মারিয়াসকে? ঠিক আছে, চলো। আমিও যাব।'

বেশ রাত হলো তার নানার বাসায় পৌঁছতে, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে ততক্ষণে। তবে জ্যাভারের পুলিসী হাঁক ডাকে অল্পক্ষণেই ঘুম ভেঙে গেল দারোয়ানের ছুটে এল লোকটা। কয়েক মিনিটের মধ্যে দৌড়-ঝাপ শুরু হয়ে গেল সে বাড়িতে।

ওখান থেকে বেরিয়ে ভাড়া করা ঘোড়ার গাড়িতে উঠল জ্যাভার আর ভালজাঁ। তোমার কাছে আমার আরেকটা অনুরোধ আছে, জ্যাভার।

'আবার কি?' বিরক্ত হলো ইন্সপেক্টর।

'এক মিনিটের জন্যে আমার বাসায় যেতে দাও আমাকে। তারপর তোমার যা ইচ্ছে হয় কোরো আমাকে নিয়ে।'

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকল ইন্সপেক্টর, তারপর কোচের জানালা নামিয়ে ড্রাইভারকে উদ্দেশ করে বলল, 'সাত নম্বর রুদে লা হোমি আর্মি লেন চলো।'

একটু পর নির্দিষ্ট গলির সামনের বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। গলিটা সরু, ভেতরে যায় না ক্যারিজ। নেমে পড়ল ওরা দু'জন। বাসার সামনে এসে জ্যাভার বলল, তুমি যাও ভেতরে। আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

ওপরে, নিজের ঘরে চলে এল জাঁ ভালজাঁ। কি ভেবে জানালার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে বাইরে তাকাল। পরমুহূর্তে অবাক হয়ে গেল সামনে কেউ নেই দেখে। ঝুঁকে পড়ে ডাইনে-বায়ে তাকাল ভালজাঁ। গলিটা যেমন সরু, তেমনি দৈর্ঘ্যেও ছোট। এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত প্রতিটি পোস্টে আলো জ্বলছে, অথচ আশ্চর্য! কোথাও দেখতে পেল না সে লোকটাকে।

নেই ইন্সপেক্টর জ্যাভার। চলে গেছে।

ওদিকে জিলেনরমঁদের বাড়িতে যথাসম্ভব নিঃশব্দে মারিয়াসের চিকিৎসা চলছে। ঘরের মধ্যে অস্থিরচিত্তে পায়চারি করছেন তার খালা, ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তাঁর। বৃদ্ধ গৃহকর্তা ঘুমিয়ে আছেন, তাকে দেয়া হয়নি খবর। বেচারী খালার বুক ফেটে যাচ্ছে, তবু কাঁদতে পারছেন না বাবার কথা ভেবে। কোনমতে যদি টের পেয়ে যান বাবা, সর্বনাশ হয়ে যাবে।

অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রায় দিলেন ডাক্তার, এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়, তবে মনে হয় সুস্থ হয়ে উঠবে মারিয়াস। মাথায় কয়েকটা আঘাত লেগেছে, কাঁধের হাড় ভেঙেছে একটা, হাতেও জখম দেখা যাচ্ছে তলোয়ারের। পরেরগুলো নয়, চিন্তা মাথার আঘাত নিয়ে। আঘাত মস্তিষ্কে লেগেছে কি না মারিয়াসের জ্ঞান ফেরার আগে বোঝ যাবে না। তবে, খালাকে আশ্বস্ত করতে চাইলেন ডাক্তার, আশা করা যায় তেমন খারাপ কিছু ঘটেনি।

বড় বড় তিনটে মোমবাতি জ্বেলে ছুরি-কাঁচি নিয়ে অপারেশন করার জন্যে যখন প্রসুতত হলেন ডাক্তার। ঠিক তখনই ভেতরে এসে দাড়ালেন গৃহকর্তা। ধুম ঘুম চোখে কিছুক্ষণ ঘরের চারদিকে নজর বোলালেন। 'কি হচ্ছে এখানে?' সাদা নাইট ড্রেসে প্রেতের মত দেখাচ্ছে জিলেনরমঁদকে।

মঁসিয়ে, ভয়ে ভয়ে বলল ভৃত্য বাস্ক। ব্যারিকেডে ছিলেন মঁসিয়ে মারিয়াস। জখম হয়েছেন। একটু আগে...।

মারিয়াসের কাছে এসে দাড়ালেন জিলেনরমঁদ। চেহারা পরিধেয়র মতই ফ্যাকাসে সাদা। বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন, 'ওরে নিঠুর! পাজি! নচ্ছার! ওরে বদমাশ বিপ্লবওয়ালা আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়েছিলি? এই ছিল তোর মনে?' বলতে বলতে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়লেন বৃদ্ধ বুর্জোয়া।

রু দে লা হোমি আমি লেন থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে এল ইন্সপেক্টর জ্যাভার। চিন্তার ভারে মাথা নুয়ে

আছে। বাহান্ন বছরের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী, প্যারিস আণ্ডারওয়ার্ল্ডের ত্রাস জ্যাভারের জীবনে এই প্রথম মাথা নিচু করে হাঁটা। দুহাত পিছনে বাধা। এটাও জীবনে প্রথম।

শর্ট কাট পথে সিনের দিকে চলেছে সে। কোয়াই দেস ওমেস হয়ে গ্রিভি পৌঁছল, তারপর থেমে দাঁড়াল এসে পন্ট নোটর ডেমের কোণে, প্লেস ডু শেতেল পুলিশ পোস্টের সামান্য দূরে। এখান থেকে সিনের এক মাথা চলে গেছে পন্ট নোটর ডেম আর পন্ট অ চেঞ্জের মধ্যে দিয়ে, অন্য মাথা গেছে কোয়াই দে লা মেগিসেরি ও কোয়াই অক্স ফ্লিয়াসের মধ্যে দিয়ে।

বাঁধের প্যারাপেটে দু'কনুই চাপিয়ে দাঁড়াল আনমনা জ্যাভার। ভেতরে বড় ধরনের এক তোলপাড় চলছে তার। মস্তিষ্কের যে অংশ এত বছর অন্ধের মত তাকে দিয়ে দায়িত্ব পালন করিয়ে নিয়েছে, সেখানে সব কেমন ঘোলাটে মনে হচ্ছে এ মুহূর্তে, স্বচ্ছতার অভাব দেখা দিয়েছে সেখানে। বিবেক নামের এক অপদার্থ দুর্বল করে ফেলেছে জ্যাভারের দায়িত্ববোধকে। নিজের কাছেই তাকে অসহায় করে তুলেছে। যে কারণে জাঁ ভালজাঁর মত ঘৃণ্য এক অপরাধীকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়েছে আজ জ্যাভারকে, পালিয়ে আসতে হয়েছে। চোরের মত।

জীবনে একটাই মাত্র সরল-সোজা রাস্তা ছিল সামনে, সেখানে আজ হঠাৎ দুটো রাস্তা দেখতে শুরু করেছে ইন্সপেক্টর জ্যাভার। তাও আবার কোন মিল নেই দুটোতে। এখন? কোন পথে এগোবে সে? কি করবে? দুটো পথের শেষেই যে অতল গহ্বর দেখতে পাচ্ছে জ্যাভার, কি করে নিজেকে রক্ষা করবে সে তার হাত থেকে? যে অপদার্থটার কাছে তাকে হার মানতে হলো, সেটা কি সমাজ, আইন, বিচারের থেকেও বড়? এতই তার ক্ষমতা?

মাথা ঝাঁকাল জ্যাভার, এসব কী ভয়ানক চিন্তা ঢুকল তার মনে? এক জঘন্য অপরাধীর প্রতি দরদ? শ্রদ্ধা? কোনটা বড়? কাল রাতে হাতে পেয়েও তাকে হত্যা করল না কেন জাঁ ভালজাঁ? কেন প্রতিশোধ নিল না? কেন তাকে এই যন্ত্রণায় ফেলল? প্রতিশোধ নিলে তো বেঁচে যেত সে, জীবনে আর কখনও জ্যাভারের তাড়া খেতে হত না। একমাত্র জ্যাভারই জানে তার বর্তমান পরিচয়, অতএব তাকে পথ থেকে সরিয়ে দেয়াই কি ভাল ছিল না ভালজাঁর? কেন সে তার প্রাণ ভিক্ষে দিল? একজন অপরাধীর অন্তর কি করে এত বড় হয়? জ্যাভারের চোখের সামনে জাঁ ভালজাঁর চেহারা ভেসে উঠল। পরক্ষণে তার পাশেই দেখা গেল দশ বছর আগের ফাদার ম্যাডেলিনকে। একটু একটু করে প্রথমটার মধ্যে বিলীন হয়ে গেল দ্বিতীয়টা, দুটো মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। কী আশ্চর্য!

হে ঈশ্বর! এ কী হলো? কি করে এই দ্বন্দ্বের হাত থেকে মুক্তি মিলবে আমার? এ কী কঠিন পরীক্ষায় ফেললে তুমি আমাকে? কি করব আমি এখন, গ্রেফতার করব অপরাধী জাঁ ভালজাঁকে? কিন্তু ওর ভেতরে যে মহৎ প্রাণ ফাদার ম্যাডেলিনও আছেন, তার কি হবে? নিজের পরোয়া না করে যে চ্যাম্পমাথিউকে বাঁচাবার জন্যে ছুটে গিয়েছিল অ্যারাসে, সেই বিশাল হৃদয়ের অধিকারী মানুষটির কি হবে? কি হবে তার প্রাণ ভিক্ষা দানকারীর?

মুখ নামিয়ে নিচের কল কল ছল ছল আওয়াজ শুনল কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক জ্যাভার। দুরন্ত বেগে ছুটে চলেছে সিন, স্রোতের প্রচণ্ড টানে এখানে ওখানে অসংখ্য ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়েছে তার কালো বুকে। অদৃশ্য কোন হাতের কারসাজিতে দৈত্যাকার স্ক্রুর মত কোথাও প্যাচ খাচ্ছে তারা, কোথাও প্যাচ খুলছে। ক্রুদ্ধ সাপের মত অনরত মোচড় খাচ্ছে সিন, ফুসছে। আওয়াজই কেবল শুনতে পাচ্ছে জ্যাভার, অন্ধকার বলে দেখতে পাচ্ছে না কিছু।

অনেক, অনেকক্ষণ পর মনস্থির করল সে। প্রথম যেটা করা উচিত, সেটা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। হবেও না আর। তবে দ্বিতীয় পথ খোলা আছে সামনে, সে পথেই যাবে ইন্সপেক্টর জ্যাভার। সেই ভাল হবে। আজকের ব্যর্থতার এই গ্লানির হাত থেকে মুক্তি অন্তত পাবে সে।

ঠাণ্ডা হীম বাতাসে একবার শিউরে উঠল জ্যাভার। টুপি খুলে প্যারাপেটের ওপর রাখল, তারপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে। খল খল শব্দে বুক পেতে গ্রহণ করল তাকে দুরন্ত সিন, ঢেকে দিল জ্যাভারের সমস্ত গ্লানি।

একটু একটু করে সেরে উঠতে লাগল মারিয়াস। মাথার চোটটা ভোগাল খুব। অসুস্থ নাতির পাশে

সারাক্ষণ বসে থাকেন জিলেনরমঁদ। ওদিকে রোজ বিকেলে ধপধপে সাদা চুলওয়ালা এক ভদ্রলোক আসেন, কোন কোনদিন দু'বারও আসেন তিনি। অবশ্য ভেতরে আসেন না, দারোয়ানের কাছে মারিয়াসের খোঁজ নেন, তারপর যাওয়ার সময় প্রতিদিন বড় এক প্যাকেট ব্যাণ্ডেজের কাপড় দিয়ে যান। পুরো চার মাস পর ডাক্তার ঘোষণা করলেন বিপদ কেটে গেছে মারিয়াসের। তবে আরও দু'মাস তাকে পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে।

এই সময় একদিন ভয়ে ভয়ে কোজের প্রসঙ্গ তুলল ও নানার সামনে। তাকে অবাক করে হেসে উঠলেন বৃদ্ধ। 'ভেবেছিলে আমি আবার না বলব, আর অমনি তুমি রেগেমেগে লাফ দিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়বে, তাই তো? উঁহু! সেটি আর হচ্ছে না, ডায়া। আগে দয়া করে সেরে ওঠো, তারপর কোজেতের সাথেই বিয়ে হবে তোমার। তুমি সুখী হবে, এই বুড়োরও হাড় জুড়োবে।'

বারো

মারিয়াস-কোজেতের বিয়ের কথাবার্তা এখনই সেরে ফেলা ভাল, ভাবলেন একদিন বৃদ্ধ বুর্জোয়া। এখন প্রায় রোজই মারিয়াসকে দেখতে আসে কোজেত, জাঁ ভালজাঁ থাকে সাথে। তবে যে রূমে মারিয়াস থাকে, সে রূমে ঢোকে না ভালজাঁ, বৈঠকখানায় বসে থাকে। সাক্ষাৎ শেষে কোজেতকে নিয়ে বাসায় ফেরে।

সুযোগ বুঝে একদিন ভালজাঁর কাছে কোজেতকে নাত বৌ করে ঘরে আনার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দিলেন জিলেনরমঁদ। একটুও দেরি না করে সায় দিল জাঁ ভালজাঁ। প্রস্তাবটা সেদিনই আসবে জানত যেন সে। সম্মতি জানিয়ে সঙ্গে আনা হালকা সবুজ একটা ছাতাপড়া কাগজের মোড়ক টেবিলে রাখল। সবাই ভাবল হয়তো বই-টই হবে। 'মাদামোয়াজেল ইউফ্রেসির প্রায় ছয় লাখ ফ্রাঁ গচ্ছিত ছিল এতবছর আমার কাছে,' বলল জা ভালজাঁ। 'আজ থেকে এ টাকা মারিয়াস আর কোজেত, দুজনের।'

চমকে উঠলেন বৃদ্ধ, কি বললেন, 'ছয়শো হাজার ফ্রাঁ?'

হ্যাঁ। অল্প কিছু কম আছে, যোলো হাজারের মত।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই চায় না গৃহকর্তার। হতভম্বের মত ভালজাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা, মাদামোয়াজেল ইউফ্রেসি কে?'

'আমি, মৃদু কণ্ঠে বলল কোজেত।

'এত টাকা...!'

সবাইকে 'আসল' ঘটনা জানাল জাঁ ভালজাঁ। এতদিন তারা, এমনকি কোজেতও জানত আলটিমাস ফশেলভেঁ তার বাবা। কিন্তু আজ জানল তা সত্যি নয়। আসলে সে তার প্রতিপালক। কোজেতের দূর সম্পর্কের আত্মীয় হয় সে কেবল। তার বাবা, একই বংশের লোক, আলটিমাস থেকে বয়সে অনেক বড় এবং তিনি মারা গেছেন। তিনিই কোজেতের জন্যে এ টাকা আলটিমাস ফশেলভেঁর কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন।

অন্য কোন সময় যদি সত্যটা জানত কোজেত, দুঃখে হয়তো বুক ফেটে যেত তার। কিন্তু জানল জীবনের এমন এক আনন্দঘন মুহূর্তে, যখন ব্যাপারটা তেমন রেখাপাত করল না মনে। সে তখন মারিয়াস আর ভবিষ্যৎ নিয়ে মশগুল। এক বৃদ্ধ ভালমানুষের বদলে মনের মানুষকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেতে যাচ্ছে তখন কোজেত, কাজেই সহজভাবেই নিল সে ব্যাপারটাকে। তবে ভালজাঁকে বাবা ডাকে সে আগের মতই। এদিকে মারিয়াস ভালজাঁকে দেখে আর কী যেন ভাবে। ভাবে, সেই ভয়াবহ রাতে এই লোকটিকেই কি দেখেছে সে সাঁভ্রেরি চত্বরে? পরোপকারী, নীরব মানুষটি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জাগে মনে, কিন্তু সরাসরি কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা হয় না।

তবু একদিন সাহস করে বলেই বসল মারিয়াস, 'রু দে লা সাঁভ্রেরি চেনেন নিশ্চই, মঁসিয়ে?'

'না,' সহজ কণ্ঠে জবাব দেয় জাঁ ভালজাঁ।

আমারই ভুল তাহলে, ভেবেছে মারিয়াস। হয়তো এঁরই মত আর কাউকে দেখেছে সে ব্যারিকেডে। '৩৩ সালের ১৬ ফ্রেরুয়ারি বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে ওদের। তার আগেই কয়েকটা কাজ সেরে নেয়ার তাগিদ অনুভব করল মারিয়াস। অন্তত দুজনের কাছে ঋণী সে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ, বাবার দিক, নিজের দিক, দুদিক থেকেই। একজন থেনারদিয়ের। যত মন্দ লোকই হোক সে, তাকে সাহায্য করার নির্দেশ আছে বাবার। আরেকজন সেই অজ্ঞাত মানুষটি, যে ওকে প্রায় মৃত অবস্থায় এখানে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। খুঁজে বের করতে হবে তাদের।

অনেক অনুসন্ধান শেষে জানা গেল, থেনারদিয়ের পত্নী জেলে থাকতে মারা গেছে। থেনারদিয়ের তার আগেই পালিয়ে গিয়েছিল। সে আর ছোট মেয়ে আজেলমা বেঁচে আছে এখনও, তবে কোথায় আছে। তারা কেউ জানে না। দ্বিতীয়জন সম্পর্কে জানা গেল, এক ঘোড়ার গাড়ি চালক ৬ জুন সন্ধের অনেক আগে থেকেই এক পুলিশ অফিসারের নির্দেশে সাঁ-জে-লি-জে জেটি বাঁধে অপেক্ষা করছিল ক্যারিজ নিয়ে। সন্ধের সময় ওখানকার গ্র্যান্ড সুয়্যার নর্দমার লোহার গেট খুলে এক লোক বেরিয়ে আসে, তার কাঁধে একটা লাশ ছিল। লোকটাকে সেই অফিসার গ্রেফতার করে, তারপর

তাকে আর লাশটা নিয়ে মারেইর রু দেস ফিলেস দু ক্যালভারিতে যায়। সেখানে ৬ নম্বর বাড়িতে লাশটা পৌঁছে দিয়ে তাকে হোমি আর্মি লেনে যেতে বলে অফিসার, আসামীটি তখন তার সাথে ছিল। শেষ পর্যন্ত যায়নি অবশ্য তারা, বড় রাস্তায়, বড় রাস্তায়, আর্কাইভের সামনে ভাড়া মিটিয়ে তাকে বিদেয় করে দেয় অফিসার। তার বক্তব্য জবর ধাধায় ফেলে দিল মারিয়াসকে।

'আসামী লোকটা দেখতে কেমন ছিল?' জানতে চেয়েছে মারিয়াস।

'বলতে পারব না, মঁসিয়ে,' বলেছে ক্যারিজ চালক। অন্ধকারে তাকে দেখতে পাইনি ভাল করে।

একই প্রশ্ন বাড়ির লোকজনকেও করেছে ও। কেবল দারোয়ানই যা এক নজর দেখেছে তাকে। তার মতে মানুষটা ছিল ভয়ঙ্কর চেহারার।

নানান আন্দাজ-অনুমান ঘুরপাক খেতে থাকল মারিয়াসের মাথায়। গুলি খেয়ে সাঁভ্রেরি চত্বরে পড়ে গিয়েছিল সে, ওখান থেকে সাঁ-জে-লি-জে পর্যন্ত কি করে এল তার অজ্ঞান দেহটা? কেউ বয়ে এনেছিল? কি করে, কাঁধে করে? নর্দমা দিয়ে? সেই অফিসারটাই বা কি করে নিশ্চিত ছিল যে ও পথে কেউ আসবে? কেন ওখানে বসে ছিল সে? নিজের পরিধেয় যা ছিল, সেই রক্ত মাখা কোট-প্যান্ট ইত্যাদি ঘেঁটে দেখেছে সে, যদি কোন সূত্র মিলে যায়, সেই আশায়। কেবল কোটের ভেতরের লাইনিং খানিকটা নেই চোখে পড়েছে মারিয়াসের, আর কিছু না।

একদিন বিকেলে কোজেত আর মঁসিয়ে ফশেলভেঁকে তার অনুসন্ধানের ব্যাপারটা জানল মারিয়াস। ভাবলেশহীন চেহারা করে ওর বক্তব্য শুনে গেল জাঁ ভালজাঁ, কোন মন্তব্য করল না। ব্যাপারটা বিস্মিত করল ওকে। 'ওহ! যদি কোজেতের টাকাগুলো আমার হত...'

'ও টাকা তো তোমাদেরই,' বাধা দিল ভালজাঁ।

খেয়াল করল না মারিয়াস। প্রয়োজন হলে সব খরচ করতাম আমি এই মানুষটিকে খুঁজে বের করার জন্যে।

নির্দিষ্ট দিনে বিয়ে হয়ে গেল মারিয়াস-কোজেতের।

অনুষ্ঠান সেরে গির্জা থেকে সবাই ফিরে এল মারিয়াসদের বাড়িতে। জাঁ ভালজাঁ বসল মনোরম সাজানো বৈঠকখানায়। কিছুটা বিমর্ষ লাগছে তাকে, ফ্যাকাসে। অন্যমনস্ক। বিয়ে সেরে ফেরার পথে থেনারদিয়েরের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল জাঁ ভালজাঁ। তাকে তো দেখেছেই সে, বর কনেকেও ভাল করে পর্যবেক্ষণ করেছে। আবার কোন ষড়যন্ত্রের জাল বোনে শয়তানটা, সেই দুশ্চিন্তায় আছে সে। তাছাড়া কয়েকদিন আগে কিভাবে যেন ডান হাতের বুড়ো আঙুল থেতলে গেছে ভালজাঁর। এ নিয়ে অবশ্য কাউকে মাথা ঘামাতে দেয়নি সে, এমনকি কোজেতকেও না। আঘাতটা দেখতে পর্যন্ত দেয়নি তাকে। ব্যান্ডেজ করা আঙুলের জন্যে বিয়ের কাগজপত্রে সই করতে পারেনি জাঁ ভালজাঁ। ডান হাত সিঙে ঝুলছে, তাই এমনকি কনে সম্প্রদানের কাজও করা সম্ভব হয়নি মঁসিয়ে আলটিমাস ফশেলভেঁর পক্ষে। তাঁর হয়ে বৃদ্ধ জিলেনরমঁদ করেছেন সে সব। সেটাও হয়ত এর এক কারণ।

অবশ্য ইউফ্রেসির পাঁচ লাখ চুরাশি হাজার ফ্রাঁ হস্তান্তরের আইনগত সমাধান তার আগেই করে রেখেছিল জাঁ ভালজাঁ। এক সময় মেয়র ছিল সে এক শহরের, ওসব কাজের পদ্ধতি ভালই জানা। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বাস্তবে ফিরে এল ভালজাঁ। পাশের ঘরে ডিনারের তোড়জোড় চলছে। লোকজনের ব্যস্ত ছোটাছুটি, গল্প-হাসির হুল্লোড়ে বাড়ি সরগরম। পর্দা সরিয়ে এ ঘরে এসে ঢুকল কোজেত। বাবকে দেখে হাসল সে। দু'হাতে বিয়ের ধপধপে সাদা গাউন দুলিয়ে বলল, বাবা,
তুমি খুশি হয়েছ?

হ্যাঁ, মা। নিশ্চই খুশি হয়েছি।

তাহলে হাসছ না কেন? হাসো! হাসল ঐ ভালজাঁ।

একটু পর খাবার ঘরে ডাক পড়ল। সবাই এল। এল না কেবল জাঁ ভালজাঁ। খোঁজ পড়ল মঁসিয়ে ফশেলভেঁর, কোথায় গেলেন তিনি? এক ভৃত্য জানাল, মঁসিয়ের হাতের ব্যথা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় বসতে পারছিলেন না তিনি। বাসায় চলে গেছেন। যাওয়ার আগে তাকে বলে গেছেন, সে যেন মঁসিয়ে জিলেনরমঁদকে ব্যাপারটা জানিয়ে তার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়। কাল আসবেন তিনি। প্রথমে মন

খানিকটা খারাপ লাগল কোজেতের, তবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভুলে গেল সে বাবার অভাব। প্রিয়তম মারিয়াস অভ্যাগতদের সাথে খাওয়া গল্পে মেতে উঠল। এক সময় সবাই ভুলে গেল মঁসিয়ে ফশেলভেঁর কথা।

ওদিকে ধীর পায়ে বাসায় ফিরে এল জাঁ ভালজাঁ। মোমবাতি জ্বেলে দোতলায় উঠে এল। খা খা করছে শূন্য বাড়ি। কোজেতের রুমে এসে ঢুকল সে। চাদর নেই আজ এ ঘরের বিছানায়, ঝলমলে ঝালরওয়ালা কভারও নেই বালিশে-সব ন্যাড়া। এই বিছানায় কোনদিন আর ঘুমাবে না তার কোজেত। এ ঘরে ওর যা ছিল, সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সবগুলো ক্লোজেটের পাল্লা হাঁ করে খোলা, কিছু নেই ভেতরে। ওগুলো বন্ধ করল জাঁ ভালজাঁ। চলে এল নিজের ঘরে। বাতিটা রাখল টেবিলের ওপর।

বিছানায় বসে মাথার দিকের ক্যাণ্ডেল স্ট্যাণ্ড থেকে একটা চামড়ার ব্যাগ নামাল। ব্যাগটা তালা মারা। পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলল ভালজাঁ। চাবিটা সব সময় নিজের পকেটে রাখে সে, ব্যাগটাও। কাউকে দেয় না সে ও দুটো। কাউকেই না। গত বছর যখন হঠাৎ করে এ বাড়িতে চলে আসতে হলে, হাজার হুড়োহুড়ির মধ্যেও ব্যাগটা আনতে ভুল হয়নি জাঁ ভালজাঁর। কনভেন্টে থাকতে ফশেলভেঁর সাহায্যে এটা জোগাড় করেছিল সে, তখন থেকেই ব্যাগটা তার প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী।

কখনই কারও হাতে দেয়নি ভালজাঁ ওটা। যখন যেখানে যায়, নিজের সাথেই রাখে। কখনও কখনও অবাক হয়ে ব্যাগটা দেখত কোজেত, ভেবে পেত না বাবা সব সময় ওটা কেন আগলে রাখে। কি আছে ওর মধ্যে? মাঝেমধ্যে ঠাট্টা করত সে। বলত, 'তোমার ওই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গটাকে আমার খুব হিংসে হয়, বাবা! ওটাকে তুমি আমার চাইতে বেশি ভালবাস।'

ব্যাগটা খুলল জাঁ ভালজাঁ। ভেতর থেকে একটা একটা করে বের করে আনল কোজেতের ছোটবেলার অনেকগুলো ড্রেস, একজোড়া ছোট্ট জুতো, মোজা, স্কার্ফ ইত্যাদি। সব বিছানায় সাজিয়ে রাখল সে। তারপর অপলক চেয়ে থাকল, প্রতিটির ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল ভালজাঁর দৃষ্টি। ওগুলোর মধ্যে দশ বছর আগে ছোট্ট কোজেতকে দেখতে পাচ্ছে সে। সেই অপরূপ, পুতুলের মত সুন্দর, মায়াভরা কোজেতকে। সারাদিন যে একটা খেলনা পুতুল কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াত—যে কখনও জাঁ ভালজাঁর হাত ধরে ঘুরে বেড়াত, কখনও বা কাঁধে চড়ে। ক্লান্ত হলে কাধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ত। এখনও এসবের সাথে সেই কোজেতের গায়ের মিষ্টি গন্ধ লেগে আছে।

জাঁ ভালজাঁর সেই কোজেত আজ অন্যের হয়ে গেছে, ওর ওপর আর কোন অধিকার নেই তার। গেছে যাক, না হয় নাই থাকল অধিকার। তার ছোট্ট কোজেত তো আছে এগুলোর মধ্যে, ভালজাঁর বুকের মধ্যে। এই তো কোজেতের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছে সে, এই তো তার ছোট্ট দুটি নরম হাতের ছোঁয়া পাচ্ছে। এই তো তার কোজেত, শুধুই জাঁ ভালজাঁর কোজেত। ওগুলো সব এক জায়গায় দলা করল সে, মুখ গুজল ওর মধ্যে। পাগলের মত চুমু খেতে লাগল—পাথর হৃদয় বোবা কান্নায় ভেঙে পড়ল জাঁ ভালজাঁর।

ওগুলো বুকে নিয়ে সারারাত একভাবে পড়ে থাকল সে। দীর্ঘ বারো ঘণ্টা। ফেব্রুয়ারির প্রচণ্ড শীতে দেহ জমে বরফ হয়ে গেল জাঁ ভালজাঁর, তবু নড়ল না। নীরবে পড়ে থাকল মড়ার মত, আর ভাবল। কি এত ভাবল সে-ই কেবল জানে।

পরদিন একটু বেলা করে মারিয়াসদের বাড়িতে এল জাঁ ভালজাঁজ। গতরাতের আনন্দ উৎসবের পর বসার ঘরটা আজ বিধ্বস্ত যুদ্ধক্ষেত্রের মত লাগছে, সবে গোছগাছ শুরু হয়েছে। ওখানেই এক কোণে বসল সে, এক ভৃত্যকে দিয়ে খবর পাঠাল মারিয়াসকে। তবে নিজের নাম জানাতে নিষেধ করল তাকে। বলল, 'মঁসিয়ে ব্যারনকে বলরে এক লোক দেখা করতে চায় তার সাথে।'

মঁসিয়ে ফশেলভেঁর মুখে এমন অদ্ভুত কথা শুনে লোকটা অবাক হলেও কাজটা তার নির্দেশমতই করল। একটু পর ওপর থেকে নামল মারিয়াস, ভালজাঁকে দেখে যেমন অবাক হলো, খুশিও হলো তেমনি। 'আরে! বাবা, আপনি! অথচ বাস্ক ব্যাটা গিয়ে বলে কি না...কিন্তু, বাবা, মোটে সাড়ে বারোটা বাজে। কোজেতের ঘুম ভাঙেনি এখনও। আপনি আসায় খুব খুশি হয়েছি আমি। কাল এভাবে চলে গেলেন, খুব খারাপ লেগেছে আমাদের বাবা। জানেন, আপনাকে নিয়ে আমরা দুজন

অনেক গল্প করেছি কাল। কোজেত আপনাকে খুব ভালবাসে, বাবা। প্রচণ্ড ভালবাসে। আজ থেকে আমাদের সাথে থাকবেন আপনি। এই বাড়িতে। ও হ্যাঁ, আপনার আঙুলের ব্যথা এখন কেমন, বাবা?'

'মঁসিয়ে,' বলল জাঁ ভালজাঁ। 'তোমাকে বিশেষ একটা কথা বলতে এসেছি আমি আজ। বিষয়টা খুবই জরুরী।'

তার গলা শুনে বিস্মিত হলো মারিয়াস, ভাল করে তাকাল ভালজাঁর দিকে। তখনই খেয়াল হলো মুখ শুকনো লাগছে মানুষটার, চোখ দুটোও লাল। 'কি কথা, বাবা?'

'আঙুলে কিছুই হয়নি আমার। আমি মিথ্যে বলেছিলাম তোমাদের সবাইকে।' একটানে সিং খুলে ফেলল ভালজাঁ। খুলে ফেলল ব্যাণ্ডেজও। অক্ষত আঙুলটা দেখাল মারিয়াসকে।

'সেকি! অবাক হলো মারিয়াস। কি বলছেন, বাবা?'

'হ্যাঁ, মঁসিয়ে। মিথ্যে পরিচয় দিয়ে কোজেতকে সম্প্রদান করতে মন চায়নি আমার, তাই হাতে ব্যথা পাওয়ার ভান করেছি আমি।

'মিথ্যে পরিচয়?'

'হ্যাঁ,' মৃদু গলায় বলল জাঁ ভালজাঁ। আমার সত্যি পরিচয় তোমরা জানো না। কেউ জানে না। সেটা জানাব বলেই এসেছি আমি আজ। আমি এক দণ্ড খাটা কয়েদী, গ্যালি স্লেভ। জাঁ ভালজাঁ আমার নাম।

চমকে উঠল মারিয়াস। এ-এসব কি বলছেন আপনি, 'বাবা?'

যা সত্যি, তাই বলছি, দৃঢ় কণ্ঠে বলল ভালজাঁ। 'উনিশ বছর দণ্ড খেটেছি আমি, জাহাজের দাঁড় টেনেছি। এ মুহূর্তেও আমার মাথার ওপর যাবজ্জীবন দণ্ডের বোঝ রয়েছে, আত্মপরিচয় গোপন করে গত দশ বছর ধরে...'

দাড়ান দাঁড়ান। আপনি যে মাথা গুলিয়ে ফেললেন আমার।

'আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোন, মঁসিয়ে। একদিন পেটের জ্বালা সইতে না পেরে রুটি চুরি করেছিলাম, তার সাজাও পেয়েছি। আর আজ অন্যের নাম চুরি করে দিন কাটাতে হচ্ছে। কিন্তু এই নিত্য প্রবঞ্চনা আর সইতে পারছি না। এর হাত থেকে মুক্তি চাই আমি। যে জন্যে তোমাকে সমস্ত কিছু জানাতে চাই। দয়া করে বলতে দাও আমাকে।'

অনেকক্ষণ ধরে ভালজাঁকে দেখল মারিয়াস। তারপর মাথা দোলাল, 'বেশ, বলুন।'

নিচু কণ্ঠে নিজের জীবনের সমস্ত ঘটনা বলতে শুরু করল ভাল। নিজের ম্যাডেলিন পরিচয় কি ভেবেচেপে গেল সে, আর সমস্ত বলে গেল গড়গড় করে। সবশেষে বলল, এসব তোমাকে না বললেও পারতাম আমি, মঁসিয়ে। কিন্তু নিজের কাছে সৎ থাকতে চাই আমি এখন থেকে, নিত্য অপমানের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই নিজেকে। তাই বিবেকের তাড়নায় বাধ্য হয়েছি তোমাকে সব জানাতে। জীবনের বাকি দিনগুলো অন্তত নিজের কাছে আত্মসম্মান বজায় রেখে বাচতে চাই আমি।'

কাছে এসে ভালজাঁর হাত ধরল মারিয়াস। পাথরের মত ঠাণ্ডা তার দুহাত, প্রাণের সাড়া নেই। 'বেচারী কোজেত!' ফিস ফিস করে বলল সে। যদি এসব জানতে পারে...'

'ওকে এসবের কিছু বোলো না তুমি, মঁসিয়ে, অনুনয় করল জাঁ ভালজাঁ। কোজেত আমার কেউ নয় ঠিকই, তবু সে-ই আমার সব। তোমাকে তো বললাম, বাবা, বাপ-মা-হারা মেয়েটিকে বড় করার স্বার্থেই এত বছর আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে আমাকে। ও আমাকে ভীষণ ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। এসব শুনলে ও খুব কষ্ট পাবে। তুমি আমাকে কথা দাও, কিছু বলবে না...'

'আপনি শান্ত হোন, স্থির হোন। বলব না আমি কোজেতকে।'

কিছু সময় নীরব থেকে মুখ তুলল জাঁ ভালজাঁ। দ্বিধাগ্রস্তের মত ভাঙা গলায় বলল, সব শোনার পর...এখন...তুমি কি মনে করো, কোজেতের সাথে আমার দেখা করতে আসা ঠিক হবে?

'আপনার আর না আসাই ভাল, শীতল কণ্ঠে বলল মারিয়াস। 'আমার মনে হয় সেটাই ভাল হবে।'

থমকে গেল জাঁ ভালজাঁ। বেদনা কাতর দু'চোখে মারিয়াসের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজল হন্যে হয়ে। তারপর ধীরে ধীরে উঠল। দুচোখের কোণ চিক চিক করছে। বিড় বিড় করে যেন

নিজেকেই শোনল সে, বেশ, বাবা। আর আসব না তাহলে।

জড়ানো পা ফেলে কয়েক কদম এগোল ভালজাঁ। কি মনে করে থামল, ঘুরে এগিয়ে এল। ‘নিজের কাছে আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্যেই জীবনের সমস্ত গোপন কথা তোমাকে বলেছি, বাবা। না বললেও পারতাম, কেউ কিছু জানত না।’ গলা ধরে এল জাঁ ভালজাঁর। বাবা, কোজেত ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই আমার। দশটা বছর কোলেপিঠে করে ওকে আমি বড় করেছি। আজ যদি হঠাৎ করে...তুমি যদি অপরাধ না নাও, রোজ একবার করে মেয়েটাকে শুধু দেখে যাব। এসে। খুব বেশি আসব না, বেশিক্ষণ থাকবও না। তুমি যেমন বলবে, তেমনি হবে। তুমি অনুমতি দিলে সন্ধের সময় আসতে পারি। তোমাদের যে বেজমেন্ট রুম আছে, সেখানে বসে কোজেতের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে চলে যাব। তাছাড়া হঠাৎ যদি আসা বন্ধ করে দেই আমি, লোকে নানান সন্দেহও করবে।

‘বেশ,’ সবদিক ভেবেচিন্তে রাজি হলো মারিয়াস। তাই আসবেন। ‘কোজেত আপনার অপেক্ষায় থাকবে।’

‘ধন্যবাদ, মঁসিয়ে ব্যারন। তোমার অনেক দয়া।’

পরদিন সন্ধেয় এল জাঁ ভালজাঁ। তার কথামত বেজমেন্টের অন্ধকার, স্যাতসেঁতে এক রুমে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে ওদের দুজনের। দুটো আর্মচেয়ার ছাড়া কিছু নেই সেখানে। ফায়ারপ্লেসের সামনে রাখা আছে চেয়ার দুটো। আগুনে তেমন তেজ নেই, ঠাণ্ডা হয়ে আছে ঘরটা। গত রাতেও ঘুম হয়নি, তাই খুব ক্লান্ত আজ জা ভলিজা, চেয়ারে বসে চোখ মুদে ঝিম মেরে থাকল সে। কখন বাস্ক ঘরে আলো রেখে গেছে টের পায়নি।

একটু পর বাবাকে চমকে দেয়ার জন্যে নিঃশব্দে ঘুরে ঢুকল কোজেত, এসে দাঁড়াল ভালজাঁর পিছনে। ব্যাপারটা ঠিকই টের পেল সে, ঘুরে তাকাল। অপরূপ সাজে সেজেছে আজ কোজেতে—বিয়ের পর এই প্রথম দেখা দুজনের। চোখাচোখি হতে হাসল কোজেত, তারপর বলল, ‘বাবা, মারিয়াস বলল তুমি নাকি ইচ্ছে করেই এই হতচ্ছাড়া রূমে কসতে চেয়েছ? কেন? এই জঘন্য রুমটা কোন বসার জায়গা হলো?’

‘দেখো, মাদাম, তুমি তো জানোই...’

মাদাম! বিস্মিত হলো কোজেতে।

তার মানে?

ওর দিকে তাকিয়ে কেমন এক হাসি দিল জাঁ ভালজাঁ। তুমি মাদাম হতে চেয়েছিলে, মা। এখন তো হয়েছ মাদাম।

‘কিন্তু তোমার কাছে নই, বাবা। আমি এখনও তোমার কোজেতই আছি। একটা সত্যি কথা বলো তো, বাবা, তুমি কি আমার এ বিয়েতে খুশি হওনি?’

মুহূর্তের জন্যে ফ্যাকাসে হয়ে গেল জাঁ ভালজাঁ, কথা আটকে গেল। খানিকপর সামলে নিয়ে বিড় বিড় করে বলল, ‘তোমাকে সুখী করাই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এখন তুমি সুখী, তাহলে আমি কেন খুশি হব না, কোজেত?’

‘এই তো!’ আনন্দে ভালজাঁর পিঠের ওপর চড়ে বসার জোগাড় করল কোজেত। ‘এই তো কোজেত ডেকেছ তুমি, বাবা!’

ওকে সামনে নিয়ে এল ভালজাঁ, ব্যস্ত হয়ে জড়িয়ে ধরল বুকে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে। হঠাৎ কি হলো কে জানে, তাড়াতাড়ি কোজেতকে ছেড়ে হ্যাঁটের দিকে হাত বাড়ালসে। ‘কি হলো, বাবা?’

আজ চলি। তুমি নতুন বউ, বাড়ির সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে নিশ্চই। ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল জাঁ ভালজাঁ। অবাক চোখে তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল কোজেত।

পরদিন একই সময় এল সে। তাকে আজ কোন প্রশ্ন করল না মেয়েটি। কোন অভিযোগ-অনুযোগ কিছুই করল না। চুপ করে থাকল প্রায় সারাক্ষণ। একাই বক বক করল ভালজাঁ, তারপর চলে গেল। ফিরে যাওয়ার মুহূর্ত থেকে আবার পরদিনের নির্দিষ্ট ক্ষণটির প্রতীক্ষায় থাকে সে। নিয়মিত আসে, কোজেতের সাথে নানা কথা বলে, অতীত জীবনের গল্প করে। প্রায় দিনই নীরবে শুনে যায় কোজেতে। আর ওদিকে মারিয়াস, জাঁ ভালজাঁ আসার সময় হলে রোজই বাইরে কিছু না কিছু কাজ

তার থাকেই, কাজেই দেখা হয় না দুজনের।

এইভাবে বেশ কিছুদিন কাটল। হঠাৎ করেই একদিন ধাক্কাটা খেল ভালজাঁ। নির্দিষ্ট সময়ে এসে শুনল মাদাম নেই। মারিয়াসের সাথে পার্কে বেড়াতে গেছেন। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও যখন ওরা ফিরল না, চলে এল জাঁ ভালজাঁ। পরদিন বাসায় পাওয়া গেল কোজেতকে। তবে আগেরদিন যে সে ছিল না, বাবা এসে তার জন্যে অনেকক্ষণ বসে থেকে ফিরে গেছে, তা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ দূরে থাক, প্রসঙ্গটাই তুলল না সে। তারওপর সেদিন কোজেতের কথায় ধরে ফেলল ভালজাঁ, তার দেয়া টাকা সম্পর্কে মারিয়াসের মনে সন্দেহ জেগেছে। ওগুলো সে খরচ করতে চায় না। সেদিন অনেক বেদনা নিয়ে ফিরুল জাঁ ভালজাঁ।

এরপর একদিন নতুন আরেক ধাক্কা খেল সে। বেজমেন্ট রূমে ঢুকে দেখল আগুন জ্বলছে না ফায়ারপ্লেসে। ঠাণ্ডা ঘরটা যেন বরফ হয়ে আছে। কোজেত এসে চেচামেচি করুল ব্যাপার দেখে। দোষটা নিজের ঘাড়ে টেনে নিল জাঁ ভালজাঁ। আমিই নিষেধ করেছি আগুন জ্বালতে। মে মাসে আগুনের কি প্রয়োজন?

পরদিন আগুন জ্বলল বটে, কিন্তু চেয়ার দুটো কে যেন সরিয়ে নিয়েছে দেখা গেল। টেনে ঘরের এক কোণে নিয়ে রেখে দিয়েছে। এর কয়েকদিন পর এল শেষ ধাক্কা। চেয়ার দুটো নেই রূমে, নিয়ে গেছে কেউ। সেদিনও কোজেত চেঁচামেচি করল খুব। ওর রাগ থামাবার জন্যে বন্ধ হয়ে উঠল জাঁ ভালজাঁ। 'চেয়ারের কি দরকার?' বলল সে। এই তো, দাঁড়িয়েই তো বেশ কথা বলা যায়। আড়ালে তার চোখ মোছা অবশ্য দেখল না কোজেত। ভাঙা বুক নিয়ে চলে গেল জাঁ ভালজাঁ।

পরদিন এল না সে। পরদিনও না। তার পরেরদিনও না। সেদিন খেয়াল পড়ল কোজেতের, বাবার খোঁজ নিতে লোক পাঠাল সে। ফিরে এসে লোকটা জানাল, মঁসিয়ে কাজে ব্যস্ত আছেন এখন। অবসর হলেই আসবেন। চিন্তার কিছু নেই।

একই বছরের বসন্তের শেষ আর গ্রীষ্মের শুরুর কয়েক মাস মারেই এলাকার অধিবাসী, দোকানদার, পাড়ার নিয়মিত আড্ডাবাজসহ প্রত্যেকে এক বৃদ্ধকে দেখত রোজ সন্ধের দিকে। ধোপদুরস্ত কালো পোশাক পরে প্রতিদিন একই সময় হেঁটে যায় দুর্বল মানুষটা। হোমি আর্মি লেন থেকে বেরিয়ে রোজ একই দিকে যায়। গলি ছেড়ে ডিলা রোতেমরি, ব্লাঁস মতিয়াক্স হয়ে রু কালচার সেইন্ট ক্যাথেরিন যায় প্রথমে বৃদ্ধ, তারপর রু দে লা এসার্প হয়ে বাঁয়ে ঘুরে রু সেইন্ট লুই পর্যন্ত। এখান থেকে হাঁটার গতি ক্রমে কমে আসতে থাকে তার। মন্থর পায়ে মাথা যুকিয়ে হাঁটে তখন। কোনদিকে তাকায় না, দেখে না কিছু, হয়তো শোনেও না কিছু।

খানিকটা এগিয়ে মুখ তোলে সে, সারাক্ষণ একই দিকে নিবদ্ধ থাকে তখন বৃদ্ধের নিষ্প্রভ, ঘোলাটে দৃষ্টি। রু দেস ফিলেস দু ক্যালভেরির ৬ নম্বর বাড়িটার দিকে। যতই সেদিকে এগোয় মানুষটা, কি এক অজানা আনন্দে ততই যেন ঘোলাটে নজর উজ্জ্বল হতে থাকে, ও বাড়ির ছাতে, বারান্দায় কাউকে হয়তো খোঁজে সে। মৃদু হাসি ফোটে তখন বৃদ্ধের ঠোঁটে, ঠোঁট নড়ে অল্প অল্প, মনে হয় অদৃশ্য কারও সাথে কথা বলছে বুঝি। বাড়িটার একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়ে বৃদ্ধ আচমকা। চেহারা বদলে যেতে আরম্ভ করে, একটু একটু কাঁপতে থাকে সে, চোখের কোণে ধীরে ধীরে পানির আভাস দেখা দেয়, পানি জমে, এক সময় তা বড় বড় ফোটায় পরিণত হয়, গড়িয়ে নেমে আসে। একই জায়গায় পাথরের মূর্তির মত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে বৃদ্ধ, তারপর ফিরে চলে আগের পথ ধরে। চোখের জ্যোতি ততক্ষণে নিভে গেছে তার, শুকিয়ে গেছে হাসি। দিনের পর দিন একই দৃশ্য দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেল সবাই।

একদিন ক্যালভেরি পর্যন্ত যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় বৃদ্ধের। গায়ে বল পায় না, অতখানি পথ হেঁটে যেতে কষ্ট হয়, তাই সেইন্ট লুই পর্যন্ত গিয়েই ফিরে আসে। কিছুদিন পর পথ আরও কমে আসে, রাক্স মতিয়াক্স পর্যন্ত যায় সে। একদিন আর সেটুকুও পুরো যায় না। দৃষ্টি তার আরও ঘোলা হয়েছে তখন, ভাল দেখতে পায় না, চোখে পানিও আসে আজকাল, খটখটে হয়ে থাকে। দেহ হাড্ডিসার হয় দিনে দিনে।

তবে যেটুকুই যাক, রোজ ওই একই সময় বের হওয়া চাই-ই চাই বৃদ্ধের। কালো ধোপ-দূরস্ত

পোশাক পরে বের হয় সে, আগের মতই মাথা নত করে হাঁটে। ধপধপে সাদা চুল ভরা মাথা দোলে তার হাঁটার ছন্দে, প্রতি পদক্ষেপে থুতনির চামড়া তিরতির করে কাঁপে, সরু ঘাড়ের বলিরেখাগুলো করুণা জাগায় মনে। আকাশে মেঘ দেখলে ছাতা ঠিকই বগলে নিয়ে বের হয় বৃদ্ধ, কিনুত বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলে ওটা মেলার কথা মনে থাকে না, ভিজে একাকার হয়ে ফেরে।

দেখে পাড়ার মেয়েরা হাসে। বলে, বুড়ো পাগল। গলির ছেলে মেয়েরা হেসে পিছু নেয়। তা নিক, তাতে বৃদ্ধের কিছু যায়-আসে না। শক্তিতে যতদূর বুলায়, ততদূর পর্যন্ত যাওয়া-আসা অব্যাহত থাকে তার। কাজ যে তার খুবই জরুরী, না গিয়ে পারে কি করে সে?

জাঁ ভালজাঁর মুখে তার আত্মপরিচয় শোনার পর তার প্রতি প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা জন্মেছিল মারিয়াসের মনে। কি করে লোকটাকে দূরে সরিয়ে দেয়া যায়, কোজেতের মন থেকে পুরোপুরি মুছে দেয়া যায় তার স্মৃতি, সেই চেষ্টায় উঠেপড়ে লাগল সে। সন্ধেয় যখন আসে জাঁ ভালজাঁ, রোজই কোন না কোন কাজের ছুতোয় বাইরে কাটাতে শুরু করল সে। রূমের আগুন নিভিয়ে রাখা, চেয়ার সরিয়ে ফেলা ইত্যাদি মারিয়াসের গোপন নির্দেশেরই ফল। একে সে তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য বলে ধরে নিয়েছিল। কোজেত এসবের কিছুই জানে না।

এর মধ্যে ভালজাঁ সম্পর্কে এখানে-ওখানে কিছু গোপন অনুসন্ধানও চালিয়েছে সে। যা জানা গেছে, তা মারিয়াসের রীতিমত রহস্যময় মনে হয়েছে। এক সময় নিশ্চিত হলো সে, নিজের পরিচয় সম্পর্কে লোকটা মিথ্যে বলেনি ঠিকই, কিনুত আর যা যা বলেছে তার প্রায় সবই ডাহা মিথ্যে। মানুষটা জঘন্য! কেবল মিথ্যক আর ডাকাতই নয়। ঠাণ্ডা মাথার খুনীও বটে। একটা হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী তো সে নিজেই। ইন্সপেক্টর জ্যাভারকে খুন করেছে সে গত বছর ৫ জুন। সে যে সেদিন সাঁভ্রেরি গিয়েছিল, তাতে এখন বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই মারিয়াসের। জ্যাভারই একমাত্র জানত জাঁ ভালজাঁর পরিচয়, তাই সেদিন কায়দা করে তাকে হত্যা করে ভালজাঁ।

কোজেতকে দেয়া টাকাগুলো যে ভালজাঁরই, এবং অসৎ পথে উপার্জিত, সে ব্যাপারেও পুরোপুরি নিশ্চিত হলো মারিয়াস। অবশেষে খুশিও হলো সে যখন বুঝল জঞ্জাল দূর হয়েছে। অনাদর টের পেয়ে আসা বন্ধ করে দিয়েছে আপদ নিজে থেকেই।

একদিন বিকেলে রুটিনমাফিক তৈরি হয়ে বের হলো জাঁ ভালজাঁ। কিনুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে তিন পা যেতেই মাথা ঘুরে উঠল ভীষণভাবে, তাড়াতাড়ি সামনের সেই পাথরের ওপর বসে পড়ল সে, যেখানে আগের বছর ৫ জুন সন্ধের পর বসে ছিল, গাভরোচের কাছ থেকে কোজেতের চিঠিটা নিয়েছিল।

কয়েক মিনিট বসে একটু সুস্থ বোধ হতে ফিরে এল জাঁ ভালজাঁ, নিজের রূমে এসে শুয়ে পড়ল। পরদিন রুম থেকে বের হতে পারল না সে, তার পরদিন বিছানা থেকে নামার শক্তিও রইল না। এক সপ্তাহ কেটে গেল, বিছানাতেই পড়ে দিন কাটে ভালজাঁর, ওঠার ক্ষমতা নেই। ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে। অবস্থা দেখে বাড়ির দারোয়ানের স্ত্রী স্বামীকে বলল, 'মানুষটা খাচ্ছে না কিছুই। যা রেখে আসি টেবিলেই পড়ে থাকে। বিছানা থেকে উঠতে পারে না,' আফসোস প্রকাশ করে সে চুক চুক করে। বড় ভাল ছিল মানুষটা। বাঁচবে না বেশিদিন, দেখো। আমি জানি, ওঁর জামাইটা সুবিধে হয়নি।

একটু পর উদাস কণ্ঠে আবার বলে উঠল সে, 'আহ! কত ভাল মানুষ ছিল। দেখতে দেখতে কেমন ভেঙে পড়ল হঠাৎ করে।'

সেদিনই পাড়ার এক ডাক্তার নিয়ে এল মহিলা। জাঁ ভালজাঁকে পরীক্ষা করে নেমে আসার সময় তাকে জিজ্ঞেস করল সে, 'কেমন দেখলেন, ডাক্তার?'

ভাল না। মানুষটা খুবই অসুস্থ।

'কি হয়েছে ওঁর?'

'কিছুই হয়নি, আবার সবই হয়েছে। প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছেন ভদ্রলোক, মনে হয় খুব আপন কাউকে হারিয়েছেন। সন্ধের পর আরেকবার এসে দেখে যাব আমি।'

একদিন সন্ধের আগে অনেক কষ্টে বিছানায় উঠে বসল জাঁ ভালজাঁ। মন বলছে তার, সময় হয়েছে। এবার চলে যেতে হবে। সংক্ষিপ্ত, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। পালস প্রায় নেই বলা চলে। অদৃশ্য

কোন শক্তি হয়তো বল জোগাল তাকে, নিজের এক সেট পুরনো, প্রিয় পোশাক পড়ল জাঁ ভালজাঁ। বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা নেই, কালো ড্রেসটা পরার প্রয়োজন আরও আগেই ফুরিয়েছে, তাই অযত্নে পড়েই থাকে ওটা আজকাল। থেমে থেমে কয়েকবারের প্রচেষ্টায় প্রিয় পোশাক পরা শেষ করল জাঁ ভালজাঁ। ওয়েস্ট কোটটা পরতে ঘেমে গোসল করে উঠল। ঘাম মুছে ছোট ব্যাগটা খুলল সে। কোজেতের সবকিছু বের করে নিজের সারা বিছানায় ছড়িয়ে রাখল দুর্বল, কাঁপা হাতে।

তারপর উঠল। দিনের আলো তখনও আছে প্রচুর, তবু দুটো মোমবাতি জ্বালল। বসিয়ে দিল বিশপ মিরিয়েলের দেয়া সেই দুই সুদৃশ্য মোমবাতিদানে। এগুলোও জাঁ ভালজাঁর নিত্যসঙ্গী। এইটুকু করতেই প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়ল ভালজাঁ, নিজের পড়ার টেবিলের চেয়ারে বিধ্বস্ত দেহটা এলিয়ে দিল। চোখ পড়ল সামনে সাইডবোর্ডের ওপর রাখা সেই আয়নাটায়। নিজেকে চিনতেই পারল না জাঁ ভালজাঁ। কয়েক মাস আগে কোজেতের বিয়ের সময় পয়ষট্টি পুরেছিল তার, অথচ দেখে মনে হত পঞ্চান্ন। আর আজ মনে হচ্ছে আশি। কপালের বলি রেখাগুলো দেখল সে। একটা মৃদু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। বয়সের নয়, ওগুলো কালের করাল গ্রাস—সময় যে ফুরিয়েছে, তার আগমনী বার্তা।

রাত নামল চুপি চুপি। বসে থাকা অবস্থাতেই জ্ঞান হারাল একবার জাঁ ভালজাঁ। জ্ঞান ফিরতে পিপাসা পেল খুব। ঢেলে খাওয়ার শক্তি নেই, তাই কলসি কাত করে মুখ লাগিয়ে এক ঢোক পানি খেল কোনরকমে। তারপর বিছানার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল জাঁ ভালজাঁ—দেখতে থাকল তার প্রিয় জিনিসগুলো।

হঠাৎ সারাদেহ কেঁপে উঠল, শিউরে উঠল জাঁ ভালজাঁ। এসে গেছে! সময় নেই বেশি! বহুদিনের অব্যবহৃত কলমটা নিয়ে কোজেতকে চিঠি লিখতে বসল জাঁ ভালজাঁ। কালির দোয়াত শুকিয়ে খটখটে হয়ে আছে, কলমের নিবও বেঁকে গেছে। অনেক সময় নিয়ে, দেহের অবশিষ্ট শক্তি প্রায় সবটাই শেষ করে কয়েক ফোঁটা পানি দোয়াতে ঢালল জাঁ ভালজাঁ। কালি খানিকটা তরল হতে কলমের উল্টোদিক দোয়াতে চুবিয়ে লিখতে শুরু করল অস্থির হাতে।

কোজেত,

আমার শুভাশিস জেনো। তোমাদের কাছে থেকে আমার সরে আসা উচিত, এটা বুঝিয়ে দিয়ে তোমার স্বামী কোন অন্যায় করেনি, তার কিছু বোঝার ভুল থাকলেও এ কাজটা ঠিকই করেছে সে। মঁসিয়ে মারিয়াস খুবই ভাল মানুষ, তাকে সব সময় ভালবেসো। কোজেত, বিয়ের সময় যে টাকাটা তোমাকে দিয়েছি, তা তোমারই জন্যে রেখে দিয়েছিলাম। ও টাকায় কোন পাপ নেই, ওগুলো আমার কষ্টার্জিত টাকা। মন্ট্রিল-সুর-মেয়ারে...।

আরও কয়েক লাইন লিখল ভালজাঁ তার অলঙ্কার ব্যবসা সম্পর্কে, কিন্তু বক্তব্য শেষ করতে পারল না, আচমকা হাত থেমে গেল, অসাড় আঙুলের ফাঁক গলে পড়ে গেল কলম। দু'হাতে মাথা আঁকড়ে ধরল জাঁ ভালজাঁ। বুকের ভেতর থেকে ঠেলে উঠে আসছে ক্ষীণ, দুর্বল বিলাপ। 'ঈশ্বর! ফুরিয়ে গেল সময়? ওকে আর দেখতে পাব না? কোজেতকে না দেখেই চলে যেতে হবে! ঈশ্বর, যাওয়ার আগে একটিবার দেখার সুযোগ দাও ওকে, এক মুহূর্তের জন্যে। ওর গলা শুনতে দাও! যাওয়ার আগে যদি কোজেত, একবার আসত! ওহ্...হলো না! নিঃসঙ্গ হয়েই যেতে হচ্ছে আমাকে? ঈশ্বর! হে ঈশ্বর! কোজেতকে শেষ দেখা দেখে যেতে, পারলাম না!' হাহাকার করে উঠল ভালজাঁ।

ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজায় ব্যস্ত করাঘাতের আওয়াজ উঠল।

ওইদিনই বিকেলের কথা। থেনারদ পরিচয় দিয়ে এক লোক দেখা করতে এল মারিয়াসের সাথে। দেখামাত্র সে বুঝল লোকটা ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছে। এ সেই ডাকাত, থেনারদিয়ে। কিন্তু ব্যাপারটা তাকে বুঝতে দিল না মারিয়াস। 'আমি আপনাকে খুব গোপন একটা সংবাদ জানাতে এসেছি, মঁসিয়ে ব্যারন,' বলল লোকটা।

বলুন।

আপনি না জেনে এক খুনী, ডাকাতকে আপনার পরিবারের সাথে জড়িয়ে ফেলেছেন

ঘনিষ্ঠভাবে। মিথ্যে নামে, ভুয়া পরিচয়ে আপনার আস্থা অর্জন করেছে সেই লোক। তার নাম জাঁ ভালজাঁ।

আমি জানি।

'আপনার স্ত্রী, ব্যারনেস...'

'তাও জানি,' দৃঢ় কণ্ঠে বাধা দিল মারিয়াস। এমনকি আপনাকেও চিনি আমি।'

বিস্মিত হলো লোকটা। আমাকে চেনেন?

হ্যাঁ, আপনি থেনারদিয়ের। অথবা জনদ্রেত। এ-ও জানি, আপনি আসলে গোপন খবরের বিনিময়ে টাকা রোজগারের ধান্ধায় এসেছেন। আপনি জাঁ ভালজাঁ সম্পর্কে যা বলতে এসেছেন, তা আমার মুখ থেকেই শুনুন। কয়েক বছর আগে ম্যাডেলিন নামে এক ধনী ব্যবসায়ীকে খুন করে তার সমস্ত টাকা-পয়সা কেড়ে নিয়েছিল জাঁ ভালজাঁ। পরে এক পুলিশ অফিসারকেও খুন করে সে, ইন্সপেক্টর জ্যাভারকে। এই তো বলতে চান আপনি?

কতক্ষণ হাঁ করে মারিয়াসকে দেখল থেনারদিয়ের। চেহারায় চরম বিস্ময়। মাফ করবেন, মঁসিয়ে ব্যারন। আপনি যা বললেন তার একটিও সত্যি নয়, আপনার জানায় মস্ত ভুল আছে। আমি এসব বলতে আসিনি।

কি?

'ঠিকই বলেছি, মঁসিয়ে। আপনার জানায় মারাত্মক ভুল আছে।'

তার মানে?

'মানে ম্যাডেলিনকে হত্যা করেনি সে। সে প্রশ্নই আসে না, কারণ জাঁ ভালজাঁ নিজেই ছিল ম্যাডেলিন। পুলিশের হাত থেকে বাচার জন্যে এই নাম নিয়েছিল সে। আর জ্যাভারকে কেউ হত্যা করেনি, মঁসিয়ে। সে আত্মহত্যা করেছে।'

'কি প্রমাণ আছে এ সবের!' চেঁচিয়ে উঠল মারিয়াস। প্রমাণ করুন!

পকেট থেকে একটা খাম বের করল লোকটা, তার ভেতর থেকে বের হলো দুটো পেপার কাটিং, যার একটা বেশ আগের। দেখুন, মঁসিয়ে। আপনিই পড়ুন।

থাবা মেরে নিল মারিয়াস ও দুটো। একটা 'দ্রেপু ব্লাঁ' পত্রিকার, ১৮২৩ সালের ২৫ জুলাই তারিখের কাটিং, যাতে অ্যারাস কোর্টে মঁসিয়ে মেয়র ম্যাডেলিনের আত্মসমর্পণ, এবং তার পরের পূর্ণ বিবরণ আছে। পরের কাটিংটা গত বছর ১৫ জুনের 'মনিটিউর' পত্রিকার। এটায় আছে ইন্সপেক্টর জ্যাভারের মৃত্যু যে আত্মহত্যা, তার বিস্তারিত খবর। ব্যস্ত চোখে কাটিং দুটো পড়ল মারিয়াস। হতভম্ব হয়ে গেল তার সংগৃহীত খবর সঠিক ছিল না বুঝতে পেরে। ভুল ছিল তার জানায়। মারাত্মক ভুল! এই ভুলের কারণে সে যে কত বড় অন্যায় করে ফেলেছে, বুঝতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে গেল মারিয়াস। হায় হায়! এ আমি কি করেছি? আহাম্মকের মত থেনারদিয়েরের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

'দেখলেন তো, মঁসিয়ে, আমার কথাই ঠিক? জাঁ ভালজাঁ ওই দুই খুনের জন্যে দায়ী নয়, দায়ী আরেকজনকে হত্যার অপরাধে।'

তার মানে?

গত বছর জুনের ৬ তারিখ সন্ধের একটু আগে প্যারিস গ্র্যাণ্ড সুয়্যারের সাঁ-জে-লি-জের কাছে, পন্ট দেস ইনভ্যালিডস আর পন্ট ডি'এনার মাঝের যে নর্দমা, সেখানে জাঁ ভালজাঁকে দেখেছি আমি নিজের চোখে। তার কাঁধে একটা মৃতদেহ ছিল। লোকটা কোনদিক থেকে যে এল বুঝতে পারিনি আমি প্রথমে।

ধড়াশ করে উঠল মারিয়াসের বুক। কাছের চেয়ারটায় বসে পড়ল ও হাঁটুর জোর হারিয়ে। 'তারপর বলে যান'।

'সন্ধের একটু আগে, লাশ কাঁধে ভেতরের কোনদিক থেকে যেন নর্দমার গেটে পৌঁছল জাঁ ভালজাঁ। বুঝলাম সে লাশটা নদীতে ফেলতে যাচ্ছে। কিনুত গেটে তালা মারা দেখে খুব হতাশ লাগল তাকে। এই সময় আমাকে দেখে লোকটা ঘাবড়ে গেল প্রথমে। পরে নিরুপায় হয়ে গেট খোলার ব্যাপারে আমার সাহায্য চাইল। তার আগে আমি নিশ্চিত হয়ে নিয়েছি যে তার কাঁধের মানুষটা যে-ই

হোক, মরে গেছে সত্যি সত্যি। এক যুবক ছিল সে। ভালজাঁর চোখ বাঁচিয়ে যুবকের কোটের খানিকটা লাইনিং ছিড়ে নিলাম আমি, যদি কখনও প্রয়োজন পড়ে, এই ভেবে।'

পকেট থেকে টুকরোটা বের করল থেনারদিয়ের। 'এই দেখুন, সেই কাপড়।'

ধীরে ধীরে আসন ছাড়ল মারিয়াস। চেহারা ফ্যাকাসে। দম নিচ্ছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। সেদিনের সেই কোটটা আলমারি থেকে বের করে এনে ভেতরের ছেড়া জায়গায় টুকরোটা বসাল সে। মিলে গেল। আগের একটা রহস্যের সমাধানও পেয়ে গেল ও সঙ্গে সঙ্গে। মারিয়াস পরে জেনেছিল, গাভরোচকে দিয়ে পাঠানো ওর চিঠিটা কোজেত পায়নি, সেই রহস্যের সমাধান। বুঝল সে, ওটা জাঁ ভালজাঁর হাতেই পড়েছিল, এবং চিঠির বক্তব্য পড়ে ওকে ফিরিয়ে আনার জন্যে তক্ষুণি সাঁভ্রেরি ছুটে যায় মানুষটা। আর কেউ নয়, জাঁ ভালজাঁই তার প্রাণ রক্ষাকারী।

কোজেতের খোঁজে পাগলের মত ছুটল মারিয়াস।

দরজা খুলে গেল সশব্দে। কাঁপতে কাঁপতে মুখ তুলল জাঁ ভালজাঁ। খোলা দরজার সামনে মারিয়াস আর কোজেতকে দেখে পলকে অবর্ণনীয় খুশিতে, অনাবিল আনন্দে ঝলসে উঠল তার ঘামে ভেজা মলিন চেহারা। শীর্ণ দেহে অদ্ভুত এক শিহরণ বয়ে গেল, জ্বলে উঠল ম্রিয়মাণ চোখ দুটো। সোজা হলো জাঁ ভালজাঁ, দুহাত বাড়িয়ে দিল সামনে, প্রচণ্ড আবেগে কাপছে থর থর করে। 'কোজেত!'

তার চেহারা দেখে চমকে উঠল. কোজেত, ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বুকে। 'বাবা!' মারিয়াস তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে, মনের ভাব বোঝ কঠিন তার।

তোতলাতে লাগল ভালজাঁ, 'কোজেত! তুমি সত্যি এসেছ? ওহ, ঈশ্বর! কোজেত, তুমি তাহলে আমাকে ক্ষমা করেছ?'।

চোখ নামিয়ে নিল মারিয়াস, কেঁদে ফেলেছে। কাছে এসে কোনরকমে উচ্চারণ করল সে, 'বাবা!'

'তুমিও ক্ষমা করেছ আমাকে?' গলা দিয়ে আওয়াজ বের হলো না মারিয়াসের। ধন্যবাদ, বিড় বিড় করে বলল জাঁ ভালজাঁ। আগে যেভাবে বসত, তেমনি করে ভালজাঁর কোলে বসল কোজেত, তার চুল পিছনে ঠেলে দিয়ে চুমু খেল কপালে। 'আমি মনে করেছিলাম তোমাকে আর দেখতে পাব না,' বলল ভালজাঁ।

'বাবা, এতদিন কোথায় ছিলে তুমি? কেন আমাদের কোন খবর দাওনি? কি করে আমাদের ছেড়ে থাকতে পারলে তুমি এতদিন? ইশ। তুমি খুব শুকিয়ে গেছ, বাবা। তুমি অসুস্থ, হাত দুটো ভীষণ ঠাণ্ডা তোমার। মারিয়াস, দেখো, কী ঠাণ্ডা!'

মারিয়াসকে দেখল জাঁ ভালজাঁ। আবার বলল, তুমি তাহলে আমাকে ক্ষমা করেছ, মঁসিয়ে?

এতক্ষণ চেষ্টা করেও কথা বলতে সক্ষম হয়নি সে। এবার সফল হলো। 'শুনলে, কোজেত? বাবা আমার কাছে ক্ষমা চাইছেন। যেখানে আমার চাওয়ার কথা। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাবা আমাকে বাঁচিয়েছেন, তোমাকে তুলে দিয়েছেন আমার হাতে। অথচ জীবনভর নিজেকে বঞ্চিত করেছেন। আমি এমন এক মানুষকে ভুল বুঝেছি, কষ্ট দিয়েছি তার মনে। কোজেত, সারাজীবন বাবার পায়ের নিচে কাটালেও ঋণ শোধ হবে না আমার। সেদিন যদি বাবা ব্যারিকেডে ছুটে না যেতেন...'

'চুপ কর?' ফিস ফিস করে বলল জাঁ ভালজাঁ। এসব কথা থাক আজ।

'কিনুত কেন? কেন সত্যি কথাটা বললেন না সেদিন? কেন বলেননি আপনিই সেই ফাদার ম্যাডেলিন?' উত্তেজনার মাথায় বলে চলল মারিয়াস। 'যদি থেনারদিয়েরের সাথে আজ দেখা না হত, জীবনে হয়তো এ ভুল ভাঙত না আমার! কেন নিজেকে এতবড় কষ্ট দিলেন, বাবা?' থামল সে। একটু পর আবার বলল, আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। কোন আপত্তি শুনব না। আর একদিনও এ বাড়িতে থাকতে পারবেন না আপনি। ভুলেও ভাববেন না কাল এ বাড়িতে থাকতে পারবেন আপনি।

মৃদু কণ্ঠে বলল জাঁ ভালজাঁ, কাল এ বাড়ি থাকা হবে না জানি। কিনুত তোমাদের বাড়িতেও থাকব না আমি কাল।

'তার মানে? কোথাও যাবেন আবার? অসম্ভব। আর কোথাও যেতে দেব না আমরা আপনাকে।'

‘হ্যাঁ, বাবা,’ বলল কোজেতে। তোমার জন্যে ক্যারিজ নিয়ে এসেছি আমরা, যেতেই হবে তোমাকে। যদি আপত্তি করো, জোর করে নিয়ে যাব। কোন কথা শুনব না।

কথাগুলো শুনল ঠিকই ভালজাঁ, কিন্তু বুঝল না। অনেকদিন পর পোড়া দুচোখে পানি জমল তার, বিড় বিড় করে কি যেন বলল সে। নিস্তেজ হয়ে চোখ বুজল, বরফ হয়ে গেছে হাত-পা।

‘বাবা!’ চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল কোজেত। একি! তোমার গা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে কেন? বাবা, খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার? বাবা...!

দরজায় কে যেন এল, বাষ্পরুদ্ধ চোখে ঘুরে তাকাল কোজেত মারিয়াস। ডাক্তার। এক পলকে ঘরের পরিস্থিতি বুঝে নিল লোকটা, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ভালজাঁর শীর্ণ হাতের নাড়ি টিপে ধরল সে। কপালে মৃদু কুঞ্চন দেখা দিল, ওদের দুজনকে দেখল ডাক্তার। ‘আপনাদের অপেক্ষাতেই ছিলেন ভদ্রলোক, আরও আগে আসা প্রয়োজন ছিল। দেরি করে ফেলেছেন, মাথা দোলাল ডাক্তার হতাশ ভঙ্গিতে। সময় শেষ।’

হঠাৎ চোখ মেলল জাঁ ভালজাঁ। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ডাক্তার এবং মারিয়াস হাত বাড়াল সাহায্যের জন্যে, মাথা নেড়ে একাই সামনে এগোল ভালজাঁ। ক্ষণিকের জন্যে পূর্ণ সুস্থ-সবল মনে হলো তাকে। সাইডবোর্ডের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটা স্ট্যান্ডওয়ালা কুশ নিয়ে ফিরে এল আগের জায়গায়। ওটা টেবিলে রেখে চেয়ারে বসল। কয়েক মুহূর্ত ক্রুশবিদ্ধ যিশুকে দেখল জাঁ ভালজাঁ। ‘দেখো,’ বলল সে বিড় বিড় করে। মহান আত্মোৎসর্গকারীকে দেখো।

তারপরই অস্থির হয়ে উঠল জাঁ ভালজাঁ। মনে হলো মাথা ঘুরে উঠেছে হঠাৎ করে, পড়ে যাওয়ার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে নিজের দুই হাঁটু চেপে ধরল সে জোর করে। মুখ নামিয়ে চোখ বুজে থাকল। দু’হাতে তার কাধ জড়িয়ে ধরে অঝোর ধারায় কাদছে কোজেত। ‘বাবা! আমাদের ছেড়ে যেয়ো না, বাবা! আমাদের ছেড়ে যেয়ো না, বাবা! যেয়ো না...!’

প্রতি মুহূর্তে একটু একটু করে দুর্বল হয়ে পড়ছে জাঁ ভালজাঁ। নিঃশ্বাস অনিয়মিত হয়ে পড়েছে, ঘড় ঘড় করছে বুকের মধ্যে। হাত-পা নড়ছে না। ঘোলাটে চোখে ক্রমেই গাঢ় হয়ে জেঁকে বসছে আরেক জগতের ছায়া। ইশারায় কোজেত আর মারিয়াসকে কাছে ডাকল জাঁ ভালজাঁ। ‘আমার কাছে বোসো তোমরা।’ কথাগুলো এমন শোনাল, যেন মাঝখানে অদৃশ্য কোন দেয়ালে বাধা পাচ্ছে তারকণ্ঠ। অস্পষ্ট, দূরাগত।

‘আমি চলে গেলে বেশি কেঁদো না, কোজেত। তোমাদের ফেলে দূরে কোথাও যাব না আমি, কাছেই থাকব। রোজ সেখান থেকে দেখব আমি তোমাদের। যখন...রাত হবে, আকাশের দিকে তাকিয়ে, ওখানে...থাকব আমি। দেখতে পাবে তোমরা। আমি কতবড়...ভাগ্যবান...তোমাদের দেখে যেতে...পারলাম, যাওয়ার আগে। মারিয়াস... কোজেত, সব সময় অন্তর দিয়ে ভালবেসো তোমরা...একে অন্যকে। মনে রেখো...ভালবাসার মত দামী...আর.আর বড় কিছু... নেই জগতে।

‘আমার কথা ভেবে দুঃখ কোরো না। আমার...আমার কবরে... কোন সৌধ গড়বে না। ভুলো না; আমি...আমি...গরীব ছিলাম...নি নিঃস্ব ছিলাম।’

হাঁপাতে লাগল জাঁ ভালজাঁ, দম নেয়ার জন্যে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। ‘একটা...একটা আলো দেখতে পাচ্ছি! একটা আলো! তোমরা... তোমরা দুজন...আমার দুপাশে বোসো। তোমাদের.. তোমাদের মাথায় হাত...রেখে মরতে চাই আমি।’

নীরবে জাঁ ভালজাঁর দু’পাশে হাঁটু গেড়ে বসল কোজেত আর মারিয়াস। দুজনেই কাঁদছে নিঃশব্দে। গাল বেয়ে স্রোতের মত পানি গড়াচ্ছে। জীবনের শেষ শক্তিটুকু ব্যয় হয়ে গেল ভালজাঁর ওদের মাথায় হাত রাখতে গিয়ে। এক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই নিথর হয়ে গেল হাত দুটো। মাথা ওপরমুখো হয়ে চেয়ারের ব্যাকে হেলে পড়ল তার, সামান্য যে আলোটুকু ছিল নিষ্প্রভ দুই চোখের তারায়, নিভে গেল দপ্ করে।

জীবনের যত জ্বালা-যন্ত্রণা, দুঃখ-বেদনা, হতাশা-ব্যর্থতা, ঘৃণা-অবহেলা, সমস্ত কিছু পিছনে ফেলে চলে গেল নিঃস্ব মানুষটি। বিশপ মিরিয়েলের বাতিদানের মোম পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে তখন প্রায়। ও দুটোর অন্তিম আলো পড়েছে মৃত মুখটার ওপর। সে আলোয় মনে হলো যেন একভাবে

স্বর্গের দিকে তাকিয়ে আছে জাঁ ভালজাঁ।

***